শেখ-ফৈয়াজ

শহর-ইয়ার

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৫

প্রকাশক
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীঅশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

শ্রীমান পশুপতি খানের
করকমলে—

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই

তুলনাহীনা
শব্‌নম
অবিশ্বাস্য
মুসাফির
কত না অশ্রু জল
ধূপছায়া
দ্বন্দ্বমধুর
হিটলার

যৌবনে আমার মাথায় ছিল কাঁথার মত চুল। সেলুনের তো কথাই নেই, গাঁয়ের নাপতে পর্যন্ত ছাঁটতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেত। কাজেই সমস্ত অপারেশনটা এমনই দীর্ঘস্থায়ী আর একঘেয়ে লাগতো যে আমি ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়ে সেলুনে ঢুকতুম। চুলকাটা শেষ হলে পর সেলুনের নাপতে ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। সেদিনও হয়েছে তাই। কিন্তু—ইয়াল্লা, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি চুলের যা বাহারে 'কট্' দিয়েছে সে নিয়ে চিতাশয্যায় পর্যন্ত ওঠা যায় না, ডোম পোড়াতে রাজী হবে না। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। মহা বিরক্তি আর উষ্মা গোস্‌সাসহ রাস্তায় নাবলুম।

ঠিক যে ভয়টি করেছিলুম তাই। দশ পা যেতে না যেতেই পাড়ায় 'উত্তম কুমারের' সঙ্গে দেখা। উভয়েই থমকে দাঁড়ালুম। আমার মস্তকে তখন বজ্রপাত হলে আমি বেঁচে যেতুম—উত্তম কুমার তা হলে সে বাহারে 'হেয়ার কট' দেখতে পেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনারা পেত্যয় যাবেন না, উত্তম শুধোলে, 'খাসা ফ্যাশানে চুলটা ছেঁটেছে তো হে—সেলুনটা কোথায়? তোমার আবিষ্কার বুঝি?' গোড়ায় ভেবেছিলুম বাবু আমাকে নিয়ে মস্করা করছেন। পরে দেখলুম, না। সে গড্‌ড্যাম্ সিরিয়স।

সেই দিন থেকে একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছি। যা-ই করো, যা-ই পরো কেউ না কেউ সেটার প্রশংসা করবেই। এমন কি যা-ই লেখ না কেন। সে লেখা সাগরমাপদমণীন্দ্রাশু সবাই ফেরৎ পাঠানোর পরও দেখবে, সেটি লুফে নেবার মত লোকও আছে।

তাই আমার বিশ্বাস, কোন্‌টা যে সরেস সাহিত্য আর কোন্‌টা যে নিরেস, সে সম্বন্ধে হলপ করে কিছু বলা যায় না। যদি বলেন, সবাই অমুকের লেখার নিন্দা করছে তবে আমি উত্তর দেব: প্রথমত ভোট দিয়ে সাহিত্য বিচার করা যায় না (এমন কি রাশায় নাকি এক বার 'গণভোট—প্লেবিসিট—নেওয়া হয়, ভগবান আছেন কি নেই এবং ভগবান শতকরা একটি ভোট পান!) দ্বিতীয়ত, ভালো করে খুঁজলে নিশ্চয়ই সে-লেখকের তারিফদার পাঠকও পাবেন।

তাই আমার পরের স্টেপ: সরেস সাহিত্যিক এবং নিরেস সাহিত্যিকে পার্থক্য করা অসম্ভব।

অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই বলতে পারেন, আমি নিরেস সাহিত্যিক বলে এই মতবাদটি প্রচার করছি। আমি ঘাড় পেতে মেনে নিলুম।

মেনে নিয়েছি বলেই ট্রেনে প্লেনে—বিশেষ করে ট্রেনে—আমি আমার পরিচয় দিনে। দু'একবার আমার সঙ্গীসাথীরা মানা না শুনে ট্রেনে আলোচনার মাঝখানে অপরিচিতদের কাছে আমার নাম প্রকাশ করে দেন। দেখলুম, আমার ভয় বা ভরসা অমূলক। কেউ কেউ আমাকে চিনতে পারলেন। যদিও আমি নিরেস লেখক।

এ সবের স্মরণে, একদিন যখন আমি একটা মহা বিপদে পড়েছি তখন নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমার নাম, আমি যে সাহিত্যিক সে কথাটা প্রকাশ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফাটার শব্দ। কে একজন ব্যঙ্গ শ্লেষ ঠাট্টা মস্করা সব কিছুর একটা ঘ্যাট্ বানিয়ে বললেন, 'সাহিত্যিক! ছোঃ! এরকম ঢের ঢের সাহিত্যিক দেখছি নিত্যি নিত্যি। আমি মশাই আমাদের পাড়ার লাইব্রেরী কমিটির মেম্বার—কই, আপনার নাম তো কখনো শুনি নি!' আর-সবাই তাঁরই কথায় সায় দিলে।

ঐ দিন থেকে স্থির করেছি, জেলে যাবো, ফাঁসীতে ঝুলবো

তাও সই কিন্তু নিজের পরিচয় প্রকাশ করবো না। পেঁয়াজ-পয়জার দুই-ই কবুল বিলকুল উল্লুকই শুধু করে।

*　　*　　*

আমার আপন ভাগ্নী পর্যন্ত ফরিয়াদ করে, আমার লয়েলটি-বোধ নেই; মুসলমান হয়েও মুসলমানদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখিনে। এবারে সে বুঝতে পারবে কেন লিখিনে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোলপুর থেকে শেয়ালদা যাচ্ছি। এবং পূর্ব সৎ-কসম অনুযায়ী মুখ যা বন্ধ করেছি তারপর কি ইরেসপনসিবল কি রেসপনসিবল কোনো 'টকে'র জন্যই ডিআইআর আমার গোঁপাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না—যদ্যপি তখন কম্পার্টমেণ্টে তুমুল তর্ক বেধেছে শ্লীল অশ্লীল সাহিত্যের জাতিভেদ নিয়ে। একবার লোভও হয়েছিল কিছু বলি, যখন একে অন্যে সবাই সবাইকে শুধতে আরম্ভ করেছেন, কেউ লেডি চ্যাটারলিজ লাভার্জ পড়েছেন কি না? দেখা গেল কেউই পড়েন নি। আমার পড়া ছিল। কিন্তু পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আলোচনাতে কোনো প্রকারের সাহায্য করলুম না—পাছে ঐ খেই ধরে শেষটায় কেউ না দুম্ করে শুধিয়ে বসে, 'মহাশয়ের নাম?'—এদেশে এখনো অধিকাংশ লোক নাম জিজ্ঞাসা করাতে কোনো-কিছু আপত্তিজনক দেখতে পায় না। আমিও পাইনে—অবশ্য আমি যখন কৌতূহলী হয়ে অন্যকে শুধোই, ভাইস্-ভারসা নয়।

তবু আমি চুপ, এবং এমনই নিশ্চুপ যে স্বয়ং কমুনিস্ট ফরেন আপিস পর্যন্ত আমার বাক-সংযম দেখে, 'খরশ্‌শো, খরশ্‌শো', শাবাশ শাবাশ জয়ধ্বনি তুলতো।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলুম, এক কোণে যে একটি যুবতী বসে আছেন তিনি যেন আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন

—আড় নয়নে না, পুরো-পাক্কা সাহস ভরেই। আমি বিশেষ শঙ্কিত হলুম না, কারণ পারতপক্ষে আমি কাউকে আমার ফটো উপহার দি না, আর খবরের কাগজে আমার যা ছবি উঠেছে তার তুলনায় আলীপুরের শিম্‌পানজীর ছবি উঠেছে ঢের ঢের বেশি।

১৮৩০ না ৪০ খৃষ্টাব্দে আসামে বুনো চায়ের গাছ আবিষ্কারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত বর্ধমান-কেল্‌নার খবর পায় নি যে চা নামক পানীয় আদৌ এ পৃথিবীতে আছে এবং বাঙলাদেশেও পাওয়া যায়। কারণ গত চল্লিশ বৎসর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমি বর্ধমান-কেল্‌নারের কাছ থেকে চা আদায় করতে পারি নি। এ তত্ত্বটি অনেকেই জানেন; কাজেই বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়ানো মাত্রই কামরার অধিকাংশ লোকই চায়ের নিষ্ফল সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নেবে গেলেন। আমি মুসলমান—শ্রীশ্রীগীতার মা ফলেষু কদাচনতে না-হক্‌ক কেন বিশ্বাস করতে যাবো? বসে রইলুম ঠায়।

এমন সময় হুঙ্কার শোনা গেল, 'এই যে আলী সায়েব, চললেন কোথায়?' এবং সঙ্গে সঙ্গে মালপত্রসহ রেলের মজুমদারের প্রবেশ। আমি ভালোমন্দ কিছু বলার পূর্বেই ফের প্রশ্ন, 'তারপর? "শবনম" কি রকম কাটছে?'

এর পর যা ঘটলো সেটা অবিশ্বাস্য না হলেও আমার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। সেই অন্য প্রান্তের যুবতীটি হরিণীর মত ছুটে এসে, আমার 'আরে করেন কি, করেন কি, থামুন' সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মুসলমানী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করে বাঙ্কের উপর উঠে বসলেন আমার মুখোমুখি হয়ে। ঠিক যেরকম গুরু-শিষ্য পদ্মাসীন হয়ে মুখোমুখি হয়ে বসেন। কারণ, একটু আরাম করার জন্য আমি ইতিপূর্বে বাঙ্কের হাতলটাকে হেলান বানিয়ে বসেছিলুম হাফ-পদ্মাসনে। যুবতী যে-ভাবে আসন নিলেন তাতে আমাদের একে অন্যের হাঁটুতে হাঁটুতে আধ ইঞ্চিরও ব্যবধান নয়। এবং সমস্ত অভিযানটি তিনি সম্পূর্ণ করলেন মজুমদার, তাঁর মালবাহী-

কুলী, দু'একজন প্যাসেঞ্জার যাঁরা ভাঁড়ের চায়েতেই সন্তুষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে পড়েছেন—এঁদের সক্কলের ব্যূহ অবহেলে ভেদ করে।

হার্ড-বয়েলড মজুমদারও যে বেকুবের মত তাকাতে পারে এটা আমি জানতুম না। আমার কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। আমি যে বেকুব সে আমি চার বছর বয়েস থেকে বড়দার মুখে শুনছি; এখনো শুনি।

যুবতী একবার শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে বেশ উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, 'ওগো, এদিকে এসো—আমাদের আলী সাহেব!' আমাকে শুধু বললেন, 'বে-আদবী মাফ করবেন, আমি প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারি নি।' ব্যস্ তখনকার মত আর কিচ্ছু না। আমি তো মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছি—বাদবাকি ধীরেসুস্থে হবে।

ইতিমধ্যে ঐ 'ওগো'-টি, এবং আর পাঁচজনও কামরায় ঢুকলেন। যুবতীর আদেশে তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। ডাঃ জুলফিকার আলী খান। যেমন দেবী তেমন দেবা নন। ভদ্রলোক বরঞ্চ একটু মুখ-চোরা। শুধু একটু খুশীমুখে বললেন, 'ইনি আপনার প্রকৃত ভক্ত পাঠিকা।' দেবী মুখঝামটা দিলেন, 'আর তুমি বুঝি না?' ভদ্রলোক কোনো গতিকে জান বাঁচিয়ে কামরার অন্য কোণের দিকে পাড়ি দিলেন।

নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য আমি যুবতীর সঙ্গে মজুমদারের আলাপ করিয়ে দিলুম। বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটি তোলার একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বহুৎ শুক্‌রিয়া। 'শবনম' বীবীকে এ কামরায় দাওয়াৎ না করলে আমি তাঁর স্বামীকে পুরোপুরি চিনে নিতে পারতুম না।'

সেই বর্ধমান থেকে দক্ষিণেশ্বর অবধি বেগম খান কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, তাঁর আপন মনের কথা কি কি বলেছিলেন তার পুরো বয়ান কেন, নির্যাস দেওয়াও আমার তাগতের

বাইরে। গোড়ার দিকে তো তাঁর কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছিল না। বেচারী ডাঃ খান যে বেশ কিছুটা অপ্রতিভ হয়েছেন সে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিশেষত দেবীর বসার ধরনটা। আমার দু হাঁটুর সঙ্গে তাঁর দু হাঁটু প্রায় ছুঁইয়ে দিয়ে, আমাকে শব্দার্থে কোণ-ঠাসা করে—আমিই বা করি কী, নড়তে গেলেই যে হাঁটুতে গোত্তা লাগবে—আসন না নিয়ে যদি 'ভদ্রতার' দূরত্ব বজায় রেখে স্কুল গার্লটির মত ব্রীড়াভরা ব্যবহার করতো ত হলে তো ওদিকে আর কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো না। এ তো আকছারই হয়। গোড়াতেই আমি নিবেদন করি নি, সব লেখকই বরাবর? সকলেরই কিছু-না-কিছু ভক্ত, অন্ধ স্তাবক থাকার কথা। তদুপরি এ মেয়ে মুসলমান। বাকি গাড়ি হিন্দু। অবশ্য আমাকে আর ঐ হাফ-হিন্দু মোন্দারকে বাদ দিয়ে। হিন্দুদের ধারণা—এবং সেটা হয়তো ভুল নয়—যে, মুসলমান মেয়েরা মাত্রাধিক লাজুক (নইলে বোরকা পরতে যাবে কেন?) কিন্তু এখানে যে ঠিক তার উল্টোটা!

তা সে যাই হোক, গাড়ির সবাই ভদ্রসন্তান; তাঁরা আমাদের দু'জনকে আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নিয়ে পড়লেন। বেগম খান শুধু মাঝে মাঝে মজুমদারকে তাঁর বাক্য সমর্থনের জন্য বরাত দিচ্ছিলেন। সেও এতক্ষণে হালে পানি পেয়ে গিয়েছে বলে শুধু যে সায় দিচ্ছিল তাই নয়, মাঝে মাঝে খাসা টুইয়েও দিচ্ছিল। তখন আর বেগমকে পায় কে? 'একে ছিল নাচিয়ে বুড়ি, তায় পেল মৃদঙ্গের তাল!' আমার মনে পড়লো মজুমদার কলেজ আমলে মেয়েদের নিয়ে মস্করা করে কবিতা লিখে রীতিমত নটরিয়াস হয়েছিল। বাঁদরটার খাসলৎ তিরিশটি বচ্ছরেও বদলালো না!

আমি শুধু একটি বার বেগমকে শুধিয়েছিলুম, 'আচ্ছা মিসিস খান—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার নাম শহ্‌ব্‌-ইয়ার—আরব্য রজনীর শহ্‌র্‌-ইয়ার।'

'আচ্ছা, বেগম শহ্‌র্‌—'

"না, শুধু শহ্‌ব্‌-ইয়ার।'

'আচ্ছা, শহ্‌ব্‌-ইয়ার, আপনি কি কখনো সত্যকার বড় লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যেমন মনে করুন, পরশুরাম—'

'সত্যিকার, মিথ্যেকার জানিনে,—আপনি বড় লেখক।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, 'যাক। আমার কিন্তু সত্যি একবার দেখতে ইচ্ছে করে, কোনো গ্রেট লেখকের সঙ্গে পরিচিত হলে আপনি কি করেন। বোধ হয় কবিগুরু যে বর্ণনা দিয়েছেন,

অমল কমল চরণ কোমল চুমিনু বেদনা ভরে –'

বেগম খান সঙ্গে সঙ্গে পদপূরণ করে বললে,

'বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবলুম, এই কবিতাটি যে খুব পরিচিত তা নয়, তবু মেয়েটি এর সঙ্গে পরিচিত। এর কাছে কি তবে মুড়ি-মুড়কির একই দর!

এবারে আমি শক্ত কণ্ঠে বললুম, 'দেখুন, আপনি যদি আমার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ না করেন, তবে আমি আর একটি মাত্র কথা বলবো না।'

বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করে বললে, 'আপনার মর্‌জী! ভবিষ্যতে তো সুযোগ পাবো। আমার ভাবনা কি? কলকাতায় আপনার বাসা কোথায়?'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি লক্ষপতি? শান্তিনিকেতনের বাসা ঠেলতে গিয়েই আমি লবেজান! বন্ধুর বাসায় উঠবো।'

সঙ্গে সঙ্গে আসন ত্যাগ করে চলে গেল স্বামীর কাছে। আমিও তন্মুহূর্তেই পা নামিয়ে বাঙ্কে সোজা হয়ে বসলুম। পদ্মাসনব্যূহর দুই হাঁটুতে আমি আর হরগিজ বন্দী হবো না।

একটু পরেই ডাক্তার খানকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে মাঝখানে বসিয়ে দুজনা দুদিকে বসল। আমি বললুম, 'ভালোই হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। মরার আগে একটা ট্রাঙ্ক কল পাবেন। তখন এসে শেষ ইনজেকশনটি দিয়ে দেবেন।'

ডাক্তার বললেন, 'তওবা, তওবা! আর আমি তো প্র্যাকটিক্যাল ডাক্তারী ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি। আমি তো রিসার্চ নিয়ে পড়ে আছি।'

বেগম ফিসফিস করে ডাক্তারকে বললেন, 'আঃ! যা কইবার তাই কও না!'

ডাক্তার বললেন, 'যদি ইজাজৎ দেন তবে একটা আর্জ্ আছে। শুনলুম, কলকাতায় আপনি এক দোস্তের বাড়িতে উঠবেন। তার চেয়ে এবারে আমাদের একটা চান্স্ দিলে আমরা সেটা মেহেরবানী মেনে বড় খুশী হব। আমাদের বাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে। যদি হিম্মত দেন তো বলি, আপনার কোনো তকলীফ হবে না।'

আমি অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললুম, 'কিন্তু এ-যাত্রায় হবে না, আমারই কপাল মন্দ। আসছে বার নিশ্চয়ই।'

বেগম ডাগর চোখ মেলে বললেন, 'আপনার দোস্ত কি ডাক্তার?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। বহুকাল ধরে শয্যাশায়ী।'

বেগম বললেন, 'আমাদের বাড়িতে ঐ আরেকটি মাইনর সুবিধে যা খুশী খান, যত খুশী খান, কিংবা তিন দিন ধরে কিছুই খেলেন না, হিমে সমস্ত রাত ছাতে চক্কর মারুন, যা খুশী করুন—ডাক্তার তো হাতের কাছে রয়েছে, ভয় কি?'

আমি হেসে বললুম, 'উনি না ডাক্তারী বেবাক ভুলে গিয়েছেন!'

বেগম বললেন, 'কী যেন—নউজুবিল্লা, বলতে নেই—হাতীর দাম লাখ টাকা।'

আমি ভালো করে বুঝিয়ে বললুম যে আমার শয্যাশায়ী বন্ধু আমার জন্য প্রহর গুণছে। তাই সেখানে না গিয়ে উপায় নেই।

কিন্তু আসছে বারে অতি অবশ্য, সাত সত্য, তিন কসম ওঁরাই হবেন আমার কলকাতার অন্নদাতা—মেজ্‌মান্‌।

ট্রেন দক্ষিণেশ্বরে থামলো বলে বেঁচে গেলুম। আমার এক চেনা এবং দোস্ত, পাশের ভিমকোতে কাজ করে; বোস বলেছিল স্টেশনে আমাকে দেখতে আসবে। লাফ দিয়ে নামলুম প্ল্যাটফর্মে। মজুমদারও বোসকে চেনেন। তিনিও নামলেন।

কই, রাস্কেলটা আসে নি।

মজুমদার বললেন, 'জ্যানেন আলী সাহেব, মেয়েটি বড়ই সরলা। কিন্তু যে কোনো লোক অতি সহজেই ভুল বুঝে মনে করতে পারে উনি বুঝি পুশিং ফ্লার্ট। এ টাইপ আমি খুব বেশী দেখি নি কিন্তু যা দু'একটি দেখেছি সেও মুসলমান পরিবারে।'

আমি বললুম, 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আপনি এ মীমাংসায় পৌঁছলেন কোন্‌ পর্যবেক্ষণের ফলে?'

মজুমদার আমাকে ধাক্কা দিয়ে কামরায় তুলে দিয়ে নিজে পিছনে ঢুকলেন। বললেন, 'পরে হবে।'

এবারে কামরাতে সার্বজনীন আলোচনা হলো হিন্দুসমাজে যে ডিভোর্স বা লগ্নছেদ প্রবর্তন হয়েছে তাই নিয়ে। মুসলমানদের ভিতর তো গোড়ার থেকেই আছে; কিন্তু প্রশ্ন তার সুবিধে নেয় বাঙলাদেশের কি পরিমাণ মুসলমান নরনারী? অল্পই। তবে হিন্দুদের বেলা? আলোচনাটা জমলো ভালো, কারণ ডাক্তার আর আমি, হিন্দুদের অজানা, মুসলমানদের পারিবারিক ভিত্তি সম্বন্ধে তথ্য সাপ্লাই করলুম, আর হিন্দুরা তাই নিয়ে স্পেকুলেট করলেন।

বেগম সাহেব মুখ খুললেন না। তবে ওস্তাদের মার শেষ রাত। ট্রেন যখন শেয়ালদা পৌঁছল তখন তিনি মোক্ষম বাণ ছাড়লেন, 'হিন্দুদের মেয়ে-ইস্কুলে এখনো স্ট্যাণ্ডার্ড টেক্‌স্‌ট্‌ বুক ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ। আমার বান্ধবীর মেয়েকে দিন সাতেক আগেও পড়িয়েছি।'

দুই

হিন্দুরা বলে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। বোধহয় কথাটা সত্য, নইলে শহর্-ইয়ার আমার ক্যালিবারের লেখককে নিয়ে অতখানি মাতামাতি করবে কেন? এদেশে তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় মুসলমান লেখক নেই, কাজেই আলী, আলীই সই। কথায় আছে, বিপদে পড়লে শয়তান তক্ মাছি ধরে ধরে খায়।

উপস্থিত অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাছিই শয়তান খাবে। কথাবার্তায় তো মনে হলো ডাক্তার পরিবার কলকাতার খানদানীদের একটি। অতএব নিশ্চয়ই উত্তম মোগলাই খানাপিনার অনটন হবে না। সুভাষিতের একটি দোহা সামান্য ট্যারচা করলে অর্থ দাঁড়ায় 'পণ্ডিতদের সবই গুণ; দোষের মধ্যে এই যে, ব্যাটারা বড় মূর্খ।' হিন্দুদের বেলাও তাই। ওদের অনেক গুণ; দোষের মধ্যে এই যে. তারা মাংস রাঁধতে জানে না। সেটা মেরামৎ করার জন্য সমস্ত জীবন ধরে জীবনটা তো ওদের সঙ্গেই কাটালুম—চেষ্টা দিয়েছি। মাতাল যেমন গাঁঠের পয়সা খর্চা করে অন্যকে মদ খেতে শেখায়, পরে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেশাটি করবে বলে, আমিও তেমনি বিস্তর হিন্দুকে গায়ে পড়ে মোগলাই শেখাবার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখাবার মেহন্নৎ বরদাস্ত করেছি, পরে তারই মেওয়াটি খাবো বলে, কিন্তু হলে কি হয়, ঐ যে মুসলমানরা বলে হিন্দুরা বড় সঙ্কীর্ণচেতা, আপন ধর্মের গণ্ডীর ভিতর কাউকে 'ভাইব্রাদার' বলে নিতে চায় না, রান্নার বেলা অন্তত নিশ্চয়ই তাই। তা সে যাক্ গে, এখন যখন শহর্-ইয়ার গঙ্গোদক জুটে গেছে তখন কূপোদকের কি প্রয়োজন।

কিন্তু হায় নল রাজার ভাজা মাছটির মত আমার মুর্গ্-মুসল্লমগুলো হঠাৎ প্যাখনা গজিয়ে ডানা মেলে 'কোক্কোরো' রব ছেড়ে হাওয়ায়

মিলিয়ে গেল। ট্রেনে কথা ছিল, যেখানেই উঠি না কেন, ডাক্তার-পরিবারে প্রথম একটা ডিনার দিয়ে 'মুখবন্ধ' অবতরণিকা সেরে পরের পরিপাটি ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে উঠেই দেখি আমার নামে টেলিগ্রাম—তদ্দণ্ডেই শান্তিনিকেতন ফিরে যেতে হবে।

সে রাত্রেই আপার-ইণ্ডিয়া ধরতে হলো। রেলের মোন্দার ঠেলেঠুলে একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিলে।

ঘণ্টু বাগচীকে বরাত দিতে এলুম সে যেন আমার আকস্মিক নির্ঘণ্ট পরিবর্তনটা শহ্‌র্-ইয়ার বানুকে জানিয়ে দেয়। আমার রাঢ়ী, বৈদিক, কুলীন, মৌলিক মেলা চেলা আছে, কিন্তু মুসলমানকে ট্যাক্‌ল্ করতে হলে বারেন্দ্রই প্রশস্ততম। ওরা এখনো বদনা ব্যবহার করে।

বোলপুরে ফিরে হপ্তা তিনেক সাধনার ফলে মুর্গী রোস্টের শোক ভুলে গিয়ে যখন পুনরায় ঝিঙে-পোস্ত, কলাইয়ের ডাল আর টমাটোর টকে মনোনিবেশ করছি এমন সময় শুনি তীব্র মধুর বামা-কণ্ঠ। আমার বাড়িটা একেবারে শ্মশানের গা ঘেঁষে অর্থাৎ লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে। বামা-কণ্ঠ কেন, কোনো কণ্ঠই সেখানে শোনা যায় না। বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, শহ্‌র্-ইয়ার, দূরে ডাক্তার, তারো দূরে প্রাচীন যুগের ইয়া লাশ মোটর গাড়ি।

আমার মুখ দিয়ে কথা ফোটে নি। শহ্‌র্-ইয়ার পুরো-পাক্কা বাঙালী-মুসলমানী কায়দায় মাটিতে বসে, মাথায় ঘোমটা টেনে, দু'হাত দিয়ে আমার দু'পা ছুঁয়ে সালাম করলো। আমি তাকে দোয়া জানালুম, মনে মনে দরূদ পড়লুম।

এবারে দেখি ওর ভিন্ন রূপ। আমি আশঙ্কা করেছিলুম সে কলরব করে নানান অভিযোগ আরম্ভ করবে—খবর না দিয়ে চলে এলুম, এসে একটা চিঠিপত্র দিলুম না—বাকি আর বলতে হবে না; মেয়েরা ফরিয়াদ আরম্ভ করলে যাদুকরের মত ফাঁকা বাতাস থেকে ফরিয়াদের খরগোশ বের করতে পারে।

শুধু অত্যন্ত নরম গলায় বললে, 'আমরা কোনো প্রকারের খবর না দিয়ে এসে আপনাকে কোনো বিপদে ফেলি নি তো ?'

আমি বললুম, 'আমি সত্যই ভারী খুশী হয়েছি যে আপনারা আমাকে আপন জন ভেবে কোনো প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা এখানে চলে এসেছেন বলে।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে পৌঁচেছেন। তার সঙ্গে কোলাকুলি করে তাঁকেও সেই কথা বললুম এবং যোগ করলুম, 'আপনারা জানেন না, এদেশে আমার খুব বেশি আপন জন নেই।'

শহর্-ইয়ারের চোখ দুটি বোধহয় সামান্য একটু ছলছল করছিল। বললে, 'আমাদেরও বেশির ভাগ আপনজন পাকিস্তান চলে গিয়েছেন। আমার দাদারা, দিদিরা সবাই। সেদিক দিয়ে আমার কর্তা লাকি।'

আমি কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার প্রায় হাতজোড় করে বললেন, 'আমার একটা গরীবানা আর্জ্ আছে।'

আমি বললুম, 'কী উৎপাত। আমাকে চিনতে আপনার ক'শতাব্দী লাগবে ?'

''তা হলে বলি ; আপনার চেলা ঘণ্টুবাবু এসেছিলেন আপনার চলে যাওয়ার খবর দিতে। উনি সত্যি আপনার আপন জন। তাঁকে ইনি নানা রকমের প্রশ্ন শুধোন--এ জায়গা সম্বন্ধে। ঘণ্টু-বাবু বললেন, আপনি নাকি বাজার-হাট থেকে অনেক দূরে থাকেন. এবং চাকর-বাকর কামাই দিলে নাকি শুধু টিন্-ফুড খেয়ে চালিয়ে দেন। তাই আমরা এটা-সেটা কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি। যদি—'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য ! নদীতে চানে যাবার সময় কলসী ভরে জল নিয়ে যাওয়া আহাম্মুখী, কিন্তু আমার এই সাহারা-নিবাসে জল না নিয়ে আসা ততোধিক আহাম্মুখী। আপনি সমূচা হগ্-বাজার কিনে এনে থাকলেও অন্তত আমার কোনো আপত্তি নেই। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দি ; হাত মুখ ধোবেন।'

আমার লোকটি খুব মন্দ রাঁধে না। সে-বিষয়ে আমার অত্যধিক দুশ্চিন্তা ছিল না।

বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ দেখি শহর্-ইয়ার তালগাছ সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে একা একা চলেছেন রেল লাইনের দিকে। আমি বসার ঘরে ঢুকলুম ডাক্তারের খবর নিতে। তিনি দেখি আমার জর্মন এনসাইক্লোপীডিয়া খুলে একটার পর একটা ছবি দেখে যাচ্ছেন—আরামসে বড় কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে। আমি যেতেই বললেন, 'শহর্-ইয়ার বেড়াতে বেরিয়েছে; ও একা থাকতে ভালোবাসে আবার, মজার কথা, খানিকক্ষণ পরে সঙ্গী না হলেও চলে না। এই দেখুন না, একশ কুড়ি মাইল ঠেঙিয়ে এল এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আর আপনার সঙ্গে দু'টি কথা না বলে হুট্ করে বেড়াতে চলে গেল একা একা।'

'তা আপনি সঙ্গে গেলেন না কেন?'

'ওর মূড্ আমি জানি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে বেধে নিয়ে যেতো—আমি শত আপত্তি জানালেও। বেড়াক না একটু আপন মনে। আপনার বাড়ির বড় সুবিধে—সিঁড়ি দিয়ে নামা মাত্রই বেড়াবার মাঠ আরম্ভ হয়ে গেল! কলকাতার হাল তো জানেন।' তারপর একটু থেমে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ, আপনার ডেলি রুটিন আমাদের আসাতে যেন আপসেট্ না হয়।'

আমি হেসে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে থাকুন, ডাক্তার, আমার রুটিন বলে কিছু নেই। আম শুধু বলি, এন্‌জয় ইয়োরসেলভস। আচ্ছা, এখুন চলুন না, আমরা ম্যাডামকে খোঁয়াইডাঙার মাঝখানে গিযে আবিষ্কার করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এখানে এই বিরাট খোলামেলার মাঝখানে যে কি রকম টপ করে অন্ধকারটি ড্রপ করেন সেটা শত্তুরেরা অনুমানও করতে পারে না।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বললুম, 'ঐ ওখানে যে গোটা দুই

ভিতের মত ঢিপি দেখতে পাচ্ছেন ঐটেই এ অঞ্চলের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। সেখানে উঠলেই ঠাহর হয়ে যাবে বীবী কোথায় কবিত্ব করছেন।'

ডাক্তারটি স্বল্পভাষী। আমি শুধালুম, 'আপনি ডাক্তারির কি নিয়ে কাজ করছেন?'

বললেন, 'এখনো ঠিক হদীস পাচ্ছিনে। ভাবছিলুম, যমজ, বামন এদের স্কেলিটেন নিয়ে।'

আমি বললুম, 'ডক্টর ইয়াংকার যা নিয়ে—'

তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শুধোলেন, 'আপনি জানলেন কি করে?'

আমি বললুম, 'আপনারা দু'জনাই বড় সরল আর কর্তাভজা।' 'কর্তাভজা' ইচ্ছে করেই বললুম। 'কর্তার গুণ আছে কি না চিন্তা পর্যন্ত করেন না। আপনি খুব ভালো করেই জানেন, আমি ডাক্তারির কিছুই জানিনে; অতএব ইয়াংকারকে চেনা আমার পক্ষে আকস্মিক যোগাযোগ বই আর কিছু না। বন্ শহরে আমি যখন পড়্তুম তখন তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার সংস্কৃতের অধ্যাপকের বন্ধু ছিলেন। মোটামুটি ঐ সময়, অর্থাৎ ১৯৩৩/৩৪-এ তিনি পুরো মানুষের এক্সরে নেবার কল আপন হাতে বানান। ও-সব কথা আরেক দিন হবে। এই তো পৌঁছে গেছি আমাদের এভারেস্টে, আর ঐ—ঐ যে—দুটো তাল গাছের মাঝখানে বসে আছেন বেগম সাহেবা।'

অতদূরে আমাদের সাধারণ কথাবার্তার কণ্ঠস্বর পৌঁছনোর কথা নয়। কিন্তু এই নির্জনতার গভীরতম নৈস্তব্ধ্যে বোধহয় ধ্বনি ও টেলিপ্যাথির মাঝখানে এক তৃতীয় ট্রান্স্মিটারহীন বেতারবার্তা বহন করে। শহর্-ইয়ার হঠাৎ অকারণে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আমাদের দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার 'আলসেশিয়ান 'মাস্টার' তাঁর দিকে ছুট লাগালো।

মাঝপথে দেখা হতেই আমি বললুম, 'আত্মচিন্তার জন্য এ ভূমি প্রশস্ততম।'

বানু বললেন, 'না, আমি "শব্‌নমের" কথা ভাবছিলুম।'

আমি বললুম, 'দেখুন, ম্যাডাম, আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তাই করবো। ঐ তাল গাছটা যদি চড়তে বলেন তারও চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি কিন্তু একটি জিনিস করতে আমার সাতিশয় বিতৃষ্ণা। আপনারা দু'জনাই আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট; তাই যদি আমি করজোড়ে একটি মেহেরবানী—'

শহ্‌র্-ইয়ার যদি বটতলার চার আনা দরের সাক্ষীর পেশা কবুল করতেন, তবে তিনি ও-লাইনের সুলতানা রিজিয়া হতেন নিশ্চয়ই। উকীল আধখানা প্রশ্ন শুধোতে না শুধোতেই বটতলার ঘড়েল সাক্ষী আমেজ করে ফেলে, উকিলের নল কোন দিকে নিশানা করেছে। আমাকে বাধা দিয়ে শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'আর বলতে হবে না। ট্রেনে বেশ ধমক দিয়ে বলেছিলেন আপনি নিজের রচনা নিয়ে আলোচনা পছন্দ করেন না, এখানে সেটা ভদ্রভাবে বলতে যাচ্ছিলেন—এই তো? আচ্ছা, আমি মেনে নিচ্ছি, যদিও অতিশয় অনিচ্ছায়। শুধু একটা শেষ প্রশ্ন শোধাবো; আপত্তি আছে?'

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললুম, 'চালান গাড়ি! ফাঁসীর খানা খেয়ে নিন।'

'শব্‌নমের সঙ্গে সেই শেষ বিরহের পর আপনাদের আবার কখনো দেখা হয়েছিল?'

আমি বললুম, 'এ প্রশ্ন একাধিক পাঠক-পাঠিকা আমাকে বাচনিক, পত্র মারফৎ শুধিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একজন হিন্দু মহিলা; পাবনার মেয়ে স্কুলের হেডমিস্‌ট্রেস্। অন্যদের আমি এ প্রশ্নের, উত্তর দি না। এঁর বেলা ব্যত্যয় করলুম। লিখলুম, "মহাশয়া, আপনি ও, যখন পাবনা সেকেণ্ডারি স্কুলের হেডমিস্‌ট্রেস তবে নিশ্চয়ই অ

স্কুল রাজশাহী ডিভিজনে পড়ে। আমার স্ত্রী সেখানকার স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস। তিনি যখন আবার আপনার স্কুল দেখতে আসবেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে পাকা উত্তর পাবেন।" আপনাকে ঠিক তা বলছিনে। তবে তারই কাছাকাছি। আমার গৃহিণী বছরে একাধিকবার পুত্রদ্বয়সহ এখানে আসেন। পথিমধ্যে কলকাতায় কয়েকঘণ্টা জিরোতে হয়। এবার না হয় আপনাদের ওখানেই উঠতে বলবো।'

শহ্‌র-ইয়ারকে সেই ট্রেনে দেখেছিলুম উল্লাসে লম্ফ দিতে, আর দেখলুম এই। সেবারে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের, এবারে অবিমিশ্রিত উল্লাসের। শুধোলেন, 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবো তো?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! সেটা আপনাদের দু'জনকার একান্ত নিজস্ব, অল রাইট্‌স্ রিজার্ভড কারবার। সেখানে আমিই বা কে, আর ডাক্তার জুল্‌ফিকারই বা কে? কি বলেন ডক্?'

ডাক্তার বললেন, 'আমার বীবী কি আলোচনা করবেন আর কি করবেন না তার উপর আমাকে আমাদের ইমাম আবু হানিফা সাহেব কোনো হক্ দিয়ে থাকলেও—খুব সম্ভব তিনি দেন নি—আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি হক্ চাইনে—আমি চাই শান্তি।'

আমি বললুম, 'আমেন, আমেন! হায়, এই না-হক্কের উপর গড়া দুনিয়ার সিকি পরিমাণ স্বামী-সমাজ যদি আমাদের ডাক্তারের এই মহামূল্যবান তত্ত্বকথাটি মেনে নিত তবে বাদবাকী তাঁদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডিভোর্স প্রতিষ্ঠানটির উচ্ছেদ সমাপন করতো।'

ইতিমধ্যে আমরা বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।

বহু শহ্‌র-ইয়ারকে বললুম, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে আমি গিয়েছিলুম। আমার কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভালো ভালো রেকর্ড 'মাস্টার' তার বেশির ভাগ 'না কাম, না অর্থ' নাইদার ফর লাভ নর ফর

মানি আজ আর পাওয়া যায় না। যখন খুশী বাজাবেন। রাত তিনটেয় বাজালেও আমার আহার-শয্যাসন-ভোজন কোনো-কিছুরই ব্যাঘাত হয় না।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললে, 'আমি এখ্‌খুনি দেখবো।' হুট্ করে চলে গেল।

আমি বললুম, 'ডাক্তার, আপনার বাঙলাতে বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ থাকে। এটা কি আপনাদের পরিবারেরই বৈশিষ্ট্য, না আপনাদের গোষ্ঠীর, কিংবা আপনারা যে মহল্লায় বাস করেন?'

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি একটি আস্ত অশিক্ষিত প্রাণী। চিকিৎসাশাস্ত্র—আমি বলি স্বাস্থ্যশাস্ত্র, তার মানে হাইজীন নয়—আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করেছে যে আমি যেটুকু সামান্য সাহিত্য, ইতিহাস এমন কি গণিত ইস্কুল-কলেজে পড়েছি সে সব ভুলে গিয়েছি। শহ্‌র্-ইয়ারের সঙ্গে একই জিনিস উপভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একাধিকবার চেষ্টা করেছি তার সব শখের বিষয়ে দিল্-চস্‌পী নিতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। সে এক ট্রাজেডি—সে কথা পরে হবে। তা সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই, আপনি যে প্রশ্ন শুধিয়েছেন সেটার উত্তর দিতে হলে যে সব বিষয় জানার দরকার তার একটাও আমি জানিনে। তবে যেটুকু শুনেছি তার থেকে বলতে পারি, জব চার্ণকের আমলের তো কথাই নেই, এমন কি ক্লাইভের সময় এবং তার পরও কোনো ভদ্র মুসলমান এবং হিন্দুও নবাবের মুর্শিদাবাদ, খানদানী-ঢাকা ছেড়ে এই ভুঁইফোড় আপ্‌স্টার্ট কলকাতায় আসতে চায় নি। আমার পিতৃপুরুষ আসেন রাজা রামমোহন রায়ের আমলে, বাধ্য হয়ে, কোনো রাজনৈতিক কারণে। তাঁরা আপোসে কি ভাষা বলতেন, জানিনে, তবে আমার ঠাকুরদার আমল পর্যন্ত তাঁরা ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে লেখেন নি। আমার পিতা 'হুতোমের' ভাষা বলতে পারতেন, কলকাতার উর্দু ডায়লেকট এবং উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ দরবারী উর্দু ও,

কিন্তু আমার মা ছিলেন খাস শান্তিপুরের মেয়ে। তিনি উর্দু জানতেন না এবং সেটা শেখবার চেষ্টাও করেন নি। আমাকেও কেউ উর্দু শেখাবার চেষ্টা করে নি। ফলে আমি যে কোন্ বাঙলা বলি সে আমিও জানিনে। খুব সম্ভব ডাইলিয়ুটেড হুতোম। আমার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা আমার ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করতো। কিন্তু তাদেরই একজন—খানদানী কলকাত্তাই সোনার বেনে—আমাকে বলেছিল, তার ঠাকুরমা আমারই মত বাঙলা বলেন।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য! বাঙলা ভাষা কী তাড়াতাড়ি তার ভোল বদলেছে! ভারতচন্দ্র এমন কি আলাল হুতোম দু'জনাই আপনার চেয়ে বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য বেনামী লেখাতে বিদ্যেসাগর মশাই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন হুতোমের চেয়ে কম। কিন্তু তিনিও যা করেছেন সেটা নগণ্য নয়। আজ যদি প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বিদ্যেসাগর কলকাতায় নেমে আড্ডা জমান তবে তাই শুনে বোধ হয় আপনার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা ভিরমি যাবেন। কাজেই আমার পরামর্শ যদি নেন তবে বলবো, আপনার ভাষা বদলাবেন না। কেউ যদি মুখ টিপে হাসে, হাসুক। আমার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও অত্যন্ত সংস্কৃতঘন বাঙলা বলেন—যেমন 'হপ্তা দুত্তিন' না বলে বলেন 'পক্ষাধিককাল' এবং তাই শুনে হিন্দু মুসলমান উভয়ই কৌতুক অনুভব করে। তাতে কি যায় আসে?'

এমন সময় শহর্-ইয়ার চিন্তাকুল ভাল নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত শুধোলেন, 'আপনার রেকর্ড-সঞ্চয়ন অদ্ভুত। আপনি বাছাই করেছিলেন কি ভাবে?'

আমি হেসে বললুম, 'কোনো ভাবেই না। আমি বরদায় ছিলুম ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪। এই সময়টার মধ্যে যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বেরিয়েছে তাই কিনেছি—কোনো প্রকারের বাছবিচার না করে। তার বহু বৎসর পর মোহরদি দু'চারখানা রেকর্ড আমাকে দেয়—

ব্যস্। ৪৪-এর পর, আজ পর্যন্ত, কোথাও ভালো করে আসন পেতে বসতে পারি নি। ফলে কলেকশন্‌টা বাড়াতে পারি নি। সে নিয়ে আমার কোনো মনস্তাপ নেই।

"সাধের জিনিস ঘরে এনেই
এনে দেখি লাভ কিছু নেই।
খোঁজার পরে চলে আবার খোঁজা।"

চলুন মাদাম, চলুন মসিয়ো ল্য দক্‌ত্যোর,

দুইটি বস্তু প্রতি মানবেরে টানিতেছে বরাবর।
দানাপানি টানে একদিক থেকে অন্যদিকেতে গোর॥
দো চীজ্ আদম্‌রা কশদ্ জোর্ জোর্
য়কী আব্ ও দানা দিগর খাক্-ই-গোর

ঐ তো এ-বাড়ির দানা-পানির প্রতীক দিলবর জান্ সশরীরে উপস্থিত। আমি তার রান্নার প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করবো না। আপনি শহ্‌র্-ইয়ার বানু যখন এখানে রয়েছেন তখন আহারাদির জিম্মেদারী আপনার।'

শহ্‌র্-ইয়ার শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আপনার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা ট্যাবু; তার উল্লেখ না করে বলছি, আপনি খেতে ভালোবাসেন সে-কথা আমি জানি, কিন্তু—'

আমি যেন আসমান থেকে পড়ে তাঁর বক্তব্যে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনিও পেঁচি-টেপির মত এই ভুলটা করলেন? লেখার সঙ্গে জীবনের কতখানি সম্পর্ক? রবিঠাকুর নিদেন হাজারটি প্রেমের কবিতা লিখেছেন। অতএব, তিনি সমস্তক্ষণ প্রেমে পড়ার জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন? সেই সুদূর ইয়োরোপে বসে মাইকেল কপোতাক্ষীর স্মরণে কি যেন লিখেছেন—'সতত পড় হে নদী আমার স্মরণে'; ফিরে এসে সামান্যতম চেষ্টা দিয়েছিলেন এক ঘণ্টার তরেও ঐ নদীর পারে যাবার! এ তো আমি চিন্তা না করেই বলছি। খুঁজলে এমন সব উদাহরণ পাবেন যে আপনার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

একাধিক কবি লিখেছেন, আ মরি আ মরি গোছ প্লাতোনিক, দেহাতীত শিশির-বিন্দুর ন্যায় পূতপবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের কবিতা—ওদিকে, তাঁদেরই একজন, হাইনে, বেরুতেন নিশাভাগে প্যারিসের কুখ্যাত—নেভার মাইণ্ড, আপনি ডাক্তারের স্ত্রী, সহজে শকট্ হবেন না—'

'এবং আমাদের বিয়ে হয়েছে দশটি বছর আগে,' বললেন শহর-ইয়ার।

তিন

'একি! আপনি এখানে!'

বাড়িটার একাধিক বারান্দা, তার একাধিক প্রান্তে একান্তে অন্তরালে বসে থাকা যায়। তারই একটাতে বসে আমি পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়েছিলুম। আজ কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী বা সপ্তমী, রাত প্রায় এগারোটা, একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তারই আভাস লেগেছে তালের সারিতে। ঘরের ভিতরে শহ্‌র্-ইয়ার রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাচ্ছিল। তার বাজানোর পদ্ধতিটা সত্যই বিদগ্ধ। একটা গান বাজানোর পর অন্তত মিনিট দশেক পর আরেকটা বাজায়। অনেকক্ষণ ধরে তার কোনো সাড়া শব্দ শুনতে পাই নি বলে ভেবেছিলুম সে বুঝি শুতে গেছে। ডাক্তার আমার ঘরে পেয়ে গেছেন ন্যুর্ন্‌বের্ক মোকদ্দমার একখানা বই—যেটাতে যুদ্ধের সময় নাৎসি ডাক্তারদের অদ্ভুত অদ্ভুত এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই তিনি সেই বই নিয়ে রাতের মত উধাও।

শহ্‌র্-ইয়ার বারান্দার নিভৃত প্রান্তে আমাকে আবিষ্কার করলেন।

আমি বললুম, 'ঠিক সময়ে এসেছেন। একটু পরেই চাঁদ উঠবে আর এই জায়গাটা থেকেই সে দৃশ্যটি সব চেয়ে ভালো দেখা যায়। ডাক্তারের ঘরে তো এখনো আলো জ্বলছে; ওকে ডেকে আনুন না।'

শহ্‌র্-ইয়ার চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'শুনুন, আপনার সঙ্গে সোজাসুজি পরিষ্কার কথা হয়ে যাওয়াই ভালো। আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কি আমার সঙ্গ পেলে আপনার অস্বস্তি বোধ হয়?'

ঠিক ধরেছেন! আমার বোঝা উচিত ছিল শহ্‌র্-ইয়ারের বুদ্ধি এবং স্পর্শকাতরতা দুইই তীক্ষ্ণ। কিন্তু আমি এর উত্তর দেব কি?

আমি বললুম, 'না। কিন্তু তিনি যদি সেটা পছন্দ না করেন তবে আমি দুঃখিত হব।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনি তো জ্ঞানী লোক ; আপনি তো বুঝবেন যে, তাঁর কোনো আপত্তি থাকলে তিনি আমাকে আপনার এখানে নিয়ে আসবেন কেন ?'

আমি বললুম, 'আমাদের এই বাঙলাদেশে মুসলমান মেয়েরা সবে মাত্র অন্দর মহল থেকে বেরিয়েছেন। এঁরা পরপুরুষের সঙ্গে কিভাবে মেলা-মেশা করবেন, কতখানি কাছে আসতে পারবেন এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, থাকার কথাও নয়। ইয়োরোপে এ বাবদে মোটামুটি একটা কোড্ তৈরী হয়ে গিয়েছে, কয়েক পুরুষের মেলা-মেশা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। এই দেখুন না, কন্টিনেন্টের একটা মজার কোড্। নাচের মজলিসে কোনো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হলো, কিন্তু পরিচয়টা তাঁর স্বামী করিয়ে দেন নি। এস্থলে আমি যদি মহিলাটির সহিত ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি তবে লোকে আমাকে আর যা বলে বলুক 'ছোট লোক' বলবে না। পক্ষান্তরে স্বয়ং স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন, এবং তারো বাড়া, যদি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দাইয়ে—এবং তারপর যদি স্বামীর অজানতে আমি মহিলার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করি তবে সমাজ আমাকে বলবে, 'ছোট লোক', 'নেমকহারাম'। ভাবখানা এই, ভদ্রলোক তোমাকে বিশ্বাস করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, আপন স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আর তুমি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করলে! আবার—'

আমার 'লেকচার' আর শেষ হল না। ইতিমধ্যে শুনি শহ্‌র্-ইয়ার খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করেছেন। হাসি আর কিছুতেই থামে না। ইয়োরোপীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার এই পর্যবেক্ষণে এতখানি হাসবার কি থাকতে পারে, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

হাসি পুরো থামার পূর্বেই শহ্‌র্-ইয়ার বলতে লাগলেন, এবং বলার মাঝে মাঝেও চাপা হাসি কলকলিয়ে উঠলো—'আপনি কি বেবাক ভুলে গেলেন, ট্রেনে আমি নিজে, স্বেচ্ছায়, গায়ে পড়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে উইদাউট এনি প্রোভোকেশন আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলুম ?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! আমি এমনি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলুম। আমি কি আর আপনি আমি ডাক্তারের কথা ভাবছিলুম ?'

শহ্‌র্-ইয়ার তবু হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, খুব ভালো করেই বুঝেছি। ইয়োরোপের উদাহরণ যে এদেশে খাটে না সে আমি ভালো করেই জানি। ইয়োরোপের কেন, বাঙালী হিন্দুর উদাহরণও আমাদের বেলা সর্বক্ষেত্রে খাটে না, সেও তো জানা কথা। জানেন, এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি।'

যে সাহিত্য মানুষ পড়ে সেটা যে তার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এ তো জানা কথা। বাঙলা সাহিত্য গড়ে তুলেছে হিন্দুরা। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ। সৈয়দ আলাওল বা নজরুল ইসলাম তো এমন কোনো জোরালো ভিন্ন আদর্শ দিয়ে যান নি যার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই হিন্দুর গড়া বাঙলা সাহিত্যে বিবাহিতা নারীর আদর্শ কি, সে তো সবাই জানে। সে সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী এবং সর্বোপরি সে পতিব্রতা। ওদিকে দেখুন আপনার স্ত্রী আপনার সহধর্মিণী নাও হতে পারেন, তিনি যদি খৃষ্টান হন। এবং এই 'পতিব্রতার' আদর্শটা আমাদের মুসলমানদের ভিতর তো ঠিক সে রকম নয়। কোনো সন্দেহ নেই, স্ত্রী সেবা করবে, ভালো বাসবে তার স্বামীকে, তার সুখদুঃখের ভাগী হবে, তার আদেশ মেনে চলবে—কিন্তু, এখানে একটা বিরাট কিন্তু আসে—স্ত্রী তার সর্বসত্তা সর্বব্যক্তিত্ব সর্বঅস্তিত্ব স্বামীতে লীন করে দিয়ে 'পতিব্রতা' হবে এ কনসেপশন তো আমাদের ভিতর নেই। খুব একটা বাইরের মামুলী

উদাহরণ নিন। আমার আব্বাজানের নাম মুহম্মদআল্লা বখ্‌শ্‌ খান—তাঁর পূর্বপুরুষ পাঠান হন আর নাই হন, তাঁরা সাতপুরুষ 'খান' উপাধি ব্যবহার করেছেন। আমার আম্মা আবার চৌধুরী বাড়ির মেয়ে—তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত নাম সই করেছেন মিহ্‌রুন্নিসা চৌধুরী। তিনি মাত্র কয়েক বছর হলো ওপারে গেছেন। শেষের দিকে সবাই যখন হাল ফ্যাশানমাফিক তাঁকে বেগম খান, মিসেস খান বলে সম্বোধন করছে তিনি তখনো সই করছেন, মিহ্‌রুন্নিসা চৌধুরী।'

আমি শুধালুম, 'সমস্যাটা ঠিক কোন্‌খানে আমি বুঝতে পারছিনে। অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান মেয়ের বিশেষ সমস্যাটা কোন্‌খানে?'

শহর্‌-ইয়ার বড় মধুরে হাসল। বললে, 'আমার মগজটা বড্ডই ঘোলাটে আর হৃদয়—সেটা যেন ফেটে ফেটে বেরুতে চায়, তাই না আপনাদের বাঙাল মেয়ে বলেছে,

'ইচ্ছা করে কলিজাডারে
গামছা দিয়া বান্ধি—

শুনুন। হিন্দু মেয়েরা অন্দর থেকে বেরিয়েছেন কবে? বছর তিরিশের বেশী হবে না। অথচ স্বরাজ লাভের ফলে এবং অর্থনৈতিক অবনতি বশতঃ কিংবা আকাশে বাতাসে এক অভিনব সর্বব্যাপী স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্ট হওয়ার দরুন এই দশ পনরো বৎসরেই মুসলমান মেয়েরা দ্রুত হিন্দুদের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। গত ত্রিশ বৎসর ধরে হিন্দু মেয়েরা এই যে তাদের আংশিক স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জানা-অজানায় চেষ্টা করছে সে স্বাধীনতা ঠিক কি ভাবে কাজে লাগাবে, তার কোড্‌স্‌ কি, তার নর্‌ম্‌ কি। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত নিন। কন্টিনেন্টে কোনো মেয়ে যদি বিয়ের উদ্দেশ্য কিংবা অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই হোক তার পরিচিতের সংখ্যা বাড়াতে চায় তবে সে তার বান্ধবী—নিদেন ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে নাচের হলে যায়। পুরুষরা এসে বাও করে নাচবার জন্য নিমন্ত্রণ জানায়—তার জন্য কোনো ফর্মাল ইনট্রোডাকশন

দরকার নেই—এবং এই করে করে মেয়েরা যত খুশী তাদের পরিচিতের সংখ্যা বাড়াতে পারে। এদেশে এখনো সমস্তটা চান্‌স্। বান্ধবীর মাধ্যমে, আপিসের সহকর্মিণীদের মাধ্যমে যে আলাপ-পরিচয় হয় সেটাকে 'উটকো' মেথড—অর্থাৎ চান্‌স্ বলা যেতে পারে।

আমার বক্তব্য, হিন্দু মেয়েরা যে উদ্দেশে চলেছে সেটা মুসলমানদের ঠিক সুট করবে না।

একটা কথা তো ঠিক, স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্ নো স্ত্রী-স্বাধীনতা সাড়ে পনরো আনা মেয়ে বিয়ে করে মা হতে চায়। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে, আপনি স্বাধীন স্বেচ্ছায় হিন্দু মেয়ে বর বাছাই করে নিয়ে হবে—কি হবে ?—পতিব্রতা।

মুসলমান মেয়েও ঠিক ঐ একই পন্থায় আপন স্বামী বেছে নেবে কিন্তু সে হিন্দু মেয়ের মত পতিব্রতা হওয়ার আদর্শ বরণ করে নিতে পারবে না। দোহাই আল্লার, তার অর্থ এই নয় যে সে অসতী হবে —তওবা, তওবা !—তার অর্থ, আবার বলছি, সে তার সর্বসত্তা স্বামীতে বিলীন করে দিতে পারবে না।

আপনি ভাববেন না, আমি কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সে-কথা বলছি—আমি শুধু পার্থক্যটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।'

আমি বললুম, ''পতিব্রতা' পতিব্রতার আদর্শ আজকাল হিন্দু রমণীরা কি আর খুব বেশী বিশ্বাস করে ? আর 'আজকালই' বলছি কেন ? ইংরেজী সভ্যতা-কৃষ্টির সংস্পর্শে এসে তারা সতীদাহ বন্ধ করলো, বিধবা-বিবাহ আইন পাস করালো, তারপর সিভিল মেরিজ যার ভিতর তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে, হালে হিন্দুশাস্ত্রমত বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের ভিতরও তালাকের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে।'

শহর্-ইয়ার বানু দেখলুম অনেক চিন্তা করে রেখেছেন। বললেন, 'সতীদাহ বন্ধ করাটা হিন্দুকে মেনে নিতে হয়েছে, নইলে সাজা পেতে হয়। কিন্তু যেখানে বাছাই করার স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে

হিন্দু নারী কোন্‌টা বরণ করেছে? এ যাবৎ কটা বিধবা বিবাহ হয়েছে—'

আমি বললুম, 'মুসলমান মেয়েদের ভিতরই বা কটা হয়? কিংবা ধরুন তালাক। এদেশের মুসলমান ভদ্রসমাজে কি আরবিস্তানের আধার আধারও তালাক হয়?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'আরবিস্তানে তালাক দেয় পুরুষে—মেয়েদের তালাক দেবার অধিকার এতই সীমাবদ্ধ যে সে-অধিকার আদপেই নেই বললে চলে। আমি মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তুলছি—যেমন বিধবা-বিবাহ। প্রশ্ন উঠবে, আরো অধিক সংখ্যক মুসলিম বাল-বিধবা বিয়ে করল না কেন?

আসলে কি জানেন, পরাধীন অবস্থায় মানুষে মানুষে পার্থক্য কমতে থাকে; স্বাধীন অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয়। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানা কারণে এদেশের হিন্দু মুসলমান রমণী উভয়ই ছিল স্বাধীনতালুপ্ত হারেমবদ্ধ (বরঞ্চ আফগানিস্তান, ইরান আরবের মেয়েরা বোরকা পরে রাস্তায় বেরোয়, আত্মীয়স্বজনের মোলাকাৎ করে এমন কি বাজার-হাটেও যায়—এদেশে সে ব্যবস্থাও ছিল না)। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় দুইই এক। এই যে আপনার ড্রইংরুম—এর ভিতর ডার্বি ঘোড়া এবং ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াকে ছেড়ে দিলে দুজনাই ছুটবে মোটামুটি একই বেগে। কিন্তু ছেড়ে দিন আপনার বাড়ির সামনের খোলা মাঠে। তখন কোথায় ডার্বি, আর কোথায় ছ্যাকড়া! যার যার ভিতরকার সুপ্ত বৈশিষ্ট্য তখন পরিপূর্ণ মাত্রায় চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়।

অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসুক হিন্দু-মুসলমান দুই নারীই; তখন দেখতে পাবেন তাদের পার্থক্য কোন্ জায়গায়।

আবার বলছি, কসম আল্লার, আমি আদৌ বলছি না, মুসলমান মেয়ে হিন্দু মেয়ের চেয়ে সুপেরিয়র; আমি বলছি, সে ডিফরেন্ট।'

এমন সময় দুটো তালগাছের মাঝখান দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ একটা গাছের উপর ঈষৎ হেলান দিয়ে আকাশের পূর্বপ্রান্ত আলোকিত করে দিলেন।

শহ্‌র্-ইয়ার বললে, 'আহ্! বড় সুন্দর এ জায়গাটা। অতএব এখন থাক নারী সমস্যা!'

চুপ করে তাকিয়ে আছি ল'বাবুর বাড়ির পরিত্যক্ত ভিটে ছাড়িয়ে, রেল লাইন পেরিয়ে তালসারির দিকে। বার বার এ দৃশ্য দেখেও আমি তৃপ্ত হইনে, কিন্তু এও সত্য শহ্‌র্-ইয়ারের আনন্দ তার এখানে আসা অবধি প্রত্যেক আনন্দ ছাড়িয়ে যায়। চুপ করে আছে বটে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ থেকে যেন সে-আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

ঘোরঘুট্টি অন্ধকার দূর করতে করতে চাঁদ আর কিছুক্ষণ পরেই তার জ্যোতিঃশক্তির শেষ সীমানায় পৌঁছবেন— এরপর রাতভর যে-আলো সেই আলোই থাকবে। আমি শহ্‌র্-ইয়ারকে বললুম, 'পূর্ণিমা চাঁদের যেন বড় দেমাক, অন্তত এর তুলনায়। আচ্ছা, একবার ডাক্তারকে ডেকে দেখালে হয় না?'

বললে, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু কি জানেন, উনি নিজেই বলেন, এসব দৃশ্যের সৌন্দর্য তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু সেটা তার হৃদয় স্পর্শ করে না। ওদিকে অসম্ভব ভদ্রলোক বলে আমরা যতক্ষণ চাই তিনি আমাদের সঙ্গ দেবেন—এবং বিশ্বাস করবেন না, সানন্দে। এবং তাতে কণামাত্র ভণ্ডামি নেই। ঠিক সেই রকম শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। দরকার হলে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব নিয়ে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কারণ সমস্ত সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি কঠোর কঠিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করেছেন। জানেন, একবার একটি অজানা অচেনা তরুণ গাওয়াইয়াকে এক জলসায় গোটাকয়েক দম্ভী অযথা আক্রমণ করে—ঘরানা ঘরানায়

আড়াআড়ি তো এদেশে একটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। কেন জানিনে উনি গেলেন ক্ষেপে—অবশ্য বাইরে তার কণামাত্র প্রকাশ তিনি হতে দেন নি, কখনো দেন না, একমাত্র আমিই শুধু বুঝতে পেরেছিলুম—এবং তারপর সে কি তর্কযুদ্ধ! শুধু যে সেই তরুণের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান সপ্রমাণ করে দিলেন তাই নয়, তার বিরুদ্ধপক্ষের মহারথীদের সঙ্গীতশাস্ত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে নিরপেক্ষ পাঁচজনের মনে গভীর সন্দেহ জাগিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অথচ তিনি আমাকে বহুবার বলেছেন, সঙ্গীত তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে না! কী জানি, হয়তো ডাক্তারি শেখার পূর্বে রস গ্রহণ করার ব্লটিং পেপারখানা করকরে শুকনোই ছিল; এখন সেটা চিকিৎসা-জ্ঞানে জবজব।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'কি জানি! আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসাটাও বোধ হয় ঐ ধরনের! তবে কিনা, বিয়ের দশ বছর পরে, এই ত্রিশ বছর বয়সে এটা নিয়ে চিন্তা করা বেকার!'

হঠাৎ উঠে বললেন, 'এবারে শুতে যাই। যে ঘরখানা আমায় দিয়েছেন তার জানলা দিয়ে মেটার্নেল আনকল মিঃ মূনের সঙ্গে মনে মনে রসালাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু তার পূর্বে একখানা শেষ রেকর্ড বাজাবো। বলুন, কি বাজাবো?'

আমি চিন্তা না করেই বললুম, '"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ কুসুম চয়নে।"'

পরের দিন ওরা চলে যাওয়ার সময় আমাকে দিয়ে যে শুধু কলকাতা আসার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল তাই নয়, শহর্-ইয়ার পাকা মহকুমা মোক্তারের মত ক্রস এগজামিনেশন করে করে একেবারে তারিখ এমন কি কোন্ ট্রেন ধরতে হবে সেটা পর্যন্ত ঠিক করে দিয়ে গেল। একাধিকবার বললো, 'এখানে তো দেখে গেলুম, আপনি কেভাবে থাকেন, আমাদের ওখানে সেভাবেই ব্যবস্থা করবো। আপনার খুব অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

'তিন দিন পরেই চিঠি :

১২ গোলাম সিদ্দিক রোড,
কলকাতা

'সালাম পর আরজ এই,

আপনার ওখানে কিভাবে আমার সময়টা কাটল সেটা আপনি নিজেই দেখেছেন।

আমরা আলোচনা করছিলুম, মুসলমান মেয়েদের নিয়ে, যারা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসছে ; বলুন তো, আপনার ওখানে গিয়ে আমি যে-আনন্দ ও বৈভব—গনীমৎ শব্দটা আরও ভালো—পেলুম, কটা মুসলমান মেয়ের ভাগ্যে সেটা জোটে ? আমরা যে কী গরীব সে তো আপনি জানেন না, কারণ আপনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন আপনার হিন্দু আত্মজনের সঙ্গে।

স্বাধীনতা বড় সম্পদ। আমরা, মুসলমান মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হচ্ছি কিন্তু সে-স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করার সুযোগ পাচ্ছি কই ? মনে হয়, আমি যেন একাকিনী কোনো নির্জন দ্বীপে বাস করছি ; প্যাঁটরায় লক্ষ টাকা কিন্তু কিনবো কি ? লোকালয়ে এই লক্ষ টাকা দিয়ে যে কত কিছু করা যায় সেটা না জানা থাকলে

ব্যঙ্গটা অতখানি নিষ্ঠুর মনে হতো না। এই লক্ষ টাকা বিলিয়ে দিয়েও আমি আনন্দ পেতুম। কিন্তু দেব কাকে?

আপনার ডাক্তার লেবরেটরিতে গেছেন সকাল সাতটায়; তাঁকে ফের পাবো রাত আটটায়—কপাল যদি মন্দ না হয়!

আপনি আমার বহুৎ বহুৎ আদাব তসলিমাৎ জানবেন।

খাকসার,

শহর্-ইয়ার।"

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা পড়লুম। এই প্রথম নয়, আগেও ভেবেছি, এ-মেয়ের অভাব কোন্‌খানটায়? স্বামী আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলে সে তার যথেষ্ট সঙ্গ পায় না—এইটেই দুঃখ? উঁহু, তা নয়। এ মেয়ে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষিতা নয়; এ মেয়ে বিদগ্ধা এবং এর কল্পনাশক্তি আছে। দিন-যামিনীর অষ্ট প্রহরের প্রত্যেকটি প্রহর নিঙড়ে নিঙড়ে তার থেকে কি করে আনন্দ-রস বের করতে হয় সে সেটা খুব ভালো করেই জানে। তাকে তাস মেলে 'পেশেনস্' খেলে দিন কাটাতে হবে না। এ মেয়ে গোপাল ভাঁড়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। গোপাল ঢেউ গুণে পয়সা কামিয়েছিল। এ মেয়ে ঢেউ গুণে আনন্দের ভাণ্ডার ভরে তুলবে। এবং বাড়ি ফিরে তাই দিয়ে হরিম্লুট লাগাবে।

আচমকা খেয়াল গেল, কই, আমার কলকাতা যাওয়ার কথা তো কিছু লিখলো না? যাক্‌গে—তার জন্য এখনো সময় আছে।

কোন্ এক পোড়ার বিশ্ববিদ্যালয় 'তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব' প্রবর্তন করতে চায়। আমাকে অনুরোধ করেছে প্ল্যানটা করে দিতে। সাধারণ অবস্থায় এসব বুনো হাঁস খেদাতে আমি তো রাজীই হই না, উল্টে কয়েকটি সরল প্রাঞ্জল বাক্যে এমন সব আপত্তি উত্থাপন করি যে তারা প্ল্যানটার আঁতুড়ে ঘরে তার গলায় নুন ঠেসে দেয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে-পথ বন্ধ। পোশাকি সরকারী চিঠির এক কোণে আমার বন্ধু—সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্‌সেলর—ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে

ফরাসীতে লিখেছেন, বাপের সুপুত্তুরের মত প্ল্যানটি পাঠিয়ো, নইলে এ-শহরের যে-সব পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে তাদের প্রত্যেককে তোমার বর্তমান ঠিকানাটি জানিয়ে দেব—উইদ মাই বেস্ট্ কম্‌প্লিমেণ্টস্!'

প্ল্যানটা তৈরী করা তো সোজা—কিন্তু সেমেণ্ট কই লোহা কোথায়? অর্থাৎ এই পবিত্র আর্যভূমিতে যাবনিক ধর্মগুলোর মেটিরিয়েল পাই কোথায়?

তারই জোগাড়-যন্ত্রের দুর্ভাবনায় দিনগুলো কোন্ পথে যে চলে গেল খেয়ালই করি নি। অবশেষে একদা রাত্রে দ্বিপ্রহরে ত্রিশটি পাতার শেষ পাতাটি টাইপ করে ঘুমুতে গেলুম।

'মাস্টার' বড় ঘেউ ঘেউ করছে,—চতুর্দিকে প্রতি রাত্রে চুরি হচ্ছে সে খবর বাবুর্চী আমায় দিয়েছিল—কিন্তু এ চোরটা তো একেবারেই রামছাগল। দু'দুটো আলসেশিয়ান আমার বাড়িতে। এ দেশটাই মোস্ট ইন্‌কমপিটেণ্ট, চোরগুলো পর্যন্ত নিষ্কর্মা—দিনের বেলা একটু খবরাখবর নিলেই তো বুঝতে পারতো ভদ্র চোরের পক্ষেই এ বাড়ি ভাদ্রবধূ।

নাঃ! উঠতেই হলো। 'মাস্টার' ওরকম করছে কেন? বিষাক্ত খাবার দিচ্ছে না কি কেউ?

দরজা খুলে বারান্দার আলো জ্বাললুম।

দু'বার চোখ কচলালুম। গায়ে চিমটি কাটলে অবশ্য ভালো হতো—স্বপ্নটা তাহলে উপে যেত।

ব্যাকরণে যখন সে ভুল হয়েই গেল তখন স্বীকার করতেই হয় সামনের ডেক-চেয়ারে বসে শহর্-ইয়ার ঠোঙা থেকে শিককাবাব বের করে করে মাস্টারকে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'আপনি আবার উঠলেন কেন?'

আমি বললুম, 'বেশ, শুতে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা শুধুই, শ্মশানের কাছে এসে টাঙার পথ যেখানে শেষ হয় সেখান

থেকে আপনি এলেন কি করে? তার পর তো পথ নেই, অন্ধকার—'

'ও। 'রিকশাওলা খানিকটে পথ এসেছিল। আমি বিদেয় করে দিলুম। ব্যাগটা তো ভারী নয়।'

রবীন্দ্রনাথের মত কবি পরিপক্ক বয়সে তাঁর যত অভিজ্ঞতা, অন্যের হৃদয়ে তাঁর অনুভূতি সঞ্চারণ করার যত দক্ষতা, তাঁর সম্মোহিনী ভাষা অলঙ্কার ধ্বনি সর্বস্ব প্রয়োগ করে একটি দীর্ঘ কবিতার মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে, যেন হার মেনে বলছেন, দুটি শব্দ—

'বৃথা বাক্য।

যামিনীর তৃতীয় যামে, জীবনেরও তৃতীয় যামে অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গুরুবদননিঃসৃত এই আপ্তবাক্যটি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করলুম। চুপ করে বসে থাকা ভিন্ন গতি কি?

মাস্টারকে খাওয়ানো শেষ হলে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে, ঘোমটা টেনে আগের চেয়ে আরো বিনয়নম্র সেলাম করলো।

পাশে চেয়ার এনে বসে বললে, 'আজ আর চাঁদ উঠবে না। না?'

আমি বললুম, 'আজ শুক্লা পঞ্চমী। চন্দ্র অনেকক্ষণ হলো অস্ত গেছে। আচ্ছা আমি শুধু আপনাকে একটি প্রশ্ন শুধবো। এ আসাটা কিভাবে হলো?'

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললে, 'একটি কেন, আপনি যত খুশী আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন; আমি নিশ্চয়ই আমার সাধ্যমত উত্তর দেব। কথা ছিল উনি 'লেবরেটরি থেকে সন্ধ্যা আটটায় ফিরে আসবেন। আমরা খেয়ে দেয়ে সাড়ে ন'টার গাড়ি ধরে এখানে দেড়টায় পৌছব। তিনি নিশ্চয়ই কাজে ডুবে গিয়ে সব কথা ভুলে গেছেন, আর এরকম তো মাঝে মাঝে হয়ই। আমি আদপেই দোষ দিচ্ছিনে। যে যে-জিনিস ভালোবাসে তাতে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি

ার জন্য শেষ মুহূর্ত অপেক্ষা করে ছুটি খেয়ে স্টেশনে এসে গাড়ি রলুম।'

'আমি তো কাল বিকেল পাঁচটার গাড়িতে কলকাতা আসতুমই।'

'এক্‌জেক্‌ট্‌লি। যাতে সেটাতে কোনো নড়চড় না হয় তাই মাসা।'

এবার পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মনে মনে বললুম, 'বৃথা বাক্য।'

বললুম, 'ছুটি খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন অল্প অল্প খিদে পেয়েছে নশ্চয়ই। সামান্য কিছু খাবেন?'

'আর ক'ঘণ্টা বাকি? সকালবেলা চা খাবো।'

আমি একটু হেসে বললুম, 'কে বললে মুসলমান মেয়ে, বিশেষ রে আপনি, আপনাদের স্বাধীনতার ফল উপভোগ করতে পারছেন া? কটা হিন্দু মেয়েরই এ রকম সাহস আছে?'

খুশী হয়ে বললে, 'এবং ঠিক সেই কারণেই এইখানে বসে মাপনাকে বলেছিলুম, মুসলমান মেয়ে ডিফরেণ্ট, কিন্তু কলকাতায় ফিরে গিয়ে যত চিন্তা করতে লাগলুম, ততই মনে হলো এই যে আমি র বার ডিফরেণ্ট ডিফরেণ্ট বলছি এটা আমারই কাছে খুব পরিষ্কার , এবং যেটুকুও পরিষ্কার সেটুকুও বুদ্ধি দিয়ে বুঝি নি, অনুভব করেছি য় দিয়ে। বুদ্ধির জিনিস বোঝানো তেমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু নুভূতির জিনিস অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারে শুধু আর্টিস্ট— ও বহু সাধনার পর। কিন্তু এ সব কথা পরে হবে। আপনি নুতে যাবেন না?'

'আর আপনি?'

'আমি একটা কাজ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তার কিছুটা এইখানে সে করবো। ওয়েস্ট জর্মনি থেকে একটা খবরের কাগজ এ-দেশের রীসমাজের অবস্থা জানতে চেয়েছে। কিন্তু বিপদ হলো গিয়ে যে খাটেখার অভ্যাস একে তো আমার নেই, তার উপর ইয়োরোপীয় গজের জন্য লেখা, ইয়োরোপ গিয়ে কন্টিনেণ্টাল ভিগ্রী জোগাড়

করা, আরো কত কী—এক কথায় ইয়োরোপ ইয়োরোপ সর্বক্ষণ ইয়োরোপ এই মনোবৃত্তিটাই আমাকে পীড়া দেয়। তাই লেখাটা তৈরী করবার জন্য কোনো উৎসাহ পাচ্ছিনে। কিন্তু আর না, আপনি দয়া করে শুতে যান।'

'নিশ্চয়ই যাবো, যদি আপনিও কাজটা আজ রাতের মত মুলতবী রেখে ঘুমুতে যান।'

'আপনার কোনো আদেশ আমি কখনো অমান্য করেছি?'

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, এ মেয়ে কি ধাতু দিয়ে তৈরী? এক দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমার পর্দানশীন মা বোনের মত শান্ত, নম্র, বিনয়ী। ট্রেনে একবার ঐ যেটুকু যা হামলা করেছিল—সেটা নিশ্চয়ই ব্যত্যয়। আর এই যে দুপুর রাতে আমার বাড়িতে আসা, সেটা সে পর্যায়ে পড়ে না। এটার মূলে আছে, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা মেয়েটির মন হৃদয় যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সে-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। এই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে নিষ্পাপ চরিত্রের সম্মেলন এটা বিরল এবং এর সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তি বা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসা না-আসা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত নয়। সম্পূর্ণা অশিক্ষিতা কট্টর পর্দানশীন আমার সম্পর্কে এক ভাবী তাঁর স্বামীর নষ্টাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে রাত দুপুরে খানা-ঘাটে হাঁকডা ছেড়ে নৌকো জোগাড় করে চলে যান কয়েক মাইল দূরে গোঁসাইদের আখড়ায়। একে তো ছোট সেই শহরের সবা সে কেলেঙ্কারির কথা জেনে যায়, তদুপরি ঐ আখড়াটির মোহান্তে আবার খুব সুনাম ছিল না। শুধু তাই নয়, বৌদিটি আখড় দু'দিন কাটানোর পর ফের সেই পাটনিকে ডেকে পাঠিয়ে ফি এলেন শহরে। দাসীকে দিয়ে জড়ো করালেন পাঁচজন মুরুব্বীকে ওঁরা সবাই এসেছিলেন অত্যন্ত অনিচ্ছায়, কিন্তু জানতেন না এ আমার বৌদিটি এঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে যা-হুলস্থুল লাগা

তার চেয়ে পঞ্চায়েতে যাওয়াই ভালো—বৌদির পয়েন্ট অতি পরিষ্কার —'আপনারা বিচার করে দিন, আমার তালাক পাওয়ার হক আছে কিনা।' মুসলমান হিসাবে এ স্থলে কেউ বৌদির আচরণে কোনো খুঁত ধরতে পারে না। শেষটায় বৌদি তালাক পেল, নির্মম কাবুলীর মত তার মহর, অর্থাৎ স্ত্রীধনের প্রত্যেক কড়ি আদায় করে মক্কা চলে গিয়ে সেখানে বাকী জীবন কাটালো। এর সব-কিছু সম্ভব হলো কারণ আমাদের অঞ্চলের সবাই জানতো, ঐ বৌদির মত পুণ্যশীলা নারী আমাদের মধ্যে কমই আছেন। এবং তাঁর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস—আমি যা করছি ঠিকই করছি।

বৌদির উদাহরণটি মনে এল বটে এবং শহ্‌র্-ইয়ারের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল আছে বটে, কিন্তু দু'জনার বাতাবরণে আসমান-জমীন ফারাক। আমার সম্পর্কের দাদাটি ছিলেন খাইডিয়ার লোক, কিন্তু একেতে—অর্থাৎ একমাত্র ভাবীতে তাঁর 'জনিয়াস' সীমাবদ্ধ না রেখে ভূমাতে সুখের সন্ধান করতেন! ডাক্তার লুফিকার তাঁর ঠিক বিপরীত। অতিশয় একদারনিষ্ঠ—এমন কি র খামখেয়ালি পর্যন্ত হাসিমুখে মেনে নিয়ে তাঁকে সঙ্গ দেন। হ্‌র্-ইয়ারও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং ভক্তি করেন— টা এ যুগে কিছু কম কথা নয়।

তবে?

তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্নে শুনছিলাম কে যেন অতি মধুর কণ্ঠে গান গাইছে। ত্যেকটি স্বর, প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক একটি নিটোল শিশির বিন্দু। ার শিশির বিন্দুরই মত যেন আপনার থেকে জমে উঠছে; তার ছনে কোনো সচেতন প্রচেষ্টা নেই। এ রকম স্বতঃস্ফূর্ত মধুর ধ্বনি ছরের পর বছর আপ্রাণ রেওয়াজ করে হয় না—এর সঙ্গে একমাত্র লনা করে শুধু বলা যায় এ যেন মাতৃস্তন্যে সহজ দুগ্ধ সঞ্চার।

সহজে বয় তার স্রোত। সহজে পান করে নবজাত শিশু। যে শুনবে সে-ই পান করবে এ-সঙ্গীত শিশুরই মত অপ্রচেষ্টায়।

ধীরে ধীরে উঠে সঙ্গীত-উৎসের সন্ধানে বেরুলুম। কোথা থেকে আসছে এ-সঙ্গীত? বেহেশ্‌ৎ থেকে না হ'লে খুঁজে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নাও হতে পারে। মাটিতে পা ফেলতেই বুঝলুম এটা স্বপ্ন নয়। মোটামুটি অনুমান করলুম কোন্ জায়গায় এ-গানের উৎস।

এ বাড়ির দেড়তলায় একটি ছোট্ট কুটুরি আছে। সেখানে দেখি শহর্-ইয়ার নড়াচড়া করে কি-সব সাজাচ্ছে। আমাকে দেখেই শুধলো, 'চা খেয়েছেন?'

'না।'

'বসুন এই মোড়াটায়, আমি বানিয়ে দিচ্ছি। কাটু স্টেশনে গেছে, ফেরার পথে হাট করে নিয়ে আসবে—আজকে হাটবার।'

তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি শহর্-ইয়ার কুটুরিটি চা বানাবার, এবং সেইখানেই আরামে বসে চা খাবার অতি চমৎকার ব্যবস্থা করেছে। বললে, 'এ ঘরের যা যা প্রয়োজন সেগুলো আমি বাক্সের ভিতর রেখে এসেছি স্টেশনে। কাটু আনতে গেছে। আপনি জানেন না, আমি বেলা-অবেলায় চা খাই। তাই এ-ব্যবস্থা। রান্নাতে আমার কোনো শখ নেই। তবে মা ডাকসাঁইটে রান্নার আর্টিস্ট ছিলেন। হাঁসের বাচ্চা কি আর সাঁতার কাটতে পারে না —তাই যদি নিতান্তই চান—'

একটু থেমে বললে, 'ভয় নেই, ভয় নেই। এ বাড়িটাকে আমরা ঠিক এণ্ড কটেজ রূপে দেখছি নে। এটা কি রকম জানেন? খুব বড় লোক যে-রকম ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ওটা খরচ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মাসের আমদানিটাই পুরো খরচ হয় না কোনো মাসেই।'

আমি বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানেন? আপনি যদি এখানে এসে আনন্দ পান তবে যত খুশী আসবেন। কিন্তু

ভালো হয় ডাক্তারকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে এই কারণে বলছি, ভদ্রলোক যে রকম 'বেদম' খাটছে সেটা তার পক্ষে ভালো নয়। এখানে এলে দেহ মন দুইই তাঁর জুড়োয়, আমার তো তাই মনে হয়। ওদিকে আপনারও কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি এখানে আপন মনে ঘুরে বেড়ালে, আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে উনি ভারি খুশী হন। নয় কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ওঁকে ওঁর কাজ থেকে ছিনিয়ে এখানে আনা বা অন্য কোনোখানে, সে আমার শক্তির বাইরে।'

তার পর একটু চিন্তা করে নিয়ে বললে, 'হয়তো সব-কিছুই আমার আদিখ্যেতা। আমার সমস্যা আর এমন কি নূতন? আমার শ্বশুরমশাইকে আমি দেখি নি, কিন্তু শুনেছি সেই যে সকালবেলা বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেন তার পর ফের অন্দরমহলে ঢুকতেন রাত দুপুরে কিংবা তারও পরে—দু'বেলার খাওয়া-দাওয়াই ঐ বৈঠকখানায় ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে। সে হিসেবে তো আমি অনেক ভালো।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আর আপনার শাশুড়ী এ-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন?'

'কি জানি। তখনকার প্যাটার্নটাই ছিল আলাদা। আমার চোখের সামনে ছবিটা যেন পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে না। কারণ আমার বাপের বাড়িতে ছিল অন্য প্যাটার্ন। আম্মাকে আমি অল্প বয়সেই হারাই। আব্বা সমস্ত দিন কাটাতেন নামাজ পড়ে, তসবী, তিলাওত আর দীনিয়াতির কিতাব পড়ে। সংসারের সঙ্গে তাঁর মাত্র এইটুকু যোগ ছিল যে বেশ কড়া নজরে রাখতেন, আমার যত্ন-আত্তি ঠিক মত হচ্ছে কি না। থাক্, এসব কথা এক দিনে ফুরোতে নেই। মেয়েছেলের পুঁজিই বা কতটুকু? ছেলেরা ঘোরাঘুরি করে, কত রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাদের হয়। আপনিই কত না ভ্রমণ করেছেন, কত না অদ্ভুত অদ্ভুত—'

আমি বললুম, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমার বড় ভাই-সাহেব তাঁর জীবনে মাত্র একবার কলকাতা আসেন, সেখান থেকে আমাকে দেখবার জন্য এই বোলপুর—ব্যস্! মেজদা বুঝি একবার আগ্রা গিয়ে সেখানে দু'টিমাত্র দিন ছিল। দেশ-ভ্রমণের শখ তাঁদের মাইনাস নিল্। অন্য লোকে আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে যা খুশী রোমান্টিক ধারণা পোষণ করে করুক, কিন্তু আমি জানি, আমরা তিন ভাই যখন এক সঙ্গে বসে আলাপ-চারী করি তখন কার দৌড় কতখানি। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ওসবেতে কিচ্ছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।'

'হুঁ, অনেক-কিছু দেখেছেন বলে এ-সব কথা কইছেন। আচ্ছা, এবারে আমি নাইতে, সাজগোজ করতে চললুম।'

সমস্ত দিন শহ্‌র্-ইয়ার আপন কামরা থেকে বেরুলো না। তবে কি সে নিজের সঙ্গে কোনো রকমের বোঝাপড়া করছে? তা হলে মাঝে মাঝে আবার গান গেয়ে উঠছে কেন? আল্লা জানে তার কিসের অভাব। একাধিক বার সে বলেছে সে মুসলমান মেয়ে, বহু যুগ পরে এ-যুগে এসে অন্দর মহল থেকে বেরিয়েছে; তাই তার সমস্যা এক নূতন প্যাটার্নের প্রথমাংশ—ক্রমে ক্রমে বহু মেয়ের চোখের জল আর ঠোঁটের হাসি দিয়ে প্যাটার্ন সম্পূর্ণ হবে। তারপর নব যুগান্তরে সমস্ত প্যাটার্নটা যাবে মুছে, ভাগ্যবিধাতা বসে যাবেন আবার নূতন আল্পনা আঁকতে।

কিন্তু আমার কাছে এটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না যে শহ্‌র্-ইয়ার মুসলমান।

আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান মেয়ের মধ্যে অধিকারে পার্থক্য আছে। এবং সে আইনের

ত কুরান-হদীসে। হিন্দুধর্মের ব্যবস্থা অন্য রকম—যেমন, হিন্দু-মাজে ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর কোনো ধর্মানুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য নয়। সলমানকে দিনে পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ পড়তে হয়, খৃষ্টানকে রববারে ববারে গির্জেয় যেতে হয়, ইহুদিকে শনিবারে সিনাগগে, এবং খুদ হিন্দুধর্মে একমাত্র ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যাহ্নিক করতে হয়। সেখানেও াবার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু সলমানের বেলা স্ত্রী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই: পুরুষকে যে-কম পাঁচ ওক্‌ৎ নামাজ পড়তে হয়, পুরো রোজার মাস উপোস রতে হয়, স্ত্রীলোককেও তাই। এবং তারই ফলে জানা-অজানাতে মুসলমান মেয়ে অনুভব করে যে স্বয়ং আল্লার সামনে যখন নামাজ রোজার মারফতে পুরুষ স্ত্রীলোককে একইভাবে দাঁড়াতে হয় তখন এই পৃথিবীতেই তার অধিকার কম হবে কেন? অবশ্য কর্মক্ষেত্রে অধিকারভেদ থাকার কথা, কিন্তু মূল নীতি তো অতিশয় অপরিবর্তনীয় সুদৃঢ়।

পক্ষান্তরে ধর্ম যাই বলুক আইন-কানুন যে আদেশই দিক একই দেশে যুগ যুগ ধরে থাকার ফলে সামাজিক প্যাটার্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে খুব বেশী ভিন্ন হয় না। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় প্যালেস্টাইনে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের ভিতর তিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আদেশ অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষে তিন ভিন্ন প্রকারের অধিকারভেদ—অথচ কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক প্যাটার্ন তিন সমাজেরই মোটামুটি এক। একটি ছোট উদাহরণ মনে পড়লো: হিটলারের ভয়ে যখন ইহুদি নরনারীরা জর্মনি ত্যাগ করে জেরুজালেমে এল তখন বার্লিনের কোনো কোনো অত্যাধুনিক যুবতী সুদ্ধমাত্র শর্ট শার্ট পরে রাস্তায় বেরুতে আরম্ভ করলো। এই বে-আব্রু বেহায়া বেশ দেখে জেরুজালেমের আদিম ইহুদিরা লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, এবং নিজেদের সবচেয়ে বেশী কুণ্ঠিত বিড়ম্বিত বোধ করতো প্রতিবেশী খৃষ্টান ও মুসলমানের সম্মুখে।

কারণ তিন সম্প্রদায়েরই একই মান, একই স্ট্যাণ্ডার্ড আব্রু, ইজ্জৎ, হায়া সম্বন্ধে।

মনে মনে ভাবলুম, শহ্‌র্-ইয়ার যা-ই বলুক, বাঙলাদেশেও কি তাই নয়? এমন কি আমাদের ইলিয়ট রোডের এংলো-ইণ্ডিয়ানদের আচরণ লণ্ডনের খৃষ্টানদের সঙ্গে যত না মেলে তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য ধরে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে।

তারপর দুপুরে শহ্‌র্-ইয়ারের সঙ্গে দেখা।

খানার টেবিলে বাবুর্চী একটা মাংসের কালিয়া দেখিয়ে বললে, এটা বেগম সায়েবা রেঁধেছেন। খেয়ে দেখি, আশ্চর্য, এক্কেবারে, হুবহু কাবুলী রীতিতে তৈরী। কিন্তু রাঁধলো কখন?

শহ্‌র্-ইয়ার বোধ হয় একটুখানি মৌজে ছিলেন। বললেন, 'আমার মা এক কাবুলীর কাছ থেকে এটা শেখেন।' তারপর আরম্ভ করলো সেই কাবুলীর ইতিহাস। 'কেন জানিনে সেই খান সায়েবের এ-দেশটা ভারি পছন্দ হয়ে যায়। আব্বা তাঁকে একটু জমি দিলেন। সে মামুলী ধরনের ঘর বাড়ি বেঁধে বিয়ে করলো আমাদের এক রায়তের মেয়েকে। তার পর ডালভাত খেয়ে খেয়ে সে তার পাঠানত্ব ভুলে গেল, গাঁয়ের লোকও সেটা গেল ভুলে।

বিয়ের পরের বছর খানের একটি মেয়ে হয়েছিল। তার পনরো বছর পর খান মেয়ের জন্য একটি বর বাছাই করে তার বীবীকে সুখবরটা দিল। কিন্তু পরের দিন সকালে বীবী খানকে জানালেন, মেয়ে তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে এ-বর তার পছন্দ হয় নি।

তাজ্জবকী বাৎ! বাঙলাদেশের মুসলমান মেয়ে বিয়ের কথাটি মাত্র উঠলেই লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কাঁই হয়ে যায়। তার যে একটা মতামত থাকতে পারে সে নিয়ে তো কেউ কখনো মাথা ঘামায় না। এ আবার কি? খান বউকে অভয়

জানিয়ে বললে যে আখেরে সব দুরুস্ত হয়ে যাবে এবং বিয়ের ব্যবস্থা করে যেতে লাগলো। হয়েও গেল সব-কিছু ঠিকঠাক। বরপক্ষ এলেন ঢাক ঢোল বাজিয়ে, আতশবাজি পোড়াতে পোড়াতে। তারপর যথারীতি এক উকিল আর দুই সাক্ষী বিয়ের মজলিস থেকে বরের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন অন্দর মহলে—সেখানে কনেকে সাজিয়ে গুজিয়ে, লম্বা ঘোমটা সহযোগে তাকে একটি আস্ত পুঁটুলি বানিয়ে চতুর্দিকে বসেছেন তার সখারা। সখীদের কাজ হচ্ছে, উকিল বিয়ের প্রস্তাব করার পর কনে লজ্জায় 'হাঁ' বলতে দেরি করে বলে তাঁরা তখন কনেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে 'কবুল' বলায়। উকিল প্রস্তাব পেশ করলেন। ভুল বললুম, প্রস্তাব ভালো করে শেষ করার পূর্বেই মেয়ে পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, "না, কবুল নয়"।'

হঠাৎ কাহিনী থামিয়ে আমাকে বললে, 'কই, আপনার কাবুলী-কালিয়া খাচ্ছেন না যে বড়?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য রসভঙ্গ করতে পারেন আপনি! বখতিয়ার খিলজীর আমল থেকে এই সুবে বাঙলার সুদীর্ঘ ইতিহাস কোন্ মুসলমান বঙ্গনারী এ রকম "কবুল নয়" বলেছে, শুনি? তারপর কি হলো বলুন।'

'আমি সেখানে ছিলুম না, তবু খানিকটে অনুমান করতে পারি। ঐ কনের মজলিসে একশ'টা বাজ একসঙ্গে পড়লেও বোধ হয় তার চেয়ে বেশী ধুন্ধুমার লাগাতে পারতো না। তারই ভিতর যাঁদের একটু মাথা ঠাণ্ডা ছিল তাঁরা কনেকে পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে বোঝাতে আরম্ভ করলেন, হাতে পায়ে ধরলেন তাঁদের মাথায়, তাঁদের গোষ্ঠীর মাথায় যেন কেলেঙ্কারি না চাপায়। কনের মামারা তো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। আর বাপ, কাবুলি খান সাহেব—সে তার সর্ব পাঠানত্ব হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও একটা সামান্য জিনিসে তখনো তার কিছুটা আটকা পড়েছিল সেটা তার

প্রাচীন দিনের একখানা তলওয়ারে। কুড়ি বছর ধরে সে ঐ তলওয়ারখানা সাফসুৎরো রেখেছে। ঐটে নিয়ে করলো ধাওয়া মেয়েকে খুন করবে বলে।

ওদিকে বাইরে বরপক্ষের কানে খবরটা পৌঁছে গিয়েছে। এক সঙ্গে গর্জে উঠলো সবাই, "একী বেইজ্জতি!" আমাদের গাঁয়ের লোক দলে ভারি কিন্তু হলে কি হয়, ওদের সঙ্গে ছিল জনা তিনেক জহাঁবাজ লেঠেল—বরের মুরুব্বিদের ভিতর। আর জানেন তো, চাষাভূষোর বিয়েতে নানা রকমের ঢং তামাশার মেকি লড়াই হয়—ভাবটা যেন বরপক্ষ কনেকে ডাকাতি করে লুটে নিয়ে যাচ্ছে —তাই সঙ্গে এনেছে যার যার লাঠি। ব্যস্! লাগ্ লাগ্ লাগ্। আমাদের গাঁয়ের মোল্লাজী, মসজিদের ইমাম সাহেব এমন কি বরপক্ষ যে তাদের মোল্লাজী সঙ্গে এনেছিল তিনি পর্যন্ত, সবাই মিলে আল্লা রসুলের দোহাই দিয়ে ওদের ঠেকাবার জন্য প্রায় পায়ে ধরেন আর কি।

শেষটায় আমার চাচা খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে লড়াই ঠেকালেন। নিজের থেকেই বললেন, বিয়ের জন্য বরপক্ষের যা খরচা-পত্র হয়েছে তিনিই সেটা দিয়ে দেবেন।

কিন্তু বরপক্ষ কনে না নিয়ে শুধু 'হাতে' যদি বাড়ি ফেরে তবে সারা রাস্তা ধরে তাদের শুনতে হবে পাঁচখানা গাঁয়ের টিটকারি। তার ব্যবস্থাও চাচা করে দিলেন। ওদের মোল্লাজীকে আড়ালে নিয়ে আলাপ করে খবর পেলেন আমাদের পাশের গাঁয়ে বরপক্ষের পাল্টা ঘর আছে ও তাদের একটা মেয়েকে এই বরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য একটা ইশারাও দিয়েছিল। চাচা বরের বাপ-চাচার সঙ্গে কথা বলে আমাদের মোড়লকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বলে দিলেন সে যেন আমার চাচার হয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়ে। চাচা নামকরা জমিদার আর এরা সাধারণ রায়ৎ—এ যে কত বড় সম্মান আর ইজ্জতের কথা—'

আমি বললুম, 'খুব বুঝতে পেরেছি। আমার আব্বাকে বিয়ে-শাদীর দোয়া দরূদ পড়তে আমার জীবনে মাত্র একবার আমি দেখেছি। আমাদের বাড়ির দাসীর যখন বিয়ে হলো আমাদের এক কুটুম-বাড়ির চাকরের সঙ্গে। পরের দিন বরের দেমাকটা যদি দেখতেন! তারপর কি হলো বলুন।'

'তারপর আর বিশেষ কিছু বলার নেই। সেই রাত্রেই বরপক্ষ পাশের গাঁয়ে গিয়ে বিয়েশাদী সাঙ্গ করে কনে নিয়ে মান-ইজ্জতের সঙ্গে বাড়ি ফিরলো। তবে শুনেছি, আমাদের গাঁ থেকে বেরবার সময় তারা নাকি ভিতরে ভিতরে শাসিয়ে গিয়েছিল যে এ-তল্লাটের মাথা, আমার চাচা, তাদের হাত বন্ধ করে দিলেন কিন্তু সামনের হাটবারের দিন আমাদের গাঁয়ের লোক যেন হুঁশিয়ার হয়ে হাট করতে যায়।'

'আর কনেটা ?'

'সে কি আর বেশীক্ষণ চাপা থাকে, কার সঙ্গে সে মজেছে। ছোঁড়াটা অবশ্যি তুলকালাম দেখে গা ঢাকা দিয়েছিল। তাল করে ধরে নিয়ে এসে বর সাজানো হলো।'

'তা মেয়েটা ওরকম শেষ মুহূর্তে এরকম নাটুকে কাণ্ড কর কেন ?'

'ওর নাকি কোনো দোষ নেই। সে বেচারী তার মাকে অনেক বার তার অমত বেশ জোর গলায়ই জানিয়েছিল, কিন্তু মা পাঠানকে বার বার বিরক্ত করতে সাহস পায় নি। আশা করেছিল, শেষ পর্যন্ত সব কিছু দুরুস্ত হয়ে যাবে।'

আমাদের খাওয়া অনেকক্ষণ সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু উঠি উঠি করে উঠি নি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ার অন্য কিছু একটা ভাবছে এবং সেইটে চাপা দেবার জন্য ঘটনাটি বলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'চলুন।'

বসার ঘরে এসে বললে, 'কিন্তু খানের মেয়ের বিয়ে বাবদে আসল কথাটি আপনাকে এখনো বলা হয় নি। মেয়েটির বিয়ে চুকে-বুকে যাওয়ার মাসখানেক পরে খান একদিন তার বউকে বললে যে, সে বড় খুশ যে তার মেয়ের গায়ে পাঠান রক্ত আছে। এ রকম ঘটনা পাঠান মুল্লুকে নিত্যি নিত্যি না ঘটলেও ব্যাপারটা একেবারে অজানা নয়।'

আমি বললুম, 'তবেই দেখুন, ইসলাম যে-সব অধিকার আমাদের দিয়েছে আমরা সেগুলো ব্যবহার করিনে। শুনেছি, আরবভূমিতে এখনো নাকি মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়।'

শহ্‌র-ইয়ার একটু হেসে বললে, 'ঠিক ঐ জিনিসই এখন বাঙলা-দেশে অল্প অল্প আরম্ভ হয়েছে। যে-সব মুসলমান মেয়েরা এখন মিছেলেদের সঙ্গে কিছুটা অবাধে মেলামেশা করে তারা নিশ্চয়ই কিছুটা পায়েন্ট দেওয়ার পর ছেলেরা বিয়ের প্রস্তাব পাড়ে।'

আমি বললুম, 'ইংরেজীতেও বলে Courtship is the process নিজের woman allowing herself to be chased by a man তিনিই she catches him.'

শহ্‌র-ইয়ারের পছন্দ হলো প্রবাদটি। তারপর বললে, 'তবেই দেখুন, যে অধিকার মুসলমান মেয়ের ছিল ইসলামের গোড়া পত্তনের সময় থেকে, সেইটেই সে ব্যবহার করলো ইংরিজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, অন্দর মহল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। পাঠান মেয়েরা কিন্তু চিরকাল ধরে এ-হক্কটা দরকার হলেই কাজে লাগিয়েছে। শুনেছি, তারা নাকি অনেকক্ষেত্রেই বাপ-মার তোয়াক্কা না রেখে আপন পছন্দের ছেলেকে ভালোবাসতে জানে। আপনি তো আপনার লেখা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে আমাকে দেন না, কিন্তু কাবুলে ঐ যে একটি পাঠান মেয়ে আপনাকে ভালোবেসেছিল—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে, প্রাণভরে 'মণিকে' নিয়ে

যত খুশী আলোচনা করতে পারেন। এ কাহিনীতে আমি এমনই না-পাস্ ফেল মেরেছি যে ওটার কথা স্মরণে এলে 'মণির' কাছে মনে মনে বার বার লজ্জা পাই আর মাফ চাই—এত বৎসর পরেও।'

'সে কি? আমি বুঝতে পারলুম না।'

আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললুম, 'মণির কাহিনী গল্প নয়, হাজার পার্সেন্ট সত্য। আমি তার সিকির সিকিও ফুটিয়ে তুলতে পারি নি। আমি আমার জীবনে মাত্র একটি বার—ঐ নিষ্পাপ কিশোরী মণির কাছ থেকে—অকুণ্ঠ, সর্বত্যাগী, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য প্রণয় পেয়েছি। ও ছিল সত্যই কাবুল পাহাড়ের চুড়োর উপরকার ভার্জিন স্নো—এটা আমার ভাষা নয়, এটা বলেছিলেন মণির মুনিব বলো, জাতভাই বলো—জানো তো পাঠানরা সাম্যবাদে কি রকম মারাত্মক বিশ্বাসী—সেই রসকষহীন স্টোন-হার্ড-বয়েলড্ ডিপ্লোমেট শেখ মহবুব আলী খান। তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন, যে, পেশাওয়ারে তাঁদের পরিবারে পরে এখানে ব্রিটিশ লিগেশনে পাঠান চীফ একাউন্টেন্ট থেকে আরম্ভ করে পাঠান অরডারলি পর্যন্ত —আবার সেই প্রাণঘাতী ডিমোক্রেসি—মণির কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে চেয়েছিল, কেউ কেউ বিশুদ্ধ পাঠান-রীতিতে মহবুব আলীর কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে মহবুব আলীর শেষ কথাগুলো, 'ওমেদারদের দৃঢ়তম প্রচেষ্টাও যেন মণির মনে কোনো ক্ষণেকের তরে ছায়াটুকু পর্যন্ত ফেলতে পারে নি। যেন ওসবের কোনো অর্থই হয় না, যেন তার বয়েস ষোল নয়—চার। তাই বলছিলুম, ভার্জিন স্নো, যার উপর রক্তিভর ধুলো-বালি পড়ে নি। তারপর সে আপনাকে দেখল—একবার দরজা খুলে দেবার সময় আরেকবার যখন আপনার জন্য নাশ্‌তা নিয়ে এল। সেদিন আপনি এখানে ছিলেন আধ ঘণ্টাটাক। পরদিন আমার স্ত্রী বললেন, মণি যেন জীবনে এই প্রথম জেগে

উঠলো। নরনারীর একে অন্যের প্রতি বাছাই-অবাছাই-না-করা আকর্ষণ, বিবাহ, মাতৃত্ব সব যেন ঐ দিন এক লহমায় সে বুঝে গেল।' এ সমস্ত 'কবিত্ব' একজন ধুরন্ধর ডিপ্লোমেটের মুখ থেকে—হৃদয়ের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা যার কাছে আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি।

মণির সেই প্রেম পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেছিলুম আমি, কিন্তু তার প্রেমের আবেগ, সে প্রেমের ভিতর তার সম্মোহিত অবস্থা, যেন সে নিশির-ডাকে-পাওয়ার মত চোখ বন্ধ করে ভিতরকার প্রেমের প্রদীপালোকে চলেছে দয়িতের অভিসারে কাবুলের শঙ্কাসঙ্কুল গিরিপর্বত লঙ্ঘন করে—এসব পারলুম না আপনাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে। জানেন তো, আমাদের কোনো কমন্ ল্যানগুইজ ছিল না?—তৎসত্ত্বেও আমার হৃদয়ে মণির প্রতিটি হৃদ-স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছিল অব্যবহিত ভাবে।

আমার আফসোস, আফসোস,—হাজার আফসোস—যে আমি মণির প্রেমের নেমক খেয়ে সে নেমকের কিম্মৎ দিতে পারলুম না,—আমার সব সময় মনে হয় আমি যেন নেমকহারাম রয়ে গেলুম। জানেন, মণির এই বেদনা-কাহিনী লেখার পর সেটা আর কখনো পড়ি নি? লেখার সময়ই আমি প্রতি লহমায় হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিলুম, সুর লাগছে না, কিন্তু প্রাণপণ আশা করছিলুম যে-সৃষ্টিকর্তা আমাদের নগণ্য সৃষ্টির চলার পথ তৈরী করে দেন তিনি কোনো এক মিরাক্‌ল্ অবতীর্ণ করে শেষ রক্ষা করে দেবেন। কিন্তু আফসোস, তিনি প্রসন্ন হলেন না।'

শহ্‌র্-ইয়ার গভীর দরদ দিয়ে শুনছিল। শেষটায় বললে, 'মাফ করবেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। কিন্তু তবু জানতে ইচ্ছে করে, আপনার এই ধারণাটা জন্মালো কি করে?'

'অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়, দম্ভ। আমি ভেবেছিলুম এ তো

জলজ্যান্ত ঘটনা। কোনো-কিছু বাড়াতে কমাতে হবে না। স্মৃতির গভীরে কলম ডোবাবো আর লিখব। এতে তো কোনো মুশকিল নেই। সেই হলো আমার কাল। আপন কল্পনা, সহানুভূতি বাদ পড়ে গেল—এক কথায় আমার হৃদয়রক্তে রাঙা হয়ে রক্ত-শতদলের মত মণি ফুটে উঠলো না। হয়ে গেল ফোটোগ্রাফ--সেও আবার রদ্দি ফোটোগ্রাফ। ফোকাস ঢিলে, কোথাও ওভার-এক্‌স্‌পোজড কোথাও বা আণ্ডার। ফ্ল্যাট, কণ্ট্রর নেই আর ক্যামেরাও বাঁকা করে ধরা ছিল বলে টিলটেড্।'

শহর-ইয়ার শব্দার্থে তামাম শহরের ইয়ার। ইনি আমার লেখার অকৃত্রিম ইয়ার। ঘন ঘন মাথা নেড়ে নেড়ে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে।

পাঁচ

স্টেশনে আমার পরিচিত দু'চার জনের সঙ্গে দেখা। সবাই এক কামরায় উঠলুম—যদিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, শহ্‌র্-ইয়ারের এ ব্যবস্থাটা আদৌ মনঃপূত হয় নি। তাই আমি আরো বিশেষ করে ওদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম না।

শহ্‌র্-ইয়ারকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলে না কিন্তু তার সৌন্দর্যে অপূর্বতা আছে। সে সৌন্দর্য তিনি ধারণ করেছেন অতিশয় সহজে, এমন কি অবহেলাভরে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। পুরুষানুক্রমে বিত্তশালীজন যে রকম তার বৈভব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে ধনী-দরিদ্রের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। আমার মনে হচ্ছিল, একে একটুখানি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ইনি সুন্দরীকুলে জন্ম নিয়েছেন, সুন্দরীদের ভিতর বড় হয়েছেন, তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে ছেলেবেলায় কেউ আদিখ্যেতা করে নি বলে তিনি এ বিষয়ে এমনই সহজ সরল যে সৌন্দর্যহীনারা তাঁর সৌন্দর্যকে ঈর্ষা করবে না, সুন্দরীরা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দেখবে না। তাঁর সৌন্দর্যের অপূর্বতা কিছুটা তাঁর বর্ণে। বংশানুক্রমে পর্দার আড়ালে বাস করার ফলে তাঁর শান্ত গৌর বর্ণকে 'অসূর্যম্পশ্যা' বর্ণ নাম দেওয়া যেতে পারে। এ বর্ণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে অতি অবশ্য কিন্তু সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করবে সে-কথা বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ রঙের প্রতি আমার নাড়ির টান আছে—আমার মা-বোন সকলেরই এই ধরনের রঙ—কেউ একটু বেশী গৌরী কেউ বা কম। তদুপরি শহ্‌র্-ইয়ার এখন পূর্ণ-যৌবনা—অনুমান করলুম তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে আঠাশের কোনো জায়গায় হবে। মাথায় সিঁদুর থাকার কথা নয়, এবং যদিও বেশভূষা হুবহু বিবাহিতা বাঙালী হিন্দু মেয়ের মত তবু কোথায় যেন,

কমন যেন একটা পার্থক্য রয়েছে। আমি কিছুতেই সে-পার্থক্যটা
[জে বের করতে পারলুম না। আমার এক অসাধারণ গুণী চিত্রকর
ন্ধু আছেন এবং অদ্ভুত তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি। তিনি
াকলে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। পর্দানশীন খানদানী
ুসলমান গৌরীদের রঙ তিনি লক্ষ্য করে আমার সামনে একদিন ঐ
প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

পরিচিতেরা দু'এক বার তাঁর দিকে আড় নয়নে তাকিয়েছিলেন—
এ মেয়ে যে আর পাঁচটি সুন্দরী থেকে ভিন্ন সেটা হয়তো ওঁদের
চোখেও ধরা পড়েছিল। শহ্‌র্-ইয়ার কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ
নির্বিকার। কে বলবে, এঁর মা-দিদিমা যুগ যুগ ধরে পর্দার আড়ালে
জীবন কাটানোর পর ইনিই প্রথম বেগানা পুরুষদের সামনে আত্ম-
প্রকাশ করেছেন!

কামরাটা সব চেয়ে বড় সাইজের যা হয়। তিনি কিন্তু
আমার পাশে না বসে আসন নিলেন সুদূরতম প্রান্তে। বেঞ্চির
উপর পা তুলে মুড়ে বসে, কিন্তু আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে।
আমাদের পাঁচজনের ভিতর নানা রকম আলাপ-আলোচনা আরম্ভ
হলো। সকলেই বুদ্ধিজীবী—বিষয়বস্তুর অনটন হওয়ার কথা
নয়। শহ্‌র্-ইয়ার সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন কি না, বুঝতে
পারলুম না।

কবে হয়ে গেছে এঁর বিয়ে, কিন্তু বাপের বাড়িতে বিয়ের পূর্বে
মেয়েকে যে তালিম দেওয়া হয়—শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে কি ভাবে
সবে চলবে এবং বিশেষ করে অঙ্গসঞ্চালন নিরোধ করে থাকবে—
সেটা মোটেই অনভ্যাস বশতঃ বিস্মৃত হয় নি। সেই যে বোলপুরে
যে-ভাবে আসন নিয়েছিল বর্ধমান পর্যন্ত তার সামান্যতম নড়চড়
হলো না।

বর্ধমানে প্রায় সবাই চায়ের সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নামলেন। এঁরা
হিন্দু না, এঁরা অপটিমিস্ট।

শহ্‌র্-ইয়ারের পাশে গিয়ে বসে বললুম, 'শহ্‌র্-ইয়ার, এখানে কিন্তু আপনি একমাত্র আমার ইয়ার।'

মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এইখানেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু শুধু এখানে কেন, আপনি তো সর্বত্রই আমার একমাত্র ইয়ার।'

আমি বললুম,

'ঘোড়ার আমার জুটিবে সওয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী।'

'মানে?'

'আমি আপনার চেয়ে বয়সে ডবল না হলেও তারই কাছাকাছি আমার পালে ওপার যাবার হাওয়া লাগে লাগে। তখন আপনি হে আমার সাকী, নূতন ইয়ার পাবেন।'

রীতিমত বেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে, 'ছিঃ, আপনি এসব কথা বলেন কেন? ভাষার উপর আপনার বিধিদত্ত অধিকার আছে সেটা আপনার হাতে ধারালো তলওয়ার, সাবধানে ব্যবহার না করলে আমার মত সরল জন, যে বিশ্বাস করে আপনার অতি কাছে এসেছে তার বুকের ভিতর তার ফলাটা হঠাৎ ঢুকে গিয়ে খামোখা রক্ত বওয়াবে না? আপনার কাছ থেকে আমার বহুৎ আশা বহু বহু বৎসর আপনার সাহায্য আমি পাবো বলে নিশ্চিত ধরে নিয়েছি।'

'আচ্ছা, শহ্‌র্-ইয়ার, আপনি ইস্কুল কলেজ গিয়েছেন, সে সূত্রে নিশ্চয়ই দু'পাঁচজনের সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছে অন্তত কোনো কোনো অধ্যাপকের স্নেহ আপনি অতি অবশ্যই পেয়েছেন, কারণ আমি জানি আপনি পড়াশুনায় অসাধারণ ভালো ছিলেন, আপনার আদব-কায়দা মানুষকে নিশ্চিন্ত মনে মেলামেশার সুযোগ করে দেয়, এবং তদুপরি মুসলমান ছাত্রী এই দশ বছর আগেও এতই বিরল ছিল যে হিন্দু অধ্যাপকরা তাদের বিশেষ আদরের চোখে দেখতেন—হয়তো বা তাতে নূতনের প্রতি খানিকটে

কৌতূহলও মেশানো থাকতো। বিয়ের পরে আপনার স্বামীর ইয়ার-দোস্তের সঙ্গেও আপনার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা না হয়ে যায় না। এদের ভিতর কেউ নেই যার সঙ্গ পেলে, যার সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পান?'

'না।' ব্যস্, ঐ একটি শব্দ। এত ক্ষুদ্র পরিষ্কার উত্তর আমাকে রীতিমত হকচকিয়ে দিল।

'কিন্তু—' আমার আর কথা বলা হলো না। প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, 'এ আমি কি দেখছি! মরীচিকা, মরুতৃষা, মিরাজ? ভানুমতী, ইন্দ্রজাল? না, না, এসব কিছুই নয়। আমার চোখ দুটো বিলকুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। ভাই শহর্-ইয়ার, কলকাতায় নেমেই সোজা চশমার দোকান।'

আমার উত্তেজনার কারণ সরল নয়, অতি কুটিল। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। সরকারী হুকুমে যখন সর্ব রেলওয়ে স্টেশনের মদের 'বার' বন্ধ হয়ে গেল, তখন এই পুণ্যভূমি বর্ধমান স্টেশনের কেলনার হয় ভেবেছিলেন চা, বিয়ার, হুইস্কি একই জিনিস, সব কটাই পৈশাচিক মাদকদ্রব্য, কিংবা চা মদ্য না হলেও উত্তেজক দ্রব্য তো বটে। অতএব কংগ্রেসের অকৃত্রিম সদস্য হিসেবে, কংগ্রেস ধর্মানুযায়ী তাঁরা মদ্য জাতীয় সর্ব উত্তেজক আবর্জনার সঙ্গে চাকেও কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেন। এ তত্ত্বটি আমি সাতিশয় বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি। কেউ যদি সন্দেহ প্রকাশ করে, আমি তা হলে তাকে দেখে নেব—কি কি করবো, এখন বলছি নে, কিন্তু সর্বপ্রথমেই যে আমি তার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনবো সে-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়।

এহেন দৃঢ় প্রত্যয় যখন আমার হৃদয়মনে দড় খানা গড়ে টাইট বসে আছে, তখন যদি বর্ধমান রেল কামরায় কেলনারের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে—মনে রাখবেন, আমরা তাকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, বাস্-ট্যাক্সি

পারমিটের প্রলোভন দেখাই নি—আবার বলছি আপন খেয়াল-খুশী-মর্জিমোতাবেক, মেহেরবানী মাফিক একখানা ট্রেতে ঢাউস পট চা, রুটি-মমলেট সামনে ধরে সবিনয় বলে, 'মেম সাহেব, আপকী চা' তবে কি আপনার নলেজ বাই ইনফারেন্স্ এই হবে না, যে আপনার চোখ আল্লার গজবে বিলকুল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে? এ তো মাতালের সিঙ্গল বস্তু ডবল দেখা নয়। এ যে যা নেই তা দেখা, আকাশকুসুম শোঁকা, গাড়ির কামরার মধ্যিখানে রাজার পিসি কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলতে খেলতে ফ্রেম থেকে খুলে আমসত্ত্বভাজা খাচ্ছেন তাই দেখা!

'না, না, না। ইয়ার শহর্-ইয়ার, এ সেই আরব্য রজনীর অন্-নশ্-শারের কাল্পনিক ডিনার! আমি এসব 'জিনিস' স্পর্শ করার চেষ্টা করে হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধনেওয়ালার মত সমুখের 'বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমে'র ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে বাদবাকী জীবন ঝুলে থাকতে চাইনে।'

শহর্-ইয়ার বললেন, 'আপনার হুঁশিয়ারী অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তবে এ সম্পর্কে সামান্য একটি কথা আছে। আপনি যখন কাটুকে টাকা দিয়ে বাড়িঘর খবরদারীর কথা বলছিলেন তখন আমি স্টেশনের লোককে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়ে ব্যবস্থাটা করিয়েছিলুম। এবারে খান।'

ওঃ! এ খাওয়াতে ডবল সুখ! আর সবাই জান পানি করে পেয়েছে ভাঁড়ের পানি—না চা? সে একই কথা।

আমি আগের সীটে ফিরে গেলুম না।

এবারে ডাক্তার গাফিলী করেন নি, কিংবা ভুলেও যান নি। তাঁর পিতার আমলের সেই ঢাউস পাল্কী গাড়ির মত মোটর নিয়ে স্টেশনে হাজির। লক্ষ্য করলুম, ডাক্তারদের সামাজিক আচরণ যদিও আর পাঁচজন হিন্দুদেরই মত, তবু বাড়ির বাইরে

বিশেষ করে যেটাকে বলা হয় পাব্লিক প্লেস সেখানে স্ত্রীর সামনে এখনো একটু আড়ষ্ট, যেন সবে পরশু দিন তাঁদের শাদী হয়েছে।

প্রথমটায় রাস্তার উপরকার দোকানপাট, ছুটো একটা গারাজ দেখে সেগুলোর পিছনে কি বস্তু আছে ঠিক অনুমান করতে পারি নি। মোড় নিয়ে খোলা গেটের ভিতর দিয়ে গাড়ি তখন সংকীর্ণ একটা গলিপানা প্যাসেজের ভিতর দিয়ে ঢুকছে।

গাড়ি থেকে নেমে আগাপাস্তলা তাকিয়ে দেখি বিরাট, প্রকাণ্ড প্রাচীন যুগের একটা বাড়ি—বরঞ্চ ফরাসীতে বলা উচিত শাটো। ক্ষীণ আলোকিত আকাশের অনেকখানি ঢেকে রেখেছে বাড়িটা—তার থেকেই অনুমান করলুম সেটার সাইজ। কারণ সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, অপ্রদীপ। শুধু দোতলার বৃহৎ একটা অংশের সারিবাঁধা অনেকগুলো জানলা দিয়ে বেরুচ্ছে যেন আলোর বন্যা। এ যুগেও যে কলকাতায় এ রকম অতিকায় বসত-বাটি আছে সে ধারণা আমার ছিল না। বাড়িটা কিন্তু রাজামহারাজাদের কলকাতার ফ্যান্সি প্যালেস প্যাটার্নে তৈরী করা হয় নি। গাড়ি-বারান্দায় যে একটি আলো জ্বলছিল তারই আলোকে দেখলুম, অলঙ্কারবর্জিত সাদামাটা—কিন্তু খুবই টেঁকসই দড় মাল-মসলা দিয়ে বাড়িটা তৈরী। পরিষ্কার বোঝা গেল যে যিনি বাড়িটা তৈরী করান তাঁর অসংখ্য ঘর-কামরার দরকার ছিল বলে সেটাকে যতদূর সম্ভব বড় আকারের করে তৈরী করিয়েছিলেন এবং সেই সময় এটাও স্থির করেছিলেন যে তাঁর বংশধরগণকে যেন অন্তত দু'শ বছর ধরে অন্য বাড়ি বানাবার প্রয়োজন না হয়।

দারওয়ানসহ জনা পাঁচেক লোক এগিয়ে এল। হঠাৎ নবাবদের উর্দি পরা লোকজনের হাফ মিলিটারি সেলুটাদির আশঙ্কা আমি করি নি। তারাও মুসলমানী কায়দায় অল্প ঝুঁকে সালাম জানালো। কোনো জায়গায় কোনো কৃত্রিমতা নেই।

ডাক্তার কথা বলে যাচ্ছেন, ম্যাডাম—মনে হলো যেন ক্রমেই গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হয়ে যাচ্ছেন। মুসাফিরীর ক্লান্তিও হতে পারে।

বাড়ির বিপুল আকারের তুলনায় দোতলা যাবার সিঁড়ি যতখানি প্রশস্ত হওয়ার কথা ততখানি নয়, যদিও প্রয়োজনের চেয়েও বেশী।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলুম যখন দোতলার একটা অতি দীর্ঘ বারান্দার উপর দিয়ে যেতে যেতে খোলা দরজা দিয়ে ডাইনের দিকে দেখি, একটার পর একটা মাঝারি সাইজের বেডরুম, ড্রইংরুম, মাঝে মাঝে ডাইনিংরুম—কখনো দিশী ধরনের, কখনো বা বিলিতি স্টাইলের। দু'একটা কামরা মনে হলো যেন বাচ্চাদের পড়াশুনোর ঘর। বেডরুমগুলোর কোনোটাতে প্রাচীন দিনের জোড়া পালঙ্ক, কোনোটাতে ছোট ছোট তিনখানা তক্তপোশ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কোনো ঘরে একটি মাত্র জনপ্রাণী নেই, বিছানাপত্র কিন্তু ছিমছাম তৈরী আর প্রায় প্রত্যেকটি কামরায় বিজলী বাতি জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডান দিকে মোড় নেবার সময় আমি আবার লক্ষ্য করেছিলুম বাঁ দিকে এটারই মত একটা দীর্ঘ উইঙ, রাইট এঙ্গেলে এটার সঙ্গে লেগে ইংরিজি এল শেপ তৈরী করেছে। সেটা কিন্তু অন্ধকার।

অবশেষে দীর্ঘ অভিযান শেষ করে আমরা একটা বড় সাইজের ড্রইংরুমে ঢুকলুম। আমাকে বসিয়ে বললেন, 'আমার বন্ধু-বান্ধবরা দেখা করতে এলে এখানেই বসেন; তাঁরাই পছন্দ করে এটা বেছে নিয়েছেন। একটু পরেই আপনার ঘর দেখাচ্ছি—শহ্‌র্-ইয়ার সেটা চেক্ আপ করে নিক্। ঘরটা ভাল না লাগলে কাল আপনার খুশী-মত যে কোনো একটা পছন্দ করে নেবেন। বাঁ দিকে মাদামের বুদোওয়ার—সমস্তটা দিন তিনি ঐখানেই কাটান। আর এই ডান দিকে আপনার ঘর—অন্তত এ-রাত্রিটার মত। চলুন, দেখি, কদ্দূর কি হলো। শহ্‌র্-ইয়ার আবার একটু অতিরিক্ত পিটপিটে, তায় আবার আপনার প্রতি তার হিমালয়ান ভক্তি।'

অ। মাদাম একেবারে ন'সিকে বিলিতি। একটা চেয়ারে বসে তদারকী করছেন—বেয়ারাটা আমার দুটো সুটকেশ থেকে জিনিসপত্র, জামাকাপড় বের করে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখছে কি না। আমার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনার বইপত্র, কাগজকলম পাশের ঘরে আপনার স্টাডিতে। অন্তরঙ্গ বন্ধু'—এবারে মুখে কৌতুকের হাসি, 'কিংবা বান্ধবী দেখা করতে এলে ঐ স্টাডিতে নিরিবিলিতে তাঁকে এনটারটেন করতে পারবেন। আর এই এখানে বাথরুমের দরজা। হাতমুখ ধোবেন, না গোসল করবেন? আমি ছুট লাগাচ্ছি এখন, ডালভাতের তদারকী করতে। বেয়ারা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে—আমি বাসনবর্তন থেকে ফুর্সৎ না পেলে।' ডাক্তারকে শুধোলেন, 'হ্যাঁ গা তুমি খেয়ে দেয়ে পেটটান করে ফেলো নি তো?' ফের আমাকে বললেন, 'লেবরেটরি থেকে ফেরা মাত্রই উনি খাবার টেবিলের দিকে যে স্পীডে ধাওয়া করেন যে দেখে মনে হয়, বহু শত বৎসরের বিরহ কাটানোর পর মজনু প্রিয়া লাইলিকে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের একটি অতশিয় মহৎ সদ্‌গুণ আছে—যেটি প্রতি যুগে প্রতি দেশে বিবাহিতা রমণী মাত্রই আপন পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে। হিন্দু হলে বলবে, না জানি কত শত যুগ তপস্যা করে এ-হেন বর পেলুম, আর আমি বলি আমার বহু মুরুব্বির বহু দিল্‌-এর দোওয়ার ফলে এ-হেন কর্তা পেয়েছি। সেই মহৎ সদ্‌গুণটি কি? খানা-টেবিলের পানে ধাওয়া করে সেখানে যদি দেখেন সের্ফ প্লেন এক ধামা মুড়ি, কিংবা পক্ষান্তরে যদি দেখেন কোর্মা-কালিয়া-মুসল্লম-কাবাব-পোলাও গয়রহ তখন এই সহৃদয় মহাজনের কাছে দুই পক্ষই বরাবর। আর না—আমি চললুম।'

ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে লাজুক হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'একেই তো বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন এক-

খানা উয়েল-লুব্রিকেটেড রসনা—ডাক্তার হিসেবে নিতান্ত হিউমেন এনাটমি জানি বলে একখানা রসনাই বললুম, ইতর জন বলবে শতাধিক—তদুপরি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের খুশ-কিস্মৎ নেক্-নসীব হওয়ার পর থেকে তার উপর ভর করেছে একটা আস্ত সাহিত্যিক জলজ্যান্ত মামদো। আপনার সাহিত্যিক গুণটা পেলেও নাহয় সেটা সয়ে নিতুম। তা নয়। রামকে না পেয়ে পেয়েছে তার খড়ম। এখন আমার ব্রহ্মতালুর উপর শুকনো সুপরি রেখে অষ্টপ্রহর দমাদম পিটুনি—সেই আপনি, রামচন্দ্রজী, আপনার খড়ম যে বরায়ে মেহেরবানী এনাম দিয়েছিলেন তাই দিয়ে। ওফ্।'

আমি বললুম, 'শত যুগের তপস্যা-ফপস্যা জানিনে, ডাক্তার, কিন্তু আপনি যে রত্নটি পেয়েছেন সেটি অতিশয় কপালী লোকেও পায় কি না-পায় সন্দেহ। আর আমার জান্-কলিজা-দিল থেকে দোওয়া আসছে, আপনারা যেন একে অন্যের অক্লান্ত কদর দিতে দিতে দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, দরাজের চেয়েও দরাজ জীবন যাপন করেন। আমেন!'

ডাক্তার বললেন, 'আমার সব মুরুব্বজন ওপারে। এপারে মাত্র একজন—আপনি। আল্লা যেন আপনাকে একশ' বছরের জিন্দেগী দেন। আমেন, আমেন।'

রুচিশ্রী অনাড়ম্বর খানা খাওয়া শেষ হলে পর একটুখানি ইতিউতি করে ডাক্তার বললেন, 'আজকের মত আমাকে মাফ করে দেবেন, স্যর? দিনভর বেদম খাটুনি গিয়েছে। আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—ওদিকে আবার এশার নমাজ এখনো পড়া হয় নি।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাল সকালে দেখা হবে তো? না আপনি লেবরেটরিতে গিয়ে সেখানে ফজরের নমাজ পড়েন? গুড নাইট, ডাক্তার। খুদা-হাফিজ!'

ডাক্তার মাথা নিচু করে বললেন, 'গুড নাইট, স্যর।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি আসতে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।'

শহ্‌র্-ইয়ার উঠে বললেন, 'আমি ঠিক দু'মিনিটের ভিতর ফিরে আসছি।'

ডাক্তার তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। শহ্‌র্-ইয়ার সেদিকে কান না দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।

আমি শোবার ঘরে এসে ধীরে সুস্থে কাপড় ছেড়ে সবে একখানা বই নিয়ে বসেছি এমন সময় ম্যাডাম এসে উপস্থিত। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ওঁর নমাজের ব্যবস্থটা আমি নিজের হাতে করে দি। ঐ একটি ব্যাপারে, সত্যি বলছি ঐ একটি মাত্র ব্যাপারে উনি সহজে সন্তুষ্ট হন না। আর-সবাই তো বছরের পর বছর একই জায়নমাজে নমাজ সেরে সেটি ভাঁজ করে রেখে দেয়, পরের বারের জন্য?—উনি বললেন "উহু—কত ধুলোবালি ময়লা জমে তার উপরে।" তাই তাঁর প্লেন লংক্লথের তিনখানা জায়নমাজ আমি পালাক্রমে রোজ রাত্রে কেচে রাখি। উনি অবশ্য বলেছিলেন বেয়ারা কাচুক না। কিন্তু আমি জানি, আমার হাতে কাচা জায়নমাজে তিনি প্রসন্নতর চিত্তে নমাজ পড়েন।'

আমি ঈষৎ বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই এশার নমাজের কথা শুনে। এবারে পুরো মাত্রায়। শুধালুম, 'উনি কি নমাজ-রোজাতে খুব আসক্ত? তাই তো মনে হচ্ছে।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'আসক্ত! ঐ দুটি মাত্র ধাতু দিয়েই তো তাঁর জীবন গড়া। নমাজ-রোজা আর রিসার্চ।'?

আমি হাসতে হাসতে মাথা দোলাতে দোলাতে বললুম, 'আমি সব্ জানি, আমার কোনো জিনিস অজানা নেই। আমি পয়গম্বর

হজরৎ মুহম্মদ সল্লললাহু ওয়া আলাইহি সসলাম-এর বংশধর, তদুপরি আমি সাতিশয় সম্মানিত পীর খানদানের ছাওয়াল, তদুপরি আমার ঠাকুরদা দাদামশাই দু'জনাই ছিলেন জঁহাবাজ মৌলানা। আমি জানবো না তো কে জানবে ? আপনি ? ডাক্তার ? আবাদন্! হরগিজ নহী।' বলে তিনটি আঙুল তুলে ঘন ঘন আন্দোলন করতে করতে বললুম, ট্রিনিটি, ট্রিনিটি—পিতা পরমেশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা। আপনি সেই পবিত্র আত্মা। আপনি সেই পবিত্র আত্মা—রূপকার্থে ও শব্দার্থে। কিংবা, ভদ্রে বেগমসাহেবা, কাছে এসে অস্মদেশীয় গীতাটি স্মরণ করুন। জ্ঞানযোগ—সে ডাক্তারের রিসার্চ। কর্মযোগ—সে তাঁর আরাধনা-ক্রিয়া-কর্ম। ভক্তিযোগ—সে আপনার প্রতি তাঁর অবিচল ভালোবাসা। আপনাদের উভয়ের এ জীবনে সুখ আছে এবং অন্য লোকে মোক্ষ-নজাৎ! অবশ্য দ্বিতীয়টা যেন একশ' বছর পরে আসে। কারণ ফার্সীতে বলে, দের আএদ, দুরুস্ত আএদ—বেটা দের-এ অর্থাৎ দেরিতে আসে সেটাই দুরুস্ত—পরিপাটি—হয়ে আসে।'

আমার উৎসাহের বন্যায় শহর্-ইয়ার ডুবুডুবু। সাদা-মাটা ভাষায় বললেন, 'আপনার মুখে মধু, কানে মধু—এই যেন চিরকাল আপনার কিস্মতে থাকে। আর আপনার শুভেচ্ছা-দোয়ার জন্য আমার যা কর্তব্য কাল, শুক্রবার, সেটি করবো। আপনার সলামৎ-কল্যাণের জন্য মহল্লার মসজিদে শিনী পাঠাবো। নমাজান্তে জমায়েৎ ধর্মনিষ্ঠজন আপনার আত্মার জন্য দোয়া করবেন।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, 'বে-ফায়দা, বে-কার, ইয়ার। বে-ফায়দা, বেকার। আমার মত পাষণ্ড পাপীর জন্য শিনী পাঠানো তপ্তকটাহে বিন্দুমাত্র বারিসিঞ্চনতুল্য! তা সে যাক্—আল্লা মেহেরবান, তাঁর কাছ থেকে শেষ বিচারের দিনে মাফের আশা রাখি। এবারে বলুন তো, নমাজ-রোজার প্রতি আপনার কি রকম টান ?'

দুঃখ করে বললেন, 'আমার বদ্-নসীব। আল্লা আমাকে সেদিকে মতিগতি দেন নি।'

'কর্তা অনুযোগ করেন না?'

'একদম না। ভদ্রলোক কক্‌খনো কাউকে কোনো জিনিস করতে বলেন না—ভালোও না, মন্দও না। এমন কি তাঁর মডার্ন বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ তাঁর আচারনিষ্ঠতা নিয়ে অল্পস্বল্প স্নেহসিক্ত কৌতুকের ইঙ্গিত করলে তিনি শুধু মিটমিটিয়ে হাসেন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে ধর্ম নিয়ে তাঁদের ভিতর আলোচনা আরম্ভ হলে তিনি সব-কিছু শোনেন মন দিয়ে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে কক্‌খনো সে আলোচনায় যোগ দেওয়াতে পারেন নি। বিশ্বাস করবেন না, আমার সঙ্গে তো সব বিষয়েই কথাবার্তা হয়—আমার সঙ্গে পর্যন্ত তিনি কখনো ঐ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি, আমি সূত্রপাত করলেও না। এই দেখুন, রববারে কাজে বেরন না বলে ফজরের নমাজ পড়ে প্রথম এক ঘণ্টা কুরান পড়েন সুর করে 'কারীদের' মত। তারপর খানতিনেক ইংরিজি বাংলা অনুবাদ আর একখানা আরবী টীকা নিয়ে আরেক ঘণ্টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি শব্দের গভীরে গিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নোট করে টোকেন। আমি তাঁকে এক দিন ঐ অধ্যয়নের দিকটা আমার সঙ্গে করতে অনুরোধ জানিয়েছিলুম। তিনি বললেন, "আমি নিজে এতই অল্প জানি যে তোমাকে কম্‌পিটেন্টলি সাহায্য করার শক্তি আমার মধ্যে নেই। আমি বরং তোমার জন্য একজন ভালো মৌলানা জোগাড় করে দিচ্ছি।" আমি বললুম, থাক। আপনিই তো কবি ওমর খৈয়ামের একটি চতুষ্পদী অনুবাদ করেছেন,

"তব সাথে, প্রিয়ে মরুভূমি গিয়ে
পথ ভুলে তবু মরি,
তোমারে ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া
কি হবে মন্ত্র স্মরি!" '

আমি বললুম, 'এটা কি ডাক্তারের উচিত হলো? পরিপূর্ণ সত্য একমাত্র আল্লার হাতে; আমাদের শুধু চেষ্টা তার কতখানি কাছে আসতে পারি। ডাক্তার কি ভাবছেন, তিনি যে মৌলানা এনে দেবেন কুরান শরীফ সম্বন্ধে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে? আমি ডাক্তার হলে বলতুম, "মোস্ট ওয়েল্‌কাম্!" তারপর এক সঙ্গে পড়তে গিয়ে যদি আপনি দেখতেন যে ব্যাপারটা থ্রী-লেগড্ রেস হয়ে যাচ্ছে তখন চিন্তা করতুম, এখন তা হলে কি করা যায়? তার বদলে মৌলানা এনে লাভ? তিনি তো প্রথম ঝাড়া পাঁচটি বৎসর আপনাকে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করাবেন, এবং তারপর? আপনি, ডাক্তার, আমি—আমরা কুরানে যা খুঁজি, মৌলানা তো সেটা খোঁজেন না। তাই দাঁড়াবে:

তৃষ্ণায় চাহিনু মোরা এক ঘটি জল
মৌলানা এনে দিল আধ খানা বেল!

আপনি ডাক্তারের প্রস্তাব না মেনে বেশ করেছেন। কিন্তু ডাক্তারের কথা ওঠাতে মনে পড়লো, বেচারী সমস্ত দিন খেটেছে, আপনার সঙ্গে দু চারটে কথা বললে তার শরীর মন জুড়াবে। আপনি যান না।'

শহর্-ইয়ারের সে কী খিলখিল হাসি। হাসতে হাসতে যেন চোখে জল দেখা গেল। বললে, 'ইয়া আল্লা! আপনি আছেন কোন্ ভবে? এশার নমাজ সেরে বালিশের উপর ভালো করে মাথাটি রাখার আগেই তো তাঁর আগের থেকে তৈরী পরিপাটি নিদ্রাটি আরম্ভ হয়ে যায়। যেন যন্ত্রটি হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাজনা—আলাপ না, বিলম্বিত না, আর যন্ত্রটা বাঁধার তো কথাই ওঠে না। আর হপ্তায় ক'দিন আল্লায় মালুম, শুতে গিয়ে দেখি তিনি নমাজ সেরে জায়নমাজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। খাটে ওঠবার আর তর সয় নি। আর সে কী ঘুম, কী ঘুম! অত্যন্ত নিষ্পাপ মানুষ ভিন্ন অন্য লোক বোধহয় আল্লার কাছ থেকে এ-ইনামটি পায় না।'

আমি শুধালুম, 'এ বাড়িতে আপনার সঙ্গী-সাথী কেউ আছে ?'

অবাক হয়ে বললেন, 'এ বাড়িতে ?'

'হ্যাঁ।'

বললেন, 'এ বাড়িতে তো আমরা দুজন থাকি। সঙ্গী-সাথী আসবে কোত্থেকে ?'

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা। শুধালুম. 'এই যে গণ্ডায় গণ্ডায় সাজানো গোছানো ঘর পেরিয়ে এলুম।'

'কেউ থাকে না তো।'

'ঐ যে উইংটা—এল শেপের মত এসে লেগেছে ?'

'সেখানেই বা থাকবে কে ?' ওখানে তো আলোই জ্বালানো হয় না।'

'নিচের তলায়, তেতলায় ?'

'সেগুলোও তো অন্ধকার দেখলেন। কেউ থাকে না উপরে, নিচে। থাকি আমরা দুজনে আর যে ক'টি লোক দেখলেন, আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলুম।'

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললুম, 'এই বিরাট বাড়িতে মাত্র দু'জন লোক !'

শহ্‌র্-ইয়ার একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার ভয় করছে ? কিন্তু এটা ভুতুড়ে বাড়ি নয়, রহস্য উপন্যাসের 'অভিশপ্ত পুরী'ও নয়। যিনি এ বাড়ি বানিয়েছিলেন—সে ক'যুগের কথা আমি জানিনে—তাঁর পরিবার, ইষ্টকুটুমগুষ্টি নিয়ে এ বাড়িটাও নাকি যথেষ্ট বড় ছিল না। কিন্তু আমি সত্যি বিশেষ কিছু জানিনে। উনিও যে খুব বেশী কিছু জানেন, তাও তো মনে হয় না। ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন নিঃসঙ্কোচে। এ বংশের, এ বাড়ির কোনো গোপন রহস্য নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'আর উনিই বা বলবেন কি ? সেই খুদায় মালুম ক'শ লোকের পরিবার কমতে কমতে মাত্র এক জনাতে এসে ঠেকলো তারই তো ইতিহাস ? আমার

মনে হয় না, তিনি খুব বেশী কিছু একটা জানেন—আর এ বাবদে তাঁর কোনো কৌতূহলও নেই। তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কত বিরাট বিরাট পরিবার প্রতিদিন 'বল ক্ষীণ' 'আয়ুহীন' হয়ে ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে, অতীতে গেছে, ভবিষ্যতেও যাবে। এতে বৈচিত্র্যই বা কি, আর রোমান্‌সই বা কোথায়? আর, এ তো শুধু একটা পরিবার। কত জাতকে জাত কত নেশনকে নেশন পৃথিবীর উপর থেকে নিশ্চিহ্ন মুছে গেছে, তারই বা খবর রাখে কে?'

আমি বললুম, 'থাক্ এসব দুঃখের কথা। আমি এখানে রোমান্‌সের সন্ধানে আসি নি সে তো আপনি জানেন। এবারে বেশ মোলায়েম, মধুর, দিল্-চস্‌প্ কোনো একটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করুন। আপনার নামের মিতা বাগদাদের শহ্‌র্-ইয়ার শহর-জাদী এক হাজার এক রাত্রি গল্প বলেছিলেন। আপনি না হয় হাজারের শেষের এক রাত্রি সেইটে আরম্ভ করুন, বা শেষ করুন।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'যবে থেকে এখানে এসেছেন, সেই থেকে তো আমি সুযোগ খুঁজছি।'

আমি বললুম, 'মাফ করে দেবেন।'

তিনি বললেন, 'আপনার দোষ কে বললে? বলছিলুম কি, আমারও রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডের একটি মামুলী সঞ্চয়ন আছে। দু'এক খানা শুনবেন?'

'নিশ্চয়ই, একশ বার এবং ধরে নিচ্ছি ডাক্তারের বিধিদত্ত যোগনিদ্রা তাতে ব্যাহত হবে না।'

আশ্চর্য, আমার শোবার ঘরের দেয়ালে শহ্‌র্-ইয়ার বোতাম টিপে একটা ঢাকনা চিৎ করালেন। ভিতরের ক্যাবিনেট বা কুলুঙ্গি থেকে যেন রেল লাইনের উপর দিয়ে গ্লাইড্ করে বেরল একটি রেডিয়োগ্রাম। এ না হয় বুঝলুম, কিন্তু ঘরের পশ্চিম প্রান্তের এস-পার-উস-পার জোড়া দেয়ালে বিল্ট্-ইন্ দেরাজের স্লাইডিং দরজাগুলো যখন এদিক ওদিক সরাতে আরম্ভ করলেন তখন তার 'মামুলী সঞ্চয়ন'

দেখে—আমি বাঙাল—জীবনে এই দ্বিতীয় বার হাইকোর্ট দেখলুম। দশ বিশ বছর ধরে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড না কিনলে তো এ রকম বিরাট সঞ্চয়ন হয় না। এবং খাস মার্কিন স্টাইলে সেগুলো কার্ড ইনডেক্‌সিং পদ্ধতিতে সাজানো। গোটা ছয় কার্ডশেলফ্‌ আমার সামনের টেবিলে রেখে বললেন, 'ক্যাটালগ দেখতে চান তো এই রইল। আমার নিজের দরকার নেই। আমার মুখস্থ আছে। আরেকটা কথা, এ সঞ্চয়নের অনেক out of print রেকর্ড কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুর্না রেকর্ড নতুনের দামে কেনা।' তারপর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই লাগালেন, 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুম চয়নে'—এ গানটা যেন আমাদের উভয় পক্ষের সম্মিলিত 'বিস্‌মিল্লা'—'আল্লার নামে আরম্ভ করি'র মত।

শহ্‌র্‌-ইয়ার দেখলুম গান শোনার সময় চোখ বন্ধ করে পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

এখানেও সেই বোলপুর পদ্ধতি। দুটো গানের মাঝখানে দীর্ঘ অবকাশ দেন।

আমাকে শুধোলেন, 'এবারে আপনার পছন্দ কি?'

আমি আমার কণ্ঠে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ করে বললুম, 'আমি এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শপথ নিয়ে বলছি, আপনার আমার রুচি একই। আমার বাড়িতে আপনি বাছাই করে যে-সব গান বাজিয়েছিলেন তার থেকেই আমার এ দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে।'

বললেন, 'মুশকিলে ফেললেন! আমি যখন নিতান্ত নিজের জন্যও বাছাই করি তখনো আমার এক যুগ কেটে যায় একটা রেকর্ড বাছাই করতে।' তারপর রেডিয়োগ্রামের দিকে যেতে যেতে আপন মনে বললেন, 'হুঁঃ! তারও দাওয়াই বের করেছি। কাল আমি শুয়ে থাকবো পাটরাণীর মত আর এই পীরের সন্তানকে বলবো রেকর্ড বাজিয়ে গানের সূত্রপাত করে পাপ সঞ্চয়ন করুন তিনি।'

এবার বাজালেন, 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি .'

তার মোহভঙ্গ হওয়ার পর যখন আমার কাছে এসে বসলেন তখন আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনার আত্মার খাদ্য কি ?'

'আরো বুঝিয়ে বলুন।'

'দেহ ছাড়া আছে মানুষের মন, হৃদয়, আত্মা। আপনার বেলা এঁরা পরিতৃপ্ত হন কি পেলে ? যেমন মনে করুন সাহিত্যচর্চা, নাট্য দর্শন, সঙ্গীত শ্রবণ,—এমন কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, বা যেমন আপনার স্বামীর বেলা সৃষ্টিকর্তার আরাধনা, কিংবা—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'এবারে বুঝেছি এবং তারপর উত্তর দিতে আমাকে আদপেই বাছ-বিচার করতে হবে না, একলহমা চিন্তা করতে হবে না। আমার জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত। ঐ একটি মাত্র জিনিস।'

আমি বললুম, 'ব্যস্ ?'

'ব্যস্।'

এবারে বাজালেন, 'আমার নয়ন—'

কাছে এলে ফের শুধালুম, 'রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া আর কি ?'

বললেন, 'এর অনেক, অনেক পরে আসে যে-সব জিনিস সেগুলোর মধ্যে একাধিক জিনিস আমাকে আনন্দ দেয়, মুগ্ধ করে, সম্মোহিত করে, আত্মবিস্মৃত করে, কিন্তু এরা আমার প্রাণরস নয়।'

'সেগুলো কি ?'

'যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরচ্চাটুয্যের বড় গল্প, আপনার শব্‌নম্,—'

আমি বললুম 'থাক্, থাক্। এ নামগুলো আর কখনো এক নিশ্বাসে করবেন না। লোকে বলবে, আপনার রসবোধ অদ্ভুত, বিজার্, গ্রোটেস্ক।'

'বলুক। আমি কুমারস্বামী নই, স্টেলা ক্রামরিশও হতে চাইনে।'

এবারে বাজালেন,

ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে বসলেন। আমি লম্বা হয়ে শুয়ে উত্তম যন্ত্রে, সমঝদার কর্তৃক সযত্নে বাজানো বে-জখমী রেকর্ড শুনছিলুম—পরম পরিতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে আমি যেন আমার সর্ব দেহ মন কোনো এক মন্দাকিনী ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছি। মৃদু কণ্ঠে বললে, 'আপনার পা টিপে দি?'

আমি সর্পাহতবৎ লাফ দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসে বললুম, 'এ আবার কি?'

দেখি, তাঁর মুখ থেকে সর্বশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে। আমার দিকে তাকালেন না, দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

আমি তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি, ভুল আমারই, উত্তেজিত হওয়াটা আমার গাঁইয়া বেকুবী হয়েছে। সেটা ঢাকবার জন্য রেডিয়োগ্রামের কাছে গিয়ে না দেখে-চেয়ে আগের রেকর্ডটার উল্টো পিঠটা বাজাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মেশিনটা এমনই নূতন মডেলের যে কোন্ বোতাম টিপলে কি হয়, কোন স্ক্রু কি ফানকশন অনুমান না করতে পেরে ভ্যাবাচ্যাকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম। শহ্‌র্-ইয়ার বুঝতে পেরে কাছে এসে বললেন—আল্লাকে শুক্‌র্, তাঁর গলায় কণামাত্র উত্তাপ বা অভিমান নেই—'এখন আমি বাজাই। কাল আপনাকে দেখিয়ে দেব। তা হলে আপনার ইচ্ছেমত যখন খুশী তখন বাজাতে পারবেন। তাই এই ঘরটাতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছিলুম।' কথাগুলো শুনে লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল। এ মেয়ের অনেক গুণ প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি কিন্তু সে যে এত-খানি দয়ালু আর ক্ষমাশীলা সেটা লক্ষ্য করে যেমন লজ্জা পেলুম তেমনি আনন্দও হলো যে এমন সদ্‌গুণ শুধু যে পৃথিবী থেকে

অন্তর্ধান করে নি তাই নয়, আমারই এক পরিচিতার ভিতর পরিপূর্ণ মাত্রায় রয়েছে।

রেকর্ড চালু করে দিয়ে এবারে শহ্‌র্-ইয়ার চেয়ারে বসলেন। আমি ততক্ষণে বিছানায় আবার লম্বা হয়েছি।

'বললুম, 'শহ্‌র্-ইয়ার।'

'জী?'

'আগে, যেখানে বসেছিলেন সেই খানেই এসে বসুন।'

'জী' বলে এসে বসলো।

আমি বললুম, 'টিপতে হবে না, হাত বুলিয়ে দিন।' এবারে তাঁর মুখ আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আমি বললুম, 'আমি বড়ই মূর্খ। মনে আছে আপনারা দুজনা যখন বোলপুরে আসেন তখন প্রথম পাঁচ মিনিটের ভিতরেই আমি বলেছিলুম, "এদেশে আমার আত্মজন নেই?" তখন লক্ষ্য করেছিলুম, আপনার চোখ ছলছল করেছিল। তারপরও দেখুন দেখি, আমি কত বড় বেকুব।'

'শহ্‌র্-ইয়ার হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'থাক্ না। এই সামান্য জিনিস নিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললম, 'আমি কত বেকুব দেখুন। আচ্ছা, কাল যদি আমার শক্ত ব্যামো হয়, তা হলে আপনিই তো আমার দেহ মনের সম্পূর্ণ ভার নেবেন এবং নার্স যা করে তার চেয়েও বেশী করবেন। নয় কি? তবে আজ আমার এত লজ্জা কেন?'

এবারে শহ্‌র্-ইয়ার শিশিরবিন্দুটির মত ঝলমল করে উঠলো।

উঠে এসে আমার মুখের উপর তাঁর হাত রেখে আদরে ভরা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে বলি নি আর কথা না বলতে। এই আপনার মুখ বন্ধ করলুম। দেখি, কি করে ফের কথা বলেন। আসলে আপনার যাতে এখানে কোনো অসুবিধা না হয় তাই কাটুকে আমি

আপনার কি কি দরকার, আপনার ডেলি রুটিন কি এসব অনেক প্রশ্ন শুধিয়েছিলুম। কথায় কথায় সে বললে, আপনি 'গা' টেপাতে ভালোবাসেন। তাই। এবার সব ভুলে যান।' হাত মুখ থেকে সরালেন।

বললুম, 'ভুলে গিয়েছি!'

হাসলেন। শুধালেন, 'এবারে কি বাজাব?'

ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'ঐ মরণের সাগর পারে, চুপেচুপে তুমি এলে।'

সঙ্গে সঙ্গে একদম ডেড্‌স্টপ। তারপর আমার হাতের কাছে খাটের বাজুতে বসে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি ধীরে ধীরে বললেন, 'এই বারে আবার মনের অন্ধকারতম কোণেও আর কোনো সন্দেহ রইল না যে আপনার আমার রুচি এমনই অস্বাভাবিক ধরনের এক যে, আর কেউ জানতে পারলে বলবে, আমি আপনার অন্ধ ভক্ত বলে আমার রুচি আপনার রুচির কার্বন কপি মাত্র। অথচ কী আর বলবো, এ গান আমাকে যে রকম আত্মহারা করে দেয় অন্য কোনো গান সে-রকম পারে না। জানেন, এ গান কিন্তু এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমঝদারদের ভিতরও অতি, অতি দৈবে-সৈবে গাওয়া হয়। এবং যে দু'বার শুনেছি সেও একদম বাইরের অজানা অচেনা গাওয়াইয়া গেয়েছে -অর্থাৎ সমঝদারদের চেলাচেলীর কেউ না। আমার তো বিস্ময় বোধ হয়, রেকর্ড কোম্পানি কোন্ সাহসে এ-গানটি বাছাই করলো! দিনু বাবুর চাপের দরুন না কি?

'আর কী অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছেন আপনার গুরুদেব এই গানে।'

'ভুবন-মোহন স্বপন রূপে'—কি বস্তাপচা সমাস এই 'ভুবনমোহন'-টা। কোনো মেয়ের নাম ভুবনমোহিনী শুনলেই তো আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জগদম্বা, রক্ষাকালী, ক্ষান্তমণি! না? অথচ এই গানের ঠিক এ জায়গাটায় সমাসটা শুনে নিজের কানটাকে

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, এই ঝুলি ঝাড়া, সাতান্ন ঘাটের জল খাওয়া, হেকনিড, ক্লিশে সমাসটি এত মধু ধরে, তার এত বৈভব, এত গৌরব! সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধ চোখের তারা দুটি যেন আকাশের দিকে ধাওয়া করে—নইলে সমস্ত ভুবন কিভাবে মোহন হল সেটা দেখবে কি করে অনেকখানি উঁচুতে না উঠে, সেখান থেকে নিচের দিকে, ভুবনের দিকে না তাকিয়ে! আর তার পর? ঐ ঊর্ধ্বলোক থেকে যখন বিশ্বভুবনের মোহনীয়া রূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আস্বাদন করছি তখন অকস্মাৎ কী নিদারুণ গভীর গহ্বরে পতন! শুনি.

'বন্ধ ছিলাম এই জীবনের অন্ধকূপে—

আমার চোখের সামনে তখন কী বীভৎস দৃশ্য ভেসে ওঠে, জানেন! আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোক এখনো বিশ্বাস করে, কোনো কোনো বিরাট ধনের মালিক তার সমস্ত ধন কোনো এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে পুঁতে রেখে যায়, এবং সেটাকে পাহারা দেবার জন্য চুরি-করে আনা একটি আট বছরের শিশুকে জন্মের মত শেষবার তাকে ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে সেই ধনের পাশে বসিয়ে গুহা-গহ্বর বাইরের থেকে সীল করে দেয়। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সেই ক্ষুদ্র বালকটি যেন অন্ধভাবে ধীরে ধীরে আপন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করছে। তার পর অনুনয়-বিনয়, তার পর রোদন, সর্বশেষে তার ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়ে চতুর্দিকের দেয়ালে আঘাতের পর আঘাত—'

আমি বললুম, 'দয়া করে ক্ষান্ত দিন, আমি আর শুনতে চাইনে।'

বললেন, 'তবে থাক! ঐ যে 'বন্ধ ছিলাম অন্ধকূপে'—আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি তাই নয়? অন্ধকূপের দেয়ালে জীবনভর করে যাচ্ছি মুষ্ঠ্যাঘাত আর আর্তনাদ, "ওগো খোলো খোলো, আমাকে আলোবাতাসে বেরুতে দাও।"

তারপর 'ভুবনমোহন' রূপ নিয়ে মৃত্যু এসে দেয় নিষ্কৃতি—সে

'শ্যামসমান' মোহনীয়া। এ কী ভ্রান্ত ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে যে মৃত্যু বিকট বীভৎস! সে আসা মাত্রই ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে দেখি, আকাশে 'স্তরে স্তরে সন্ধ্যাদীপের প্রদীপ জ্বালা'—কত না নক্ষত্র স্তরে স্তরে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করছে আমাকে অমর্ত্য-লোকের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে, আর পদপ্রান্তে—যে মর্ত্যভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছি সেখানে ঝিল্লি-সঙ্গীতের সঙ্গে পুষ্পবনের গন্ধধূপের সৌরভ!

আপনাকে শুধোই, আপনি বয়সে বড়, অনেক-কিছু পড়বার, শোনবার সুযোগ পেয়েছেন—এ রকম আরেকখানা গান কেউ কখনো রচতে পেরেছে?'

আমি বললম, 'না, কিন্তু আপনি যে রকম গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, ক'জন বাঙালী পারে সেটা?'

শহ্‌র্-ইয়ার অনেকক্ষণ ধরে সমুখপানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। শেষটায় বললেন, 'ঠিক কোন্ দিক দিয়ে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছিনে। আমি যে গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তার জন্য আমার হৃদয় ছিল প্রস্তুত। কিন্তু সে প্রস্তুতিটি নির্মিত হল কি প্রকারে? রবীন্দ্রনাথের গানে গানে। ভিলেজ ইডিয়টেরও হৃদয় আছে কিন্তু সেই আকারহীন পিণ্ড সারাজীবন ধরে একই পিণ্ড থেকে যায়। আমার হৃদয় প্রতি নূতন গানের সামনে নূতন আকার ধরেছে, যেন সে শিল্পীর হাতের কাদা। ঐ চিন্ময় গান শুনতে শুনতে আমার হৃদয় যেন ঐ গানেরই মৃন্ময় রূপ ধারণ করে একটি মূর্তিরূপ ধারণ করে। গানটি যেন শিল্পী। গানের প্রতিটি সুর প্রতিটি শব্দ তার আঙুলের চাপ। সুরে সুরে শব্দে শব্দে অর্থাৎ গান-শিল্পীর আঙুলের চাপে চাপে মূর্তিটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপর শুনলুম আরেকটি গান। আগের মূর্তিটি তন্মুহূর্তেই আবার শিল্পীর হাতে কাদাতে পরিবর্তিত হয়েছে। সুরে সুরে শব্দে শব্দে আবার সে এক নবীন মৃন্ময় মূর্তিতে পরিণত হলো। এভাবে

আমার হৃদয় কত শত মূর্তিতে পরিণত হয়েছে কত শত গানে গানে। আর এখন ? এখন চেনা গানের ছুটি শব্দ শোনা মাত্রই সম্পূর্ণ মূর্তি আপনার থেকেই তার আকার, তার রূপ নিয়ে নেয়। অথবা কি অন্য তুলনা দিয়ে বলবো, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান যেন ভিন্ন আকারে রঙিন পানপাত্র, আর আমার হৃদয় বর্ণহীন তরল দ্রব্য। ঐ গানের পাত্রে প্রবেশ করে সে নেয় তার আকার, তার রঙ।

আমার সুখ-দুঃখের অনুভূতি, আমার মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের অশ্রুপাত আনন্দোল্লাস আমার সর্বপ্রকারে সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা—সব, সব নির্মাণ করেছে, প্রাণবন্ত করেছে রবীন্দ্রনাথের গান ; সেই শত শত গানই শিল্পী—স্রষ্টা !'

আমি চুপ করে, কোনো বাধা না দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছিলুম। বললুম, 'আমরা হিন্দু আর মুসলমান মেয়ের হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করছিলুম। সেই সুবাদে আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মসঙ্গীতে যে চরমসত্তার কাছে আত্মনিবেদন করেছেন তিনি তো মুসলমান সূফীদের 'অল-হক্', পরম 'সত্য' সত্তাস্বরূপ। এ গানগুলো আরবী বা ফার্সীতে অনুবাদ করলে কারো সাধ্য নেই যে বলতে পারে এগুলো রচেছে এমন এক কবি যে মুসলমান নয়। আপনি মুসলমান। এ গানগুলো শুনে আপনার হৃদয় কি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের চেয়ে বেশী সাড়া দেয় ?'

গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললে, 'ঐ খানেই তো ট্র্যাজেডি। কয়েকটি ব্যত্যয় বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ধর্মসঙ্গীতই আমার বুকে তুফান তোলে না। তুললে তো আমার সব সমস্যা ঘুচে যেত। আমার দেহমন সেই চরমসত্তার কাছে নিবেদন করে পরমা শান্তি পেতুম। একেই তো বলে ধর্মানুরাগ। ঘরঞ্চ দেখুন, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না, আল্লা মানুষের রূপ

ধারণ করে অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তৎসত্ত্বেও যে ধর্মসঙ্গীতটি আমার হৃদয়ের ভিতর দুরন্ত তুফান তোলে, সেটি—

মেরে তো গিরিধর গোপাল
দোসরা তো কোঈ নহী রে—

চরম অসহায় অবস্থায় এ-ভজনটি যে আমি কত সহস্র বার কখনো চিৎকার করে এই নির্জন বাড়িতে গেয়েছি, কখনো গাড়িতে বসে গুনগুনিয়ে, আর সবচেয়ে বেশী জনসমাজে—বস্তুত সেখানেই আমি সবচেয়ে বেশী একা, বর্জিতা, অসহায় শক্তিহীনা বলে নিজেকে অনুভব করি—নিঃশব্দে শুধু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ে।'

* * * *

নিঝুম নীরব সে গৃহ, বিরাট ভবন স্তব্ধ, বাইরের ভুবন তন্দ্রামগ্ন।

হয়তো এস্থলে আমার উচিত ছিল সহানুভূতি প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করা শহর্-ইয়ার কেন নিজেকে 'বর্জিতা' 'অসহায়' বলে মনে করেন। কিন্তু করলুম না।

'সর্বনাশ!' হঠাৎ বলে উঠলেন শহর্-ইয়ার। 'তিনটে বেজে গেছে, আপনি ঘুমুন, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। ছি ছি, আমার একেবারে কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই!'

ছয়

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা নারী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়েছেন। শহর্-ইয়ার ঘুমিয়েছে ক'ঘণ্টা? তিন ঘণ্টা? সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশী নিশ্চয়ই নয়। সাড়ে সাতটায় খাবার ঘরে চা খেতে এসে দেখি, তার চেহারা যেন শিশিরধোয়া শিউলি ফুলটি। কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি বেশী মেহেরবান।

শহর্-ইয়ার ডাক্তারের ব্রেকফাস্টের তদারকি করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার লাঞ্চের জন্য স্যাণ্ডউইচ সন্দেশ এটা সেটা ছোট্ট টিফিন-বক্সে সাজাচ্ছে এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বাজার-সরকারকে হাটের ফিরিস্তি বলে যাচ্ছে। আমাকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনি দুপুরে, রাত্রে কি খাবেন যদি বলেন তবে এই বেলাই হাটের সঙ্গে সেগুলো এসে যাবে।'

আমি বললুম, 'দোহাই আপনার! আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আপনি তো দেখেছেন, আমি আমার বাড়িতে একেবারে একা। দিনের পর দিন কাঁচা, পাকা—সব বাজারের ফিরিস্তি বানানোর মত একঘেয়ে মেয়েলি কাজ করতে হয় আমাকে। আমি ছুটি চাই।'

কাজে বেরবার পোশাক পরে ডাক্তার এলেন। ভালো ঘুম হয়েছে কি না শুধোলেন, সকালবেলা যে শুধু চা না খেয়ে এটা সেটা খাওয়া উচিত সেটা শোনালেন এবং তারপর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমার কপাল, তাছাড়া আর কি বলবো। এশার নমাজ যেই না শেষ হয় অমনি সুলেমান বাদশার দুই জিন্ আমার দুই চোখের পাতার উপর তাদের আড়াই'শ মণ ওজন নিয়ে হয় সওয়ার। আপ্রাণ চেষ্টা করে তখন পাঁচটি

মিনিটও জেগে থাকতে পারিনে। সকালবেলা উঠেই বুকে পাপ হিংসার উদয় হল—আপনারা দুজনাতে যে মজলিস জমালেন আমি তার হিস্সেদার হতে পারলুম না বলে।'

আমি বললুম, 'আপনি বিশ্বাস করবেন যে আমি আপনাকে বার বার মিস্ করেছি ?'

ডাক্তার বললেন, 'কোথায় না সান্ত্বনা পাবো শোকটা আমার আরো উথলে উঠছে।'

শহর্-ইয়ার সঙ্কোচের সঙ্গেই ডাক্তারকে বললেন, 'তাহলে আজ একটু বেলাবেলি বাড়ি ফিরলেই তো ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য খানিকক্ষণ সময় পাবে।'

ডাক্তার সোৎসাহে বললেন, 'ঠিক বলেছো। আজ তাহলে গাড়ি সাতটার সময়ই পাঠিয়ে দিয়ো।' আমাকে বললেন, 'গাড়ি আমাকে পৌঁছে দিয়েই ফেরত আসবে। আপনি যদি কোথাও যেতে চান তো কোনো অসুবিধে হবে না। এমন কি সাতটার সময় গাড়ি না পাঠাতে পারলেও আমার কোনো হাঙ্গামা হবে না। আমাদের দফতরে একটি হর-ফেন্-মৌলা, সকল-কাজের-কাজী চাপরাসী আছে—জিনিয়াস লোকটা। এই কলকাতা শহরের একশ' মাইল রেডিয়াসের ভিতরও যদি কুল্লে একখানা ট্যাক্সি খালি থাকে তবে সে সেটা পাবেই পাবে—যেন ব্লাড হাউণ্ডের মত সে ট্যাক্সির বদ্-বো শুঁকতে পায়।'

আমি বললুম, 'আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিই না ; আমার কোনো প্রকারের এন্‌গেজমেণ্ট নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'তাহলে তো আরো ভালো। শহর্-ইয়ার আপনাকে নিয়ে যাবে এখানে সেখানে, সর্বশেষে তার প্যারা প্যারা বইয়ের দোকানে। আর ইতিমধ্যে যদি ইচ্ছে হয়, তবে আমাদের পাঁচ-পুরুষের জমানো আরবী ফার্সী কেতাব ঘাঁটতে পারেন আমাদের লাইব্রেরিতে—একপাশে আছে, আমার কেনা কিছু

ইংরেজী আর বাঙলা বই। না, না, না। তওবা! ডাক্তারী বই এখানে থাকবে কেন?'

হঠাৎ যেন নূতন অনুপ্রেরণা পেয়ে বললেন, 'আপনার বাগচী, ভটচায, চাটুয্যে চেলাদের একদিন ডাকুন না এখানে, কলকাত্তাই মোগলাই খানা খেতে? দোস্ত আশনাদেরও? না, তাহলে বোধ হয় ঠিক জমবে না। আলাদা আলাদা করে দাওয়াৎ করলেই ভালো। কি বলেন আপনি?'

আমি নষ্টামির চোখে বললুম, 'তার চেয়ে শহ্‌র-ইয়ার তাঁর বান্ধবীদের স্মরণ করুন। তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে সেই গোলাপজলে শুকনো জানটাকে ভিজিয়ে নেব।'

ডাক্তার যেন সম্মুখে ভূত দেখতে পেয়ে বললেন, 'ওরে বাপরে! ওর মত জেলাস আর পজেসিভ রমণী আপনি ত্রিসংসারে পাবেন না বরঞ্চ আপনাকে আমাকে দুজনাকে চিরজন্মের মত যমের হাতে ছেড়ে দেবে, তবু তার বান্ধবীর হাতে এক মিনিটের তরেও ছাড়বে না—হোক না সে বান্ধবীর বয়েস নব্বুই।'

টেবিল ছেড়ে উঠে বললেন, 'তাহলে স্যর, খুদা হাফিজ টিল উই মীট এগেন।'

বউয়ের দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসি হেসে বুলেট-বেগে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে ম্লান হাসি হেসে শহ্‌র-ইয়ার বললেন, 'আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন, তিনি আজ সাতটায় ফিরবেন? সময়মত ফেরা, না-ফেরা কি ওঁর এখ্‌তেয়ারে? সেটা তো সম্পূর্ণ তাঁর কাজের নেশার হাতে। নেশা না কাটা পর্যন্ত কি মাতাল দাঁড়িয়ে উঠে চলতে পারে? আজ যদি সাত্‌টায় কাটে তো ভালো। আর যদি তার বদলে দশটায় কাটে, তবে সেটা কাটার পর, ঐ মাতালেরই মত আপনার পা ধরে মাফ চাইবেন একশ' বার, হাজার বার। আপনাকে উনি যা শ্রদ্ধা করেন তাতে আপনাকে অবহেলা করা

তাঁর স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু নেশা জিনিসটা নেশা। কাজের নেশা, ঘোড়ার নেশা, প্রেমের নেশা।'

একটু ভেবে নিয়ে দুঃখের সুরে বললেন, 'আমার যদি কোনো একটা নেশা থাকতো তাহলে 'এই জীবনের অন্ধকূপের' তলায় দিব্য মাতাল হয়ে পড়ে রইতুম।'

আমি বললুম, 'আপনি না-হক্ পেসিমিস্ট।'

'আমি পেসিমিস্ট নই। আমি ইমোশোনাল—বড্ড বেশী স্পর্শকাতর—মাত্রাধিক অনুভূতিশীল। এবং তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শত শত গানের শত শত মেশিনের ভিতর দিয়ে আমার কলিজাটাকে এস্‌পার-উস্‌পার করে কিমা কিমা বানিয়ে ছেড়েছেন। তবে এখন আর এসব কথা বলবো না। এ প্রসঙ্গের জন্য পুণ্যলগ্ন রাত্রে, গান শোনার মাঝে মাঝে। আর ঐ আমার কর্তাটি যে বললেন, আমি জেলাস, আমি পজেসিভ সেটা উনি চিন্তা না করে বলেছেন—'

আমি বললুম, 'কি বলছেন! উনি মস্করা করেছেন।'

'না, উনি চিন্তা না করেও একদম খাঁটি সত্য কথা বলেছেন। আমি খুব ভালো করেই জানি আমি জেলাস্ এবং আমার হক্, আমার সম্পদ সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন। তবে হ্যাঁ, আমি লড়নেওয়ালী নই। কেউ হামলা করলে আমি তখন আমার চোখের জলের নঙ্গ খুঁজি।'

আমি বললুম, 'খাঁটি মুসলমান বঙ্গ রমণী! কোথায় গেল মুসলমান পাঠান রমণীর দৃপ্তকণ্ঠের জঙ্গী জবাব 'না, কবুল না।'?'

গুনগুন করে গান ধরলো, 'কেন চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম না রে।' সঙ্গে সঙ্গে দিব্য লাঞ্চের টেবিল সাজানো, ব্রেকফাস্টের জিনিস সরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখা, ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরের তদারকী করা, বাঙলা কথায় পুরো গেরস্তালির কাজ করে যেতে লাগলো—গান-গাওয়াতে কোনো খিরকিচ না লাগিয়ে। বাইরে থেকে যে কেউ

সে-গাওয়া শুনে নিঃসন্দেহে ভাবতো, চোখ বন্ধ করে প্রাণমন ঢেলে -তন্ময় হয়ে কেউ গানটি গাইছে।

শেষ হলে আমি বললুম, 'আমার মতের মূল্য অনেকেই দেয়, তাই বলছি, আপনি বড় সুন্দর গাইতে পারেন। কিন্তু বাইরে, মজলিসে কোথাও গেয়েছেন বলে শুনি নি, কাগজেও দেখি নি।'

বললো, 'একই বিষয়বস্তু কেউ লেকচাররূপে সভাস্থলে প্রকাশ করে, অন্যে ঘরের ভিতর পাঁচকথার মাঝখানে বলে। আমার গান —যদি সত্যই সেটা গানের স্তরে ওঠে—দ্বিতীয় পর্যায়ের। বাড়িতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এ গান তার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। সভাস্থলে গাইলে নিশ্চয়ই আমার গান আড়ষ্ট শুষ্ক কাঠ হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে একটি গানের মাঝখান থেকে গেয়ে উঠলেন,

'সভায় তোমার ও কেহ নয়
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে এক পাশে।'

এ গানের ঘরের প্রণয়ীও নেই। নিতান্ত আমার কাজকর্মের নিরালা দিনের, নির্জন অবসরের এক পাশে পড়ে থেকে বেচারী আমাকে সঙ্গ দেয়।'

'নজরুল ইসলামের গানে শখ নেই? আর কিছু না হোক, মুসলমান হিসেবে, অন্তত যেগুলোর যোগ আমাদের ধর্মের সঙ্গে আছে?'

'আছে কিন্তু মুশকিল স্বরলিপি জোগাড় করা। আর যে-ভাবে সচরাচর গাওয়া হয় সেটা আমার পছন্দ নয়। কুক্ষণে তিনি 'বিদ্রোহী' রচেছিলেন। গাওয়াইয়ারা এখন তাঁর শান্ত লিরিকগানেও ঐ বিদ্রোহী সুর লাগান! বিলকুল বেখাপ্পা। এমন কি বিশ্বাস করবেন না, তাঁর 'ঝিঙে ফুলের' মত লক্ষে গোটেক, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের 'নাজুক' কবিতাটিও আবৃত্তি করা হয় 'মোশন' ঢুকিয়ে জোশ

লাগিয়ে ! বদখদ বরবাদ ! চলুন, আমার কাজ উপস্থিত এখানে খতম। বাজার আসুক ; তখন দোসরা কিস্তি।'

আমি বেরুতে বেরুতে বললুম, 'একটি রেওয়াজ আমি পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি। স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অন্য তৃতীয় প্রাণী যে-বাড়িতে নেই, এবং স্বামী লাঞ্চ খেতে বাড়ি আসেন না, সেখানে স্ত্রী লাঞ্চ রাঁধে না। কি খায় অবশ্য দেশভেদে খাদ্য ভেদ। জানিনে লাঞ্চের পরিবর্তে আপনি কি খান। বিশ্বাস করুন আমি সেই খেয়েই সন্তুষ্ট হব। সের্ফ আমার জন্য আসমান জমীন স্থানচ্যুত করে আগা খানের খাওয়ার মত লাঞ্চ তৈরী করতে হবে না।'

চলতে চলতে বললেন, 'আপনার লোক দিলজান শেখও বলছিল আপনি লাঞ্চের তোয়াক্কা করেন না। ডিনারও নাকি প্রায়ই মীটসেফ্ থেকে বের করে রাত দুপুরে খান। কিন্তু এ বাড়িতে আমি বে-চারা, নিরুপায়। ইসলামী অনুশাসন অনুসারে এ বাড়িতে শতাধিক বর্ষ ধরে অলঙ্ঘ্য ঐতিহ্য, প্রভু ভৃত্য খাবেন একই খানা। চাকররা সরু চাল খেতে পছন্দ করে না এই আর্জী পেশ করায় কর্তা সরু চাল ছেড়ে দিয়ে মোটা ধরেছেন ! আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওরা মোড় থেকে মাঝেমধ্যে ফুচকা নিয়ে আসে—জানেন তো কি রকম ধুলোবালির সঙ্গে মিলে মিশে সে-ফুচকার 'মাটির শরীর'। কোনো দিন যদি দৈবাৎ ওঁর চোখের সামনে পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে লম্ফ দিয়ে ঠোঙা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চিৎকার, "দে, দে আমায় দে। একা একা খাস নি। গুনাহ্ হবে।" শুনুন, মশাই, শরিয়তের অভিনব ব্যাখ্যা ! চাকরকে না দিয়ে মুনিব যদি একা একা খুশ্ খানা খায় তবে সেটা অশোভন (মকরূহ্) বলা হয়েছে, গুনা (পাপ) কি না জানিনে, কিন্তু মুনিবকে বাদ দিয়ে চাকর যদি—এবং সেটা মুনিবেরই পয়সায়—মামুলীই কিছু একটা খায় তবে নাকি সেটা চাকরের গুনাহ্ ! আবার ফুচকা খেতে খেতে গম্ভীর কণ্ঠে সদুপদেশ বিতরণ : "ছ্যাখ্, রাস্তার ফুচকা খাস্নি। জার্মটার্ম থাকে। অসুখ-

বিমুখ করে।" তারপর আবার বিড়বিড় করে বলেন, "বাড়ির ফুচকা কিন্তু অখাদ্য রদ্দি।" এই তো এখানকার হাল। অতএব আপনি খান আর না খান, আমি খাই আর না খাই, দুপুরের রান্না হবে ঠিক ঠিক। কাল সন্ধ্যায় দেখলেন না, ঘরের পর ঘর সাজানো—জনপ্রাণী নেই? এটাও ঐতিহ্য!'

আমি বললুম, 'আরেকটা কথা। আজ বিকেলে সাড়ে ছ'টায় আপনাকে নিয়ে আমার প্রয়োজন। অবশ্য আপনার যদি ঐ সময় অন্য কোনো কাজ না থাকে।'

'কি ব্যাপার? আমার তো ভয় করছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'রত্তিভর ভয়ের কারণ নেই। বঙ্গবালাদের—অবশ্য সবই হিন্দু—'লাজুক' তবিয়ত বাবদে আমি ওয়াকিফ্-হাল।'

উনি গান গাইতে গাইতে বিদায় নিলেন,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।'

দুপুরে খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে শহর্-ইয়ার বললেন, 'ক বার যে গিয়েছি আপনার বন্ধ দরজার কাছে! দোরে কান পেতে না দেখেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আপনি পড়ছেন। তাই দোরে টোকা দি নি।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ করেছেন। আমি জাগ্রত অবস্থায় কিছু-একটা না পড়ে থাকতে পারিনে। আর সর্বক্ষণ পড়ি বলে যে কোনো সময়ে যত ঘণ্টার জন্য চান আমি সে-পড়া মুলতুবি রাখতে পারি। তাই আপনি যে সময় খুশী যত ঘণ্টার তরে খুশী আমার কাছে এসে গল্প করতে পারেন, রেকর্ড বাজাতে পারেন—যা খুশী তাই। ও! অত প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন কেন? বিস্তর পড়ি বলে? হায়, হায়, হায়! জানেন, মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি যে, সে ভাবছে, আমি পড়ে পড়ে জ্ঞানসমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে

ব দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন, কসম খেয়ে বলছি, জ্ঞান যৎসামান্য
াকটু আধটু হয়তো মাঝে-সাঝে বাড়ে, আসলে কিন্তু আমি পড়ি
টা আমার নেশা, নেশা, নেশা। একেবারে নেশার মত।
াতালকে শুধোবেন, সে বলবে, প্রথম দু তিন পাত্তর তার
দহমনের জড়তা কাটে, সে সময় মনে ফুর্তিও লাগে কিন্তু তার
র যে সে খেয়ে যায় সেটা নিতান্তই মেকানিকেলি। সর্বশেষে
স নিস্তেজ হয়ে আসে, তবু খাওয়া বন্ধ করে না। তাই তো
টার নাম নেশা। যতক্ষণ মদ তাকে আনন্দ দিচ্ছে ততক্ষণ তো
সটা কাজের জিনিস—খুব বেশী গালাগাল দিতে চাইলে হয়তো
লতে পারেন বিলাসিতা—কিন্তু যখন সেটা আর আনন্দ না দিয়ে
াকে নিস্তেজ থেকে নিস্তেজতর স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায় তখন
সটা রীতিমত নিন্দনীয় নেশা। আমার পড়া ঐ ধরনের।
াপনার চোখ থেকে পষ্ট বুঝতে পারছি আপনি আমাকে বিশ্বাস
করতে পারেন নি। আরেক দিন না হয় আরো গভীরে গিয়ে
াপনাকে বোঝাবো। আপনিও যদি না বোঝেন তবে আমার
শেষ নোঙর ভাঙলো।

কিন্তু আপনার কর্তার বেলা ব্যাপারটা অন্য রকম। প্রথমত
তাঁর বয়েস কম বলে এখনো বহু বৎসর ধরে তাঁকে নানা রকম তথ্য
ও তত্ত্ব সঞ্চয় করে জ্ঞানবৈভব বাড়াতে হবে এবং দ্বিতীয়ত তারই
সাহায্যে তাঁর জীবনদর্শন—জর্মনরা বলে ভেল্টআনশাউউঙ, গড়ে
উঠবে। সব জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার আদর্শ এই জীবনদর্শন নির্মাণ
করা। কিন্তু আজ এখানেই ফুলস্টপ না, ফুলেস্ট স্টপ!'

শহর্-ইয়ার বললেন, 'আচ্ছা। এখনকার মত না হয় বিশ্বাসই
করে নিলুম।'

বললুম, 'শাবাশ! এই জন্যই তো আপনাকে এত ভালোবাসি।
তর্কাতর্কি অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেটা সময়মত, কিছু সময়ের জন্য,
লতুবী রাখার মত সহিষ্ণুতা আর বদান্যতা যেন দিলের ভিতর

থাকে। গাঁয়ের মেয়েরা অবশ্য কোঁদল মুলতুবী রাখে অন্য কারণে সংসারের কাজে ফিরে যেতে হবে বলে দুই লড়নেওয়ালী তখন জিহ্বাস্ত্র সংবরণ করে অদৃশ্য কাগজকালিতে টেম্পরারি আর্মিস্টিস সই করে ; এবং তার প্রতীক, দুজনা দুই শূন্য ধামা ধপ্ করে মাটিতে উপুড় করে কোঁদলটা 'ধামাচাপা' দিয়ে রেখে যার যার ঘরে চলে যায়। কাজকর্ম শেষ হলে উভয় পক্ষ রণাঙ্গনে ফিরে এসে ধামা দুটো তুলে নিয়ে কোঁদলকে দেয় নিষ্কৃতি। তারপর ফিন্ শুরুসে।

কিন্তু, মাদাম, বললে পেত্যয় যাবেন না, এই যে রেজালা নামক সরেস জিনিসটি খাচ্ছি, এটা যে তৈরী করেছে সে মাইকেল এঞ্জেলো—রান্নার কলাসৃষ্টিতে।'

মাদাম আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বাড়ি সব দিক দিয়ে আমার অনেক বেশী ভালো লাগে। সেখানে আমার দেহমনে এক অপূর্ব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে আসে। ঐ একটি মাত্র জায়গা যেখানে আল্লাকে শুক্‌র্ দেবার জন্য তসবী জপতে ইচ্ছে করে।'

আমি বললুম, 'হুঁঃ! দিলজান শেখের রান্না—তাও বোলপুর হাটে যা পাওয়া যায় সেই আড়াইখানা শুকনো পটোল, চিমসে উচ্ছে আর সজনের ডাঁটা, সুপিচ্ছিল কলাইয়ের ডাল, ঝিঙে-পোস্ত তদাভাবে বড়িপোস্ত দিয়ে, কুকুরের জিভের মত যে রুটিকে টেনে-টেনে খাবার টেবিলের এসপার-ওসপার করা যায় তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট তারপর শোবার জন্য শক্ত কাঠের তক্তপোশ এবং বাথরুমে কলের জল নেই। এমন কি সেই আদ্যিযুগের গ্রামোফোনটা বাজাতে গেলে দম দিতে দিতে হঠাৎ বেবাক হাতখানা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যায়। রাত্রে, হয় এমনি নিশুতি নিঝুম যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, নয় শেয়ালের কনসার্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা—নাগাড়ে।'

আবার বলি, 'হুঁঃ! রমণীর রুচি যে কত রিদকুটে, বদখৎ হতে পারে এই তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ!'

হঠাৎ মুখ তুলে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দেখি, শহ্‌র্‌-ইয়ারের দু' গাল বেয়ে জল পড়ছে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে মাফ চাইতে গিয়ে কি যে অসংলগ্ন কথা তোতলাতে তোতলাতে বলেছিলুম সেটা তখনো নিজেই বুঝতে পারি নি এবং এখন স্মরণে আনা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু আল্লার কী আপন হাতে গড়া এই মেয়ে শহ্‌র্‌-ইয়ার! আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে তার সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব কব্‌জায় এনে দু' চারটি কথা দিয়ে আমাকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে দিল। বললে, আমার রসিকতাবোধ ইদানীং বড্ড কমে গেছে—কতকগুলো আকস্মিক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যাওয়ায়। এই যা সব এখ্‌খুনি বললেন, তার সব কটি কথা সত্য, কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যা, আমার কাছে আরো মিথ্যা। যদি সত্যই হবে, তবে আমি আপনার বাড়িতে প্রতিবার আসা মাত্রই এত প্রাণভরা আনন্দে আমার দিকে এগিয়ে আসেন কেন; আপনার বুকের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে আসে না আপনার মহব্বৎ, আপনার প্যার আপনার হাঁক-ডাক, চেল্লাচেল্লিতে? কই, আপনি যে সব অনটন অসুবিধার লিস্টি দিলেন তার দুর্ভাবনায় তো ক্ষণতরেও আপনাকে ভ্রূকুঞ্চন করতে দেখি নি। মনে আছে, একদিন রুটি খারাপ ছিল বলে টোস্টগুলো মিইয়ে যায়—কই, আপনি তো একবারও আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন নি বা ব্যতিব্যস্ত হয় উঠেন নি। তবে আজ হঠাৎ এসব কেন? দেখুন সিতারা সাহেব—'

এবারে আমি বিস্ময়ের যেন বিজলি শক্ খেয়ে শুধালুম, 'আমার ডাক নামটা আপনাকে বললে কে?'

মোনালিজার মত রহস্যভরা নয়নে তাকিয়ে বললে, 'যদি বলি এটাও ঐ তর্কের মত উপস্থিত ধামাচাপা দিয়ে মুলতুবী রাখা যাক্, তবে আপনার আপত্তি আছে?'

আমি বললুম, 'হরগিজ নহী। যে কোনো একদিন বললেই হলো।'

এতক্ষণ খাচ্ছিল বলে শহ্‌র্-ইয়ার কোনো গান ধরতে পারে নি সে-কর্ম সমাধান হতেই সিতারা (তারা) তাকে টুইয়ে দিল ঐ কর্মে ফিরে যেতে। শুরু করলো,

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুবতারা
মন রে মোর পাথারে
হোস নে দিশেহারা

অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে গাইল। বুঝলুম, এটি তার বিশেষ প্রিয় গান।

আমি বললুম, 'ভুলবেন না অখণ্ড সৌভাগ্যবতী শহ্‌র্-ইয়ার, এই গানের মূল মন্ত্রটি—'শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা'। আর কাজের কথা শুনুন—অবশ্য গানের মূল মন্ত্রটি সর্ব কাজের চেয়েও মহান—আজ সাড়ে ছ'টার সময় আপনার সঙ্গে আমার র‍্যাঁদেভু—কয়েক মিনিট আগে এলেই ভালো এবং বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে আসবেন, প্লীজ। পটের বীবী সাজতে পারেন, নাও পারেন সাজবার সময়কার মুড্‌মাফিক। আচ্ছা, গাড়িটা পাওয়া যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু বলুন তো, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'এমনই সাদামাটা সর্ব রোমান্‌স্ বিবর্জিত স্থলে যে সেটা সত্যি বলার মত নয়। কাজেই সর্ব সারপ্রাইজের ভয়-ভরসা বর্জন করে দিন এই বেলাই।'

শহ্‌র্-ইয়ার

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে

গুনগুন করতে করতে চলে গেল।

সাত

হা । । জির্!' 'হা'টার উচ্চারণ আরবী কায়দায় যতদূর সম্ভব দীর্ঘ এবং জির্ টি সেই অনুপাতে হ্রস্বের চেয়েও হ্রস্ব।

আমি বললুম, 'এ কি! এ যে একেবারে রাজরাজেশ্বরীর বেশে সেজেছো?'

সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলো, '"তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ুরে কঙ্কণে কঙ্কুমে চন্দনে॥" '

পূর্বেই বলেছি, পুরোপাক্কা বঙ্গ হিন্দু-রমণীর বেশ পরলেও শহর্-ইয়ারের সঙ্গে হিন্দু রমণীর কোথায় যেন একটা পার্থক্য থেকে যায়। উঁহু! মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর বসিয়ে দিলেও সে পার্থক্য ঘোচবার নয়। এতদিন তাকে প্রতিবারেই দেখেছি সাদামাটা বেশে; আজকের এ বেশেও সেই পার্থক্য, বরঞ্চ একটু বেশী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, 'কেন? আমার কি সাজতে সাধ যায় না?'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অনেক বেশী ঘন ঘন যাওয়া উচিত। সাজসজ্জা করলে সকলেরই যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয় তা নয়। এবং কারো কারো বেলা মনে হয় এ যেন ভিন্ন, অচেনা জন। আপনার বেলা দুটোর একটাও নয়। আর সব চেয়ে বড় কথা আপনি আপনার সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে রকম সম্পূর্ণ অচেতন থেকে সেটিকে অবহেলে ধারণ করেন, আপনার সাজসজ্জা প্রসাধনও আপনি ঠিক সেই ভাবে দেহে তুলে নিয়েছেন। মনে হয়, আপনি এই বেশেই নিত্যদিনের গৃহকর্ম করেন, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনসমস্যা সমাধান করেন। যে-কথাগুলো বললুম তার সব কটি আমি শেষ-বিচারের দিনের সৃষ্টিকর্তার সামনে, ডাক পড়া মাত্র, আপনারি মত হা । । জির বলে

কসম খেয়ে বলতে রাজি আছি—অবশ্য যদি এই বেলা এই বে আপনি আপনার একটি ছবি তুলিয়ে দেন—কারণ 'তসবিরে জান' সে সময় 'দর্-বগল' না হলে চলবে না।'

'সে আবার কি? মনে হচ্ছে ফার্সী। বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'সমূহ মুশকিলে আমাকে ফাঁসালেন। দোহা শুনেছি গুরুর কাছে—ওস্তাদ বললুম না, কারণ তিনি ছিলেন কন্নৌজে কট্টর গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং জানতেন উৎকৃষ্টতম ফার্সী—আমার বয়ে যখন তেরো চোদ্দো। তারপর এটি আমি অন্য কারো মুখে শুনি নি ছাপাতেও দেখি নি। কাজেই আমার পাঠে ছন্দপতন ও যাবতী গলদ থাকার প্রভূত সম্ভাবনা। অর্থ হচ্ছে এই, শেষ বিচারের দি (দর্ কিয়ামৎ) প্রত্যেককেই (হর্ কস্) সে সমস্ত জীবন ধরে যা পাপ কর্ম, পুণ্য কর্ম করেছে এবং করে নি তারই একটি পুরো রিপো (আমল-নামা বা শুধু নামা বা নাম) আপন আপন হাতে ধ (দস্ত্ গীরদ্) দাঁড়াবে। আমিও নিজে (মন্ নীজ) হাজির হ (হাজির মীশওম) বগলদাবায় (দর্ বগল্) প্রিয়ার তসবির (তসবিরে জানাঁ) নিয়ে।

'অর্থাৎ ঐ লোকটি সেই শেষ বিচারের সর্বমান্য পাক-পবি বিচারপতিকে বলবে, 'অন্যেরা আপন আপন কৃতকর্মের পুরো বয়ানে 'আমল-নামা' নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু হুজুর, আমার কোনে আমল-নামা নেই। তার কারণও সাতিশয় সরল। আমি সমা জীবন ধরে আর-কিছু করি নি—জীবনভর শুধু আমার প্রিয়ার ছাব এঁকেছি আর দেখেছি, দেখেছি আর এঁকেছি। সেইটিই আমা কৃতকর্মের 'আমল-নামা'। এই নিন্, হুজুর, দেখে নিন!' তা বলছিলুম, অষ্ট-অলঙ্কার-পরা আপনার এখনকার একটি ছবি আমা দিন। নইলে শেষ-বিচারের আদালতে জেরার চোটে আমার জেরবা হয়ে যাবে—একসিবিট নাম্বার ওয়ান এণ্ড লাস্ট না থাকলে।'

শহ্র্-ইয়ার বললেন, 'আমার অল্প বয়সে আমাদের বাড়িতে

য়ই মৌলবী-মৌলানারা আসতেন। তখন এরকম কল্পনাতীত, ম্ভব অসম্ভব প্রেমের দোহা অনেকগুলো শুনেছি। এ সবেতে তিশয়োক্তি নিশ্চয়ই, তবু কেমন যেন মনে হয়, ঐ যুগে ওরা বোধহয় মাদের তুলনায় প্রেমের মূল্য দিত ঢের ঢের বেশী। আচ্ছা, সে ব্ব বাদ দিয়ে আপনার বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ দিই; পনি-আমার ছবি আঁকুন!'

আমি ভীত রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, 'আর হঠাৎ যদি 'শব্‌নম্' এসে ড় ছবিটা দেখে? ও তো আসবে অতি অবশ্যই। ও যাবার য় যখন বলে গিয়েছিল সে ফিরে আসছে তখন সে আসবে নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

তাচ্ছিল্যভরে শহ্‌র্-ইয়ার বললে, 'এখন এলে আপনি তাকে নতেই পারবেন না।'

রীতিমত তাজ্জব বনে বললুম, 'আপনার মুখে এই কথা! পনার অনুভূতির কলিজাটা না রবিঠাকুরের কিমা-মেশিনে তুলো-জা হয়ে গিয়েছে! শব্‌নমের অনন্ত তারুণ্য তো কখনো পরিবর্তিত ত পারে না—তাকে তো আমি গড়েছি আমার জিগর কলিজার ন্দু বিন্দু খুন্ দিয়ে এবং সে নির্মাণ বহু শত যোজন পেরিয়ে এখনো র্ণাদ্যমে অগ্রগামী। আচ্ছা, এ যুক্তিটা না হয় বাদই দিন। ধরুন, কশ' বছর পরে নিতান্ত দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ, কিংবা কোনো ছোকরা াইব্রেরি-এসিসটেন্ট 'শব্‌নম্' সম্বন্ধে লিখিত আমার আর পাঁচখানা ণ্য পুস্তকের মত এই পুস্তকখানি পড়লো, নিতান্ত অনিচ্ছায়, দ্ধমাত্র বইটা ক্যাটালগের কোন্ কোঠে পড়বে সেইটে ঠাহর করার ন্য। একশ' বছর পরে পড়ছে বলে কি আপনার ধারণা শব্‌নম্ খন একশ' বছর বয়সের জরাজীর্ণা বৃদ্ধা হয়ে সে ছোকরার সামনে াবির্ভূত হবে?'

রসভঙ্গ করে ড্রাইভার বিনয়নম্র কণ্ঠে শুধলো, 'সর্‌কার্, যাবো াথায়?'

'সাহেব যেখানে কাজ করেন।'

ককিয়ে উঠে শহ্‌র-ইয়ার বললে, 'ঐ রসকসহীন জায়গায় যাবার জন্য আমি এই বেশভূষা সর্বাঙ্গে চড়ালুম! হা আমার কপাল! এ কপাল কি আর কখনো বদলাবে না? আপনার সঙ্গ পেয়েও না? আরেকটু হলে কেঁদে ফেলতো আর কি!

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, 'আপনি আমাদের ইসলামের কিছুই জানেন না। তাহলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন একটি হদীস জ্ঞানসঞ্চয় এবং পুণ্যলাভ দুইই হবে। অবশ্য আমি ঘটনাটি শব্দে শব্দে টায় টায় বলতে পারবো না, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনে যে কোনো প্রকারে উনিশ-বিশ হবে তার জিম্মাদারী আমি নিচ্ছি—যদিও আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ (ওয়াল্লাহু আ'লম্!)।'

একদা এক অভিযানান্তে আল্লার পয়গম্বর যখন তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ তাঁদের বাসভূমি মদীনা শহরে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, দলের এক আরব যুবা বড় অসহিষ্ণুভাবে তার উটকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সকলের আগে আগে যাবার চেষ্টা করছে। আরবরা বড়ই সাম্যবাদী—এরকম অবস্থায় দলের মুরুব্বিরাই যে দলের পুরোভাগে থাকবেন এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তৎসত্ত্বেও ঐ যুবাটির অসহিষ্ণুতা হজরতের চোখে পড়ল। তিনি তাঁর পাশের উট-সওয়ারকে শুধোলেন, "ব্যাপার কি? লোকটার অত তাড়া কিসের?" সে বললে, "হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ! এ-যুবা অতি সম্প্রতি বিবাহ করেছে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে চায়।" হজরৎ বললেন, "আচ্ছা, ওকে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে এসো তো।" হজরতের আহ্বান শুনে যুবা শ্লাঘা অনুভব করে তাঁর কাছে এল। হজরৎ বললেন, "বৎস, শোনো। তুমি যদি সকলের পয়লা পয়লা উট চালিয়ে সকলের পয়লা আপন বাড়িতে পৌঁছে যাও তবে খুব সম্ভব দেখতে পাবে তোমার নববিবাহিতা বধূ এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতো না বলে বিরহিণী হয়তো তার আটপৌরে

অতিশয় মামুলী বেশভূষা অযত্নে অবহেলায় পরিধান করে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। সে দৃশ্য তোমার মনঃপূত নাও হতে পারে, তুমি পুলকিত নাও হতে পারো। পক্ষান্তরে তুমি যদি দলের সকলের পিছনে থাকো তবে যে-মুহূর্তে মদিনাবাসী দলের পুরোভাগ দেখতে পাবে তন্মুহূর্তেই শহরের সর্বত্র আনন্দ-দামামা বেজে উঠবে, এবং যেহেতু তুমি দলের সর্বপশ্চাতে আছ তাই বাড়ি পৌঁছতে তোমার সময় লাগবে বেশী—ইতিমধ্যে তোমার বধূ সেই অবসরে উত্তম প্রসাধন করে, উৎকৃষ্ট বেশভূষা ধারণ করে তোমাকে প্রসন্ন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রফুল্ল বদনে তোমার জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ পাবে।" তাই বলি, শহর্-ইয়ার, আপনার সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার, আপনার মধুরতম মৃদুহাস্য কার জন্য? অপরিচিতজনের জন্য, পথগামী জনতার জন্য?—সেখানেও মনে রাখবেন রাস্তাঘাটে স্বেচ্ছায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অলঙ্কার প্রদর্শন ইসলামে নিন্দনীয়। অতএব আপনার বেশভূষা নিশ্চয়ই অপরিচিতজনের জন্যে নয়। আপনি যখনই স্বামীর কাছে যাবেন তখন আপনার বেশভূষা হবে রাজরাণীর মত, তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন যেন তিনিও আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ, এবং তিনিও যখন আপনার কাছে আসবেন তখন আসবেন সম্রাটের বেশে এবং আপনার সঙ্গে কথা বলবেন যেন আপনি রাজরাজেশ্বরী।

হঠাৎ গলা নামিয়ে ঘরোয়া সুরে বললুম, 'জানেন, শহর্-ইয়ার, তাই আমার তাজ্জব লাগে যখন দেখি আমাদের মেয়েরা—কি হিন্দু কি মুসলমান—বাড়িতে ট্যানা পরে মেলছের মত স্বামীর চোখের সামনে আনাগোনা করছে, আর যত পাউডার যত অলঙ্কার বাড়ি থেকে বেরবার সময়, যেন ঐ হতভাগা স্বামীটাই এসেছে বানের জলে ভেসে।'

শহর্-ইয়ার চিন্তিত হয়ে শুধোলেন, 'আমি কি বাড়িতে সত্যি মেলছের মত থাকি।'

আমি হেসে বললুম, 'আদপেই না। আপনি জেনে-না-জেনে সৌন্দর্যের এতই কদর দেন যে আপনার পক্ষে অসুন্দর বেশ পরা অসম্ভব, অসুন্দর আচরণ অসম্ভব, অসুন্দর—'

'ব্যস্, ব্যস্, হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে সাজতে গুজতে কি রকম যেন শরম শরম লাগে। লোকে কি ভাববে?'

আমি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'আমার যত রাগ তো ঠিক ঐখানেই। 'লোক' বলতে আপনি কাদের মীন করছেন? চাকর-বাকর এবং যে দু'একটা উটকো লোক যারা বিন্-নোটিশে কাজে-অকাজে বাড়িতে আসে। আমার প্রশ্ন, আপনি তাদের বিয়ে করেছেন, না ডাক্তারকে? তারা কি ভাবলো, আপোসে কি বলাবলি করলো তাতে কি যায় আসে? আচ্ছা, এখন তবে এ আলোচনা আজ থাক। আমরা মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। আপনি ড্রাইভারকে বলুন না, সে যেন ডাক্তারকে গিয়ে বলে আমি গাড়িতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি।' ড্রাইভার চলে গেলে বললুম, 'এইবারে দেখি, আমার সোনার চাঁদটি কি করেন। শহর্-ইয়ার, আমিও একদা রিসার্চ করেছি এবং কেউ এসে এভাবে উৎপাত করলে বড্ডই বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু আমার আপন অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সেটা পাঁচ সাত মিনিটের ভিতরই অন্তর্ধান করে। বিশেষ করে যারা ডিস্টার্ব করলো তারা যদি তার আপন জন হয়—যাদের সঙ্গলাভে সে আনন্দ পায়। দু' পাঁচ মিনিট তাদের সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই রিসার্চের ভানুমতী কেটে যায়।'

জোর পাঁচ মিনিট, দেখি ডাক্তার টাট্টুঘোড়ার মত ছুটে আসছেন। শহর্-ইয়ারকে দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের ভিতরকার কী এক উত্তেজনা সব-কিছু ছাপিয়ে যেন উপচে পড়ছে। মেশিনগানের চাইতেও দ্রুততর বেগে আমাকে বলে যেতে লাগলেন, 'ওঃ! আমার কিস্মৎটা আজ সত্যই বড় ভালো, বড়ই ভালো। এই দশ মিনিট আগে আমি আপনাদের ফোন করে

পেলুম না। মহা বিপদে পড়লুম, করি কি? হয়েছে কি জানেন, আমার এক ভেরি ডিয়ার ফ্রেণ্ড বউকে নিয়ে দিল্লী থেকে এসেছে। কাল ভোরের প্লেনে ফের দিল্লী চলে যাবে। আপনাকে সে চেনে, দিল্লীতে আপনার লেক্‌চার শুনেছে, দু'একবার আপনার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তাও বলেছে। আপনার গ্রেট এড্‌মায়ারার। আর তার বউ যখন এসেছে তখন শহর্‌-ইয়ারকে নিয়ে যেতে হয়, নইলে বড় অভদ্রতা হয়। দিল্লীর খানদানী ঘরের ছেলে—ভাববে কলকাত্তার লোক তমীজ তহজীব কিছুই জানে না। আপনারা এসে আমায় বাঁচালেন। চলুন, চলুন, আর দেরি না। আমি ওকে কথা দিয়েছি আপনাদের নিয়ে গ্রেট ঈস্টার্নে সাতটা সাড়ে সাতটার ভিতর পৌঁছব। আঃ! বাঁচলুম, আল্লার কী মেহেরবানী!'

আমি বললুম, 'এত নমাজ রোজা করার পর আল্লা আপনাকে মেহেরবানী দেখাবে না তো দেখাবে কাকে?' ওদিকে গাড়ির ভিতরকার আলো-অন্ধকারে না দেখেও যেন গাঢ় অন্ধকারেই বিদ্যুল্লেখার মত উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে দেখলুম, শহর্‌-ইয়ারের গ্রেট ঈস্টার্নে যাবার উৎসাহ ফ্রীজিং পয়েণ্টেরও নিচে; আমারও তদ্বৎ। কিন্তু উপায় কি? ডাক্তারের বাব্‌লিং সফেন উত্তেজনা, তার অবিমিশ্র আনন্দ বরবাদ করতে পারে নিতান্ত পাষণ্ড জন। তদুপরি বেচারী ডাক্তার তো বারো মাস শুধু লেবরেটরি আর বাড়ি, এরই ভিতর মাকু চালায়। করুক না বেচারী একটুখানি ফুর্তি! আমরা দু'জনা না হয় সারেঙ্গী তবলার সঙ্গতই দেব।

হোটেলের সব ক'জন রেসেপসনিস্ট ওরকম লম্ফ দিয়ে উঠে ডাক্তারকে অতখানি সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা জানায় কেন—ডাক্তার তো এখানে আসে অতিশয় কালেভদ্রে? লিফটের দিকে যেতে যেতে অনুমান করলুম, ডাক্তারের বাপ ঠাকুর্দা এঁরা কলকাতার প্রাচীন খানদানী বিত্তশালী লোক; এ হোটেলে আসুন আর নাই আসুন, এরকম একটা হোটেল নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে এঁদের আনুকূল্য পেয়েছে।

শহর্-ইয়ার ও আমি দুজনাই চুপ। ডাক্তার কিন্তু সেটা আদৌ লক্ষ্য করে নি। এমনিতে মুখচোরা, লাজুক—এখন,—এখন কেন, যবে থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা সেই থেকে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। অনুমান করলুম, দিল্লী-আগত জনের সঙ্গে একদা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব তার সুগভীর ছিল। নইলে এত উৎসাহ, এত উত্তেজনা!

ভালো, বড় ঘরই পেয়েছেন দিল্লীর মেহমানদ্বয়।

ভদ্রলোকের পরনে অতি দামী কাপড়ের অত্যুত্তম দর্জির হাতে বানানো সুট। শার্ট, টাই একটু যেন বেশী আত্মপ্রকাশ করছে। সুপুরুষ না হলেও ভদ্র চেহারা। আর অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার আরামের ব্যবস্থা করাতে দিল্লীর লোক পাকা, এটিকেট-দুরুস্ত।

ম্যাডামটি কিন্তু কনট সার্কলের খাঁটি চক্রবর্তিনীদের একজন। সর্বপ্রথমই চোখে পড়ে এঁর ব্লাউজটি। সেটির নাম ব্লাউজ দেব, না কাঁচুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলে উল্লেখ করবো? এই পেট-কাটা ব্লাউজ যে তাঁর শরীরের উত্তমার্ধ আচ্ছাদিত করার জন্য নির্মিত হয় নি সেটা দেখামাত্রই বোঝা যায়। সেটা যেন সে চিৎকার করে প্রচার করছে। আমরা ঘরে ঢোকার সময় তিনি তাঁর শাড়ির ক্ষুদ্রতম অঞ্চলাংশ একবারের তরে তার কাঁধে আলতোভাবে রেখেছিলেন। আমরা ভালো করে আসন নেবার পূর্বেই সেটি স্থানচ্যুত হয়ে উরুতে স্তূপীকৃত হলো। এর পর সেটি আর প্রমোটেড হয় নি। আমি ভাবলুম, শাড়ি ছেড়ে ইনি রাজপুতানীদের মত ঘাগরা পরলে তো অনেকখানি কাপড়ের সাশ্রয় হয়। কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে দেখতে হয় তাঁর মেক আপ। এরকম চুলের ঢপ আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি—খুব সম্ভব প্যারিসের ফ্যাশান পত্রিকা দেখে দেখে হেয়ার ড্রেসার তাঁর মাথার উপরকার ঐ তাজমহলটি নির্মাণ করেছে। ঠোঁটে যে রঙ মেখেছেন সেটা লাল তো নিশ্চয়ই নয়, হয়তো ব্রোন্জ বলা যেতে পারে। নখের রঙ অলিভ গ্রীন। কিন্তু সংস্কৃত কবিকুলের মত আমি যদি তাঁর দেহ এবং প্রসাধন এস্থলে দফে দফে বর্ণাতে যাই তবে

সর্বপ্রথমই আমাকে বৎসরাধিক কাল তাঁর প্রসাধন নির্মাণে যে-সব গূঢ় রহস্যাবৃত রসায়নাদি সাহায্য করেছে তাদের নিয়ে একাগ্রমনে গবেষণা করতে হবে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকগণ অবহেলে থার্মোমিটার দিয়ে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের টেম্পারেচার অর্জুনকে দিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু এযুগের বর্ণনাতে আমি ব্রা'র নম্বর নিয়ে গুবলেট করলে কেউ তো আমায় ছেড়ে কথা কইবে না।

হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় একবার সামান্য একটু মোকা পেয়ে শহর্-ইয়ার ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল, 'আপনার জন্যই আজ আমার এই লাঞ্ছনা। এরা ভাববে আমি মাড়োয়ারিদের মত আমার গয়নার দেমাক করতে এসেছি।' আমি বললুম 'কিন্তু ডাক্তার তো আপনার এই এ্যাকসিডেন্টাল গয়না পরা দেখে খুশী হয়েছেন। তাঁর বন্ধুর কাছে বউকে তো আর বিধবার বেশে নিয়ে যেতে পারেন না।'

আমরা কেউই ড্রিঙ্ক করি না শুনে মহফিলের পয়লা রাগিণীটিই সামান্য কম্-সুরা হয়ে শুরু হলো। দিল্লী নগরীর মনসুর মুহম্মদ সাহেব বিড়বিড় করে যা বললেন তার মোটামুটি অর্থ, বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলে তেরো'শ বছরের প্রাচীন বিধি-বিধান একটু-আধটু, এদিক-ওদিক উনিশ-বিশ করতে হয়। বেগম মনসুর এক ঢোঁক শেরি গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ডাক্তার তেরো'শ বছরের পুর্না কায়দায় এখনো নমাজ পড়েন, উপোস করেন; তবু তিনি কোনো আপত্তি জানালেন না। ওদিকে এ বাবদে উদাসীন শহর্-ইয়ারের মুখ দেখি লাল হয়ে উঠেছে।

তারপর বিশেষ কোনো সূত্র ধরে বাক্যালাপ এগলো না। আমরা যাকে বলি আশকথা পাশকথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে মালুম হলো, মনসুর সাহেব একদা এই কলকাতার কারমাইকেল হস্টেলে বাসা বেঁধে বছর দুত্তিন পড়াশুনো করেছিলেন এবং সে সময়ে ডাক্তারের সঙ্গে দোস্তী হয়। আমার তাই মনে হচ্ছিল,

শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা হতো যদি তুই ইয়ারে 'দোকলা-দোকলি' বসে হুহুঁ হুহুঁ কুহু কুহু করতেন—শহ্‌র্‌-ইয়ার আর আমার তো কথাই নেই, মাদাম মনসূর পর্যন্ত হ্য ত্র—ওয়ান টু মেনি। অর্থাৎ সাকুল্যে থ্রী টু মেনি।

মনসূর এবং তাঁর বীবী মাঝে মধ্যে যে দু'একটি ইংরিজি কথা কইলেন সেগুলো শুদ্ধ এবং ভাল উচ্চারণে, অথচ কেন যে তাঁরা অধিকাংশ সময়ই উর্দু চালিয়ে যেতে লাগলেন সেটা বুঝতে পারলুম না। ওঁরা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ডাক্তারের যা উর্দু জ্ঞান সেটা দিয়ে বহুৎ ব-তকলীফ্‌ ব-মুশকিল কাজ চালানো যায় কি না যায় সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, আমার ভাঙা-চোরা উর্দু আমি সভাস্থলে পেশ না করে, যে কটি বাক্য বলেছি সে সবই ইংরিজিতে এবং শহ্‌র্‌-ইয়ার যে উর্দুর প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে এ পর্যন্ত তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলুম তার সঙ্গে বোলপুর থেকে কলকাতা এক সঙ্গে আসার সময়। কি মুটে, কি চা-ওলা, কি রেস্তোরাঁবয় কারো সঙ্গে সে ভুলেও বিশুদ্ধ বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার সাহায্য নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এ স্থলেও সে ব্যত্যয় করে নি, তবে বাঙলা না বলে বলেছে ইংরিজি—অবশ্য মুখ খুলেছে সামান্য দু'একবার মাত্র। এসব দেখে শুনেও দেবা দেবী দু'জনা যে উর্দু কপচাচ্ছিলেন তার থেকে যে কোনো লোকের মনে সন্দেহ জাগা নিতান্ত খাম-খেয়ালী নয় যে, এঁরা যেন একান্তই 'উর্দু আন্‌জুমনের' মিশনারিরূপে এই 'বর্বর' বাঙলাদেশে 'বিসুর্দ্ধ' উর্দু ফয়লাতে এসেছেন!

এ-অভিজ্ঞতা আমার একাধিকবার ইতিপূর্বেও হয়েছে। উত্তর-প্রদেশে তথা দিল্লীবাসিন্দা কলকাতার মুসলমানদের মাঝখানে বসে উর্দু তড়পাবার সময় ভাবখানা করেন যে ওনারাই একমাত্র 'খানদানী মনিষ্যি', খাস বেহেশ্‌তে জিব্রাইল গয়রহ দেবদূতরা উর্দুতেই বাৎ-চিৎ করেন—অবশ্য তাঁরা সকলেই বাল্যকালে মনুষ্যরূপ ধারণ করে

নির্দেন বছর দশ দিল্লী-লক্ষ্ণৌয়ে উর্দুটা রপ্ত করে যান। উত্তরপ্রদেশ দিল্লীর উর্দুওলাদের এই হম্-বড়াইর জন্য অবশ্য বেশ-কিছুটা দায়ী কলকাতার মুসলমানই। সে-বেচারী হিন্দু-প্রধান কলকাতায়—যেখানে উর্দুসহ আগত মুসলমান কক্ষে পায় না—তার জাতভাইকে যতখানি পারে সৌজন্য দেখাতে চায় এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার মনের কোণে আছে উর্দুর প্রতি একটা সপ্রশংস মোহ। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য নিশ্চয়ই এ নয় যে, সে তার মাইকেল-রবি-কাজী নিয়ে গর্ব অনুভব করে না। সে-রকম কোনো বাগবিতণ্ডা উপস্থিত হলে সে ওঁদের জন্য জোর লড়াই দেয়। তবে লক্ষ্য করেছি, উর্দুওলারা এ রকম তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চায় না ; তাঁদের ভিতর যাঁরা চালাক তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, বরঞ্চ কলকাত্তাই মুসলমান কিছু কিছু গালিব ইক্‌বাল পড়েছে, এঁরা টেগোরের নাম শুনেছেন—বাদবাকি ব্লাঙ্কো।

দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারের বন্ধু তাঁর উদুর ঝাণ্ডা ব্যোমলোকের এমনই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে হয়েস্ট করতে লাগলেন যে, আমার তো ভয় হলো ওটা না এভারেস্টের চূড়ো ছাড়িয়ে বেহেশ্‌তের 'লস্ট এণ্ড ফাউণ্ড' দফতরে গিয়ে পৌঁছয়! ডাক্তার নিরীহ মানুষ—হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। শহর্-ইয়ারের মুখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম না। আর আমি যে অনারোগ্য, গোরস্তানগমনোৎসাহী কঠিন ব্যাধিতে কাতর তারই নিষ্পেষণে 'নিশ্চুপ'—সে ব্যামোর নাম 'সুপেরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌স্।' আমি আমার মাতৃভাষা নিয়ে এমনই শশব্যস্ত যে অন্যভাষা তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কি না সে চিন্তা আমার পুরু নিরেট খুলিটা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকতে পারে না।

কথায় কথায় মনসুর সাহেব বললেন, উর্দুর প্রচার ও প্রসারের জন্য কলকাতা মাদ্রাসায় ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তাবৎ কলকাতার মুসলমান ছেলেমেয়ে সেখানে গিয়ে উর্দু শিখতে পারে।

আশ্চর্য! এতক্ষণ যে শহ্‌র্-ইয়ার বিলকুল চুপসে বসে আড়াই ফোঁটা নিম্বু-পানি চোষাতে সর্বচৈতন্য নিয়োজিত করে সময় কাটাচ্ছিল সে হঠাৎ বলে বসলো, 'কলকাতা মাদ্রাসা ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের চর্চা করে; কুরান, হদীস, ফিকাহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। সেগুলো এ টু জেড আরবীতে। তাই সেখানে আরবী ভাষা শেখানো হয় এবং নিতান্তই যখন সাহিত্য ব্যতিরেকে ভাষা শেখানো যায় না তাই কিছুটা আরবী সাহিত্যও শেখায়। ফার্সী শেখায় অতিশয় নগণ্য পরিমাণে এবং গভীর অনিচ্ছায়—তার কারণ ফার্সী সাতশ' বছর ধরে এদেশের রাষ্ট্রভাষা ও বিদগ্ধ জনের ভাষা ছিল বলে সেটা চট করে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যে সব কাচ্চাবাচ্চাদের মাতৃভাষা উর্দু, তাদের হয়তো যৎসামান্য উর্দুও শেখায়। কিন্তু মাদ্রাসার একমাত্র ও সর্বপ্রধান কর্ম হচ্ছে ইসলামশাস্ত্র চর্চা, ইসলামিক থিয়োলজি। সে হঠাৎ 'ব্যাপকভাবে'—এবং নিতান্ত মিনিমাম প্রয়োজনের বাড়া যে কোনো ভাবে উর্দু পড়াবার ব্যবস্থা করবে কেন?'

বিস্ময়ে আমি হতচৈতন্য! ঠাকুর্দার নাম স্মরণ করতে পারছিনে!

কিন্তু মোক্ষম তাজ্জব মেনেছেন 'মৌলানা' মনসূর।

বাজারে যতখানি গাম্ভীর্য সেদিন বেচা হচ্ছিল তার সাকুল্যে স্টক্ কিনে, সর্ব মুখে মেখে বললেন, 'উর্দুভাষা ও সাহিত্য এদেশে ইসলামের প্রতিভূ!'

শহ্‌র্-ইয়ার বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'তাই নাকি? তা হলে বিবেচনা করি, প্রত্যেক মুসলিমের যেটা প্রথম কর্তব্য—অর্থাৎ ইসলাম-ধর্ম-তত্ত্ব-শিক্ষা সে সম্বন্ধে কি উর্দুতে ভূরি ভূরি কেতাবপত্র রয়েছে? কিন্তু আমি তো শুনেছি—অবশ্য আমার সংবাদদাতা ভুল করে থাকতে পারেন—আপনারা কুরান শরীফের উর্দু অনুবাদ ছাপিয়েছেন মাত্র পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে। তারও ত্রিশ বৎসর পূর্বে হিন্দু গিরীশবাবু বাঙলাতে কুরান অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই মনসূর বললেন, 'আরবীর সঙ্গে উর্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।'

আমি জানি শহ্‌র্-ইয়ার আগের পয়েন্টে আরো অনেক-কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন 'ভিন্ন রণাঙ্গনে' চলে গেলেন তখন শহ্‌র্-ইয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। বললেন, 'সে আবার কি করে হলো? আরবীভাষা হিব্রুর মত সেমেটিক; উর্দু ভাষা বাঙলারই মত আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা। সম্বন্ধটা নিবিড়তর হলো কি করে?'

মনসূরের মুখ ক্রমেই লাল হতে আরো লাল হচ্ছে। ডাক্তার নীরব, কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ। মাদাম মনসূর পানপ্রসাদাৎ ইতিমধ্যেই ঈষৎ বে-এখতেয়ার। আমি চুপ। কারণ শহ্‌র্-ইয়ার তার তলওয়ার চালাচ্ছে পাকা ওস্তাদের মত। তার মুখে রক্তিভর উত্তেজনা নেই।

মনসূর বললেন, 'উর্দু তার শব্দসম্পদ আহরণ করে আরবী থেকে।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'So what? উর্দু কেন, বাঙলার তুলনায়ও ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের ভাষা নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণ আরবী শব্দ এবং ওগুলো যে আরবীর মত সেমেটিক গোষ্ঠীর ভাষা নয় সেও তো জানা কথা। কিন্তু ইন্দোনেশিয়োরা যে রকম ইসলামী ঝাণ্ডা খাড়া করেছে, পেরেছে সে-রকম এদেশের উর্দুওলারা? আমি তো শুনতে পাই, দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদের স্কুলে স্কুলে উর্দু সরিয়ে হিন্দী শেখানো হচ্ছে। উর্দুওলারা কী লড়াই দিচ্ছেন তার বিরুদ্ধে? 'আকাশবাণী' স্বরাজের পর থেকে আর উর্দুতে নিউজ বুলেটিন দেয় না, শুনছি শিগগীরই দেবে। তবে সেটা পণ্ডিতজীর চাপে। আপনাদের আন্দোলনের ফলে নয়।'

মনসূর ফেটে যাওয়ার উপক্রম। বললেন, 'আমরা পাকিস্তান নির্মাণ করেছি!'

এই প্রথম শহ্‌র্-ইয়ারের কণ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গের পরশ লাগলো।

বললো, 'তাই নাকি? আমি তো শুনেছি বাঙলার মুসলমান-যাদের অধিকাংশ এখন পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে, এবং সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী তাদেরই ক্রেডিট বেশী। তা উর্দু যদি এতই ইসলামী ভাষা হবে তবে পূর্ব পাকিস্তানীরা উর্দুকে তাদের অঞ্চলে রাষ্ট্রভাষা করছে না কেন? শুনেছি তাদের মাতৃভাষা বাঙলার জন্য লড়তে গিয়ে কেউ কেউ প্রাণ দেওয়াতে 'শহীদ'রূপে আজও পরিচিত হচ্ছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানেই বা উর্দু কোথায়? সিন্ধীরা বলে সিন্ধী ভাষা, বেলুচরা বেলুচী, পাঠানরা পশতু —রইল বাকি পাঞ্জাব। তারা তো বলে পাঞ্জাবী, শেখে উর্দু। কিন্তু ইতিমধ্যেই তো সেখানে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে, পাঞ্জাবী কথ্যভাষা, শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম করার জন্য সেটাকে লিখিতরূপ দিয়ে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার ইজ্জৎ দেওয়া। এ-জাতীয় সম্মান পাঞ্জাবী কথ্য ভাষা তো আগেও পেয়েছে। গুরু নানকের 'গ্রন্থসাহেব' তো পাঞ্জাবী কথ্য ভাষায় রচিত। কিন্তু এসব বিবরণ থাক্—আমি পশ্চিম পাকিস্তান সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল নই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার একটি শেষ নিবেদন আছে। আপনি বলছেন, আপনারা, অর্থাৎ উর্দুভাষীরা পাকিস্তান নির্মাণ করেছেন। উত্তম প্রস্তাব। আজকের দিনের পাকিস্তানীরা যে কায়েদ-ই-আজাম মরহুম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবকে তাদের 'জাতির পিতা' বলে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়, তাঁর মাতৃভাষা কি উর্দু ছিল?'

মনসুর চুপ করে রইলেন। তর্ক যে আরও চালাতে পারতেন না তা নয়। কারণ যুক্তির অভাবই যদি তর্কের সমাপ্তি ঘটাবার কারণ হতো, তবে পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বুই ভাগ এই মুহূর্তেই মুখ বন্ধ করে গোরের নীরবতার আশ্রয় নিত।

ডাক্তার কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মনসুর বললেন, 'বাঙলা হিন্দু ভাষা—তার প্রভাব বাঙালী মুসলমানকে হিন্দু মনোবৃত্তিদাস করে দেয়।'

'দাস' কথাটা বোধ হয় শহ্‌র্-ইয়ারকে বলদের সামনে লাল পতাকা দেখানোর মত হলো। স্পষ্ট দেখলুম, তার মুখে সামান্যতম কাঠিন্য দেখা গেল। তার পরিমাণ এতই সামান্য যে শুধু আমিই সেটা লক্ষ্য করলুম। কারণ এতদিন ধরে তার নয়নে বদনে বহু ভাবের খেলা আমি দেখেছি। বেশীর ভাগ সময় তার মুখ শান্ত। ভদ্র পরিবারের বধূর মত কিন্তু সামান্যতম রসের সন্ধান পেলেই মুচকি হাসে কিংবা খলখলিয়ে। বিষণ্ণ, চিন্তিত, বিহ্বল আরো বহু ভাবের খেলা তার চোখে মুখে আমি দেখেছি, কিন্তু ঐ ভদ্র বধূর শান্তিমাখা মুখ ছাড়া সব চেয়ে বেশী দেখেছি তার রহস্য-ভরা আঁখি। কঠিনতা কখনো দেখি নি।

বললে, 'বাঙলার শ্রেষ্ঠ ধর্মসঙ্গীত টেগোরের। সেগুলোতে হনুমানজী, রামচন্দ্রজী কেউই নেই। আছেন যিনি, তিনি সূফীদের অল্-হক্, অল্-জীমল—ট্রুথ এণ্ড বিউটি। আপনি যখন এদেশে বাঙালী হস্টেলে বাঙালী-মুসলমানদের ভিতর তিন বছর বাস করে বিস্তর বাঙলা শুনেছেন, তখন আশা করতে পারি এসব টেগোর-সং-এর কিছু কিছু সে যুগে আপনার কানে পৌঁচেছিল এবং তার কিঞ্চিৎ রস গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন—বাঙালী বন্ধুবান্ধবদের শুধিয়ে অন্তত মোটামুটি অর্থটা জেনে নিয়েছিলেন।'

যেন গৌরীশঙ্করের চূড়ো থেকে গুরুগম্ভীর ঐশী বাণী নেমে এল :

'না, বাঙলা শেখার কোনো জরূরৎ আমার ছিল না।'

শহ্‌র্-ইয়ার হঠাৎ কি রকম যেন বদলে গিয়ে একেবারে ভিন্ন কণ্ঠে বললে, 'সে তো ঠিকই করেছেন। এদেশে কত ইংরেজ বক্‌স্‌ওলা দশ বিশ বছর কাটিয়ে যায়, এক বর্ণ বাঙলা না শিখে। আপনারই বা কী জরূরৎ।'

'বক্‌স্‌ওলা' কথাটা আমি স্বরাজলাভের পর আদৌ শুনি নি। ইংরেজ চাকুরে সিভিলিয়ান 'স্নব'রা চা-বাগিচার অশিক্ষিত—এমন কি বর্বর বললেও অত্যুক্তি হয় না—সায়েবদের এই বিদ্রূপসূচক নাম

দিয়েছিল—চায়ের পেটি বা 'বক্স্' নিয়ে তাদের কারবার করতে হয় বলে। মনসূর সাহেব হয়তো কথাটা পূর্বে কখনো শোনেন নি তাই অর্থটা ধরতে পারেন নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'বক্স্ওলা কি ?'

শহ্র্-ইয়ার যেন প্রশ্নটা শুনতেই পায় নি এ রকম ভাব করে মিসিস মনসূরের দিকে ঝুঁকে দরদভরা কণ্ঠে কি যেন শুধোলো।

তর্ক থেমে গেছে কিন্তু তবু মনসূর থামতে চান না। তিনি উর্দু সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও প্রসাদগুণ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চললেন। তার অধিকাংশই খাঁটি সত্য কথা, কিন্তু বলার ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা কর্কশ কর্কশ ইঙ্গিত, 'তোমার বাঙলায় এ রকম আছে ?' ঐ গোছ। কিন্তু শহ্র্-ইয়ার সেই যে মুখ বন্ধ করেছিল আর একেবারের তরেও খুললো না। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরাণীরা বলেন 'তখন আলোচনার কার্পেট রোল্ করে তুলে নিয়ে খাড়া করে এক পায়ে রেখে দেওয়া হলো।' উপস্থিত তারও বাড়া কিছু যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম। যেই শহ্র্-ইয়ার সামান্যতম আভাস পেল যে দ্রব্যগুণেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক মনসূর আবার সেই কার্পেটটা গড়গড়িয়ে খুলতে চান, ধুরন্ধরী সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে যেন টাইট হয়ে গিয়ে বসলো সেই রোল করা কার্পেটটার উপর।

আল্লায় মালুম, মনসূর সাহেবের লেকচার কখন শেষ হবে। আমার প্রিয় বান্ধব ডাক্তার সাহেব আবার কারো কথা মাঝখানে কেটে দিয়ে আপন কথা বলতে একেবারেই অসমর্থ। ওদিকে আমি যেন আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে একটা দুর্গন্ধ পেলুম যে ডাক্তারের ইচ্ছে আমাদের সকলকে বাইরে কোনো মোগলাই রেস্তোরাঁতে খাওয়াতে চান এবং এখানে আসবার সময় সেটা বলতে ভুলে গেছেন। সর্বনাশ! তা হলেই হয়েছে! কী করি, কী করি! মনে পড়লো, ইস্কুলের পণ্ডিত মশাই আমাকে একদিন বলেছিলেন 'সাহিত্যিক হতে হলে যে কটি গুণের প্রয়োজন, যেমন ভাষার উপর দখল, কল্পনাশক্তি এবং আরো বহুবিধ কলাকৌশল তার মাত্র একটি তোর আছে—

র্জলা মিথ্যে বলার নির্লজ্জ চতুরতা।' 'জয় গুরু, জয় গুরু! তোমার হিমা অপার! তোমাকে স্মরণ করা মাত্রই অজ্ঞান-তিমির-ন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেল: সম্মুখে দেখি দিব্য জ্যোতি, সত্য জ্যোতি।

যেই মনসুর সাহেব দিতে গেছেন গেলাসে আরেকটি চুমুক অমনি ামি সবাইকে না শুনিয়ে আবার শুনিয়েও শহ্‌র্-ইয়ারকে বললুম, ামি তা হলে উঠি। আপনি বাবুর্চিকে বলে এসেছেন তো কি ভাবে ামার পথ্যিটা তৈরী করবে?' তার পর লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে নসুর সাহেবকে বললুম, 'আপনার বন্ধু ডাক্তার সাহেবের আপন াতেই চিকিৎসার জন্যই আমার মফস্বল থেকে শহরে আসা। পাছে াপথ্য কুপথ্য করি তাই আমাকে প্রায় তালাবন্ধ করে রেখেছেন াপন বাড়িতে, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনার সঙ্গে আবার পরিচয় হওয়ায় ড় আনন্দ হলো, হেঁ হেঁ।' ডাক্তার গোবেচারা ফ্যালফ্যাল করে ামার মুখের দিকে তাকালে। শহ্‌র্-ইয়ার আমার কথা শেষ হওয়ার ু পূর্বেই আমার মতলবটা ভালো করেই বুঝে নিয়েছে—আমি সন্দেহ, সেও এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছিল, কিন্তু বেচারী য়েছেলে হয়েও না পারে অশিক্ষিত পটুত্বের অভিনয় করতে, না ারে নির্জলা মিছে কথা কইতে। এবারে আমি একটা পথ করে ওয়া মাত্রই সে চেয়ার ছেড়ে এমনভাবে ঘাড় নাড়ালে যে তার থেকে এও হয় ওও হয়। ডাক্তার বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন বলে মনে লো না—কারো কোনো ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া তার ধাতেই নেই। রকম মহামানব সংসারে বড়ই বিরল।

বিস্তর শেকহ্যাণ্ড, খুদা হাফিজ, ফী আমানিল্লাহ, বঁ ভওয়াইয়াজ লার পর শহ্‌র্-ইয়ার শুধু মনসুর সাহেবকে দুটি অনুরোধ জানালে, াসছেবার কলকাতায় এলে যেন তাঁদের ওখানে ওঠেন এবং আজ াত্রের মত যেন ডাক্তারকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন। মাদাম নসুরকে শহ্‌র্-ইয়ার এ-অনুরোধ আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে পৌঁছন মাত্রই শহ্‌র্-ইয়ার গা ধরলো, আর বেশ উচ্চকণ্ঠেই, অবশ্য এ সময় কেউ যদি আদপে কাছে-পিঠে থাকে তবে সে সে-ব্লকের বেয়ারা—

'হাটের ধুলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুরসুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান।'

আট

ইভার শুধোলে, 'কোথায় যাবো, আম্মা ?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললে, 'বেহেশ্‌ৎ কিংবা াজখ্‌—যেটা এ জায়গা থেকে বেশী দূরে।'

বেচারী ড্রাইভার বুঝতে পারে নি। আমি বললুম, 'উপস্থিত ণ-পারে চলো। পরে দেখা যাবে।'

একটা জায়গায় ভিড় সামান্য কম। আমি বললুম, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার, ানে ঐ গাছতলায় একটু বসবেন ?'

বললে, 'নিশ্চয়ই বসব, একটুখানি তাজা হাওয়া বুকের ভিতর র নি। গ্রেট ঈস্টার্ন তবু পদে আছে, অন্য হোটেলগুলোতে যেন মার দম বন্ধ হয়ে আসে। গঙ্গার হাওয়া গঙ্গাজলের চেয়ে ঢের লো। তাই হিন্দুরা গঙ্গাস্নানের পরিবর্তে এখন গঙ্গার হাওয়া য়ে পাপমুক্ত হয়। এ হাওয়ার বহু গুণ। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বৃত্তি করলো,

'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধসমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।'

রপর গান ধরলো, 'হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—'

াৎ গান বন্ধ করে বললো, 'মিস্টার মনসুর কিন্তু লোক খারাপ নয়— ঃ বলেন আপনি ? আসলে কি জানেন, ওঁরা থাকেন এক ভুবনে, ামাদের বাস সম্পূর্ণ অন্য ভুবনে। বিপদ শুধু এই, ওঁরা আমাদের নভার্ট করতে চান।'

আমি বললুম, 'কনভার্ট করাটা কি দোষের ? ঐটেই তো লমানদের স্ট্রং পয়েন্ট। কাইরোর অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিষয় াইকে পড়তে হয়। কি করে অমুসলমানকে মুসলমান করা যায়।

মনসুর মিশনারীর দোষ বিশ্বসুদ্ধ লোককে উর্দুতে কনভার্ট করা চেষ্টাতে গলদ নয়—গলদ তার পদ্ধতিতে, মেথডে, মডুস্ অপেরাণ্ডিতে দস্ত নিয়ে প্রচার আরম্ভ করলে যাকে কনভার্ট করতে চাও, সে সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, আমি যত ভালো উর্দুই শিখি না কেন, এঁর সঙ্গে তে কখনো কাঁধ মেলাতে পারবো না, কারণ উর্দু এঁর মাতৃভাষা। অতএ বাকী জীবন ধরে ওঁর মুখের দন্তোদ্গীরণ আমাকে সয়েই যেতে হবে কী দরকার গায়ে পড়ে করুণার পাত্র হওয়ার। তার চেয়ে থাকি আমি আমার বাঙলা নিয়ে। দু' পাঁচটা ভুল সে ভাষাতে করলে কীই বা এমন দুশ্চিন্তা—পাড়া-প্রতিবেশীরাও করে। আমরা সবাই বরাবর। ঐ উর্দুর গোঁসাইও নিশ্চয় দু' পাঁচটা ভুল করেন তাঁর চোস্ত উর্দুতে—মানুষ তো আর আল্লা নয়—কিন্তু সে ভুল তে আমার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবো কি করে? কিন্তু এসব নিয়ে এখন আর চিন্তা করেন কেন? এ তে অতি সাধারণ, স্থূল দৈনন্দিন ঘটনা। দেখলেন না, আমি আলোচনায় মোটেই যোগ দিলুম না।'

'সে তো স্পষ্ট দেখলুম। এবারে বলুন, কাইরোতে ইসলাম প্রচার-পদ্ধতি সুচারুরূপে শেখার পর ক'জন অমুসলমানকে মুসলমান করেছেন?'

আমি বললুম, 'প্রথম তো নিজেকেই সামলাই। আমার মত গুনাহ্গার—পাপী মুসলমান এ-সংসারে খুব বেশী নেই। আগে তো একটা মিনিমাম স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছই, তবে না প্রচার কার্য আরম্ভ করার হক্ জন্মাবে।'

শহর্-ইয়ারের চেহারা দেখে মনে হলো আমি যুক্তি দেখিয়ে তাকে আমার সঙ্গে একমত করাতে পারি নি। সে ভী আচ্ছা শেষ বিচারের দিনে তিনি যদি সাক্ষ্য দেন যে আমি খুব খারাপ মুসলমান ছিলুম না—অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে যতটা ভেবেছিলুম তার চেয়ে কম—সেও একটা ভরসার কথা।

বললুম, 'একটু সরে এসে এই গাছটার তলায় ঐ শেকড় দুটোর মাঝখানে বসুন। এখানে বসলে তদ্দণ্ডেই মেয়ে মাত্রেরই একটি বিশেষ শক্তি লাভ হয়। নির্ভয়ে নির্বিচারে মিথ্যে কথা বলতে তখন তার আর কোনো বাধাবন্ধ থাকে না। পরের দিন বিকেলে আরেকটি ছেলের সঙ্গে তার লীলাখেলার এপয়েন্টমেণ্ট—আজ সন্ধ্যায় এখানে বসলে সে অকুণ্ঠ ভাষায় নির্দ্বন্দ্ব বিবেক নিয়ে গদ্‌গদ হয়ে অন্য জনকে বলতে পারে, 'আই লাফ্ ইউ, আই লাফ্ ইউ।'

'"লাফ" কেন, "লাভই" তো উচ্চারণ। ভাষাটা তো আর জর্মন নয় যে 'ভি' 'এফ' হবে?'

'এটা সর্বাধুনিক, chic উচ্চারণ।'

'না। আমার মনে হয় তা নয়। মেয়েটা "আই লাফ্ এট ইউ, আই লাফ এট ইউ"। "এট"-টা উহ্য রেখেছিল, ভদ্রতার খাতিরে।' সঙ্গে সঙ্গে শহ্‌র্-ইয়ার হেসে ওঠাতে সাদা দাঁতগুলো ঝিলমিল করে উঠলো কিন্তু মুখের রঙটি অন্দরমহলের বংশানুক্রমিক ধবলের চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে বলে কণ্ট্রাসটার খোলতাই জুতসই হলো না—মুখের রঙ কালো হলে যে রকম হতো।

শহ্‌র্-ইয়ার মুচকি হেসে বললে, 'আচ্ছা, বলুন তো, একটা মেয়ের যদি দুজন প্রেমিক থাকে, এবং সে-যদি দুজনকেই পরিতৃপ্ত করতে পারে, তাতে সমাজেরই বা কি, আর আপনি শিক্ষিত লোক, আপনারই বা কি মরেল অবজেক্‌শন থাকতে পারে?'

আমি বললুম, 'সমাজের আপত্তি বা আমার মরেল অবজেক্‌শন এগুলো পরের কথা। আসলে কি জানেন, জিনিসটা ঠিক স্বাভাবিক-ভাবে চলতে পারে না। মেয়েটাকে সর্বক্ষণ লুকোচুরি খেলতে হয়, সর্বক্ষণ ভয়, দু'জনার এক জন কখন না অন্য জনের গন্ধ পেয়ে যায়—বিবাহিতা রমণী উপপতি রাখলে তাকে যে রকম অষ্টপ্রহর আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটাতে হয়। একে তো মেয়েটার স্বাভাবিক সুস্থ জীবন বরবাদ—তদুপরি ব্যাপারটা খুব বেশীদিন গোপন থাকে না,

জানাজানি হয়ে যায়। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি মেয়েটা এই দোটানার স্ট্রেন সইতে না পেরে একজনকে বিদায় দেয় তখন তার এবং ছেলেটার বন্ধু মহলে সে 'জিল্‌ট্' রূপে মশহুর হয়ে যায়, কারণ, তারা তো আর জানে না যে মেয়েটা দুটো ভিন্ন লোকের সঙ্গে একই সময়ে লীলাখেলা চালাচ্ছিল এবং সে স্ট্রেন সইতে না পেরে একজনকে বিদেয় দিয়েছে। আর আসল তত্ত্ব জানাজানি হয়ে গেলে তো আরো চিত্তির। তখন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পাড়ার নটবররা তার গায়ে পড়ে 'প্রেম' নিবেদন করে। ভাবখানা এই, দুজন যখন ছিলই তখন তিনজনেই বা কি দোষ? আর সর্বশেষে বলি, মেয়েটার পক্ষে ছেলেটাকে বিদায় দেওয়ার 'জিল্‌টিং' কর্মটি কি অতই সহজ! চিন্তা করুন, ছেলেটার মোহ যদি তখনো কেটে না গিয়ে থাকে তবে সে চোখের জল ফেলবে, প্রাচীন দিনের প্রণয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার শপথ কাড়বে! না, 'জিল্‌টিং' কর্মটি শুধু যে 'জিলটেড্' হতভাগার পক্ষেই অপমানজনক তাই নয়, যে জিল্‌ট্ করে তার পক্ষেও পীড়াদায়ক!'

শহ্‌র্-ইয়ার বললে, 'এযুগের অবিবাহিতা তরুণী যুবতীদের চেয়ে আমার বয়স খুব বেশী নয়, তবু এদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই জানতে ইচ্ছে করে এদেশে আমাদের অল্প বয়সে শেখা একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ কি ধীরে ধীরে কিংবা দ্রুতবেগে জিলটিং নামক নয়া মালের জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, কিংবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে?'

আমার চিত্তে কৌতুক রসের সঞ্চার হলো। বললুম, 'আমার বয়সটি কি নিতান্তই প্রেমে পড়-পড় তরুণদের বয়স, যে তাদের সঙ্গে আপনার চেয়ে আমার দহরম-মহরম শ' দুই লিটার বেশী! এবং আমি বাস করি মফস্বলে!'

'কী জ্বালা! আপনার যে গণ্ডায় গণ্ডায় চ্যাংড়া চেলা রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস পুরুষমানুষ নিজের থেকে নিতান্ত না চাইলে

সহজে বুড়ো হয় না। সে কথা থাক্ আমার প্রশ্নটার উত্তর দিন।'

'দেখুন এ-প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক কেউ দিতে পারে না। সবাই শুধু আপন আপন একটা খসড়া গোছ, একচোখা ধারণা প্রকাশ করতে পারে। আমার ধারণাটা প্রকাশ করার পূর্বে একটি অতি হ্রস্ব ভূমিকা দি। এক অতিশয় সহৃদয় বাঙালী সমস্ত জীবন জেলের বড়কর্তা রূপে কাজ করে পেনশন নেওয়ার পর-কি একটা ঘটনা উপলক্ষে বলেন, তাঁর জেলে একবার একজন গুণী পণ্ডিত আসেন যাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব, এবং বিশেষ করে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব। দেশ-বিদেশের জেলে তিনি তাঁর অধ্যয়ন-রিসার্চ করেন সাজা-প্রাপ্ত অপরাধীদের নিয়ে এবং তাঁর একটি অতিশয় বিরল গুণ ছিল এই যে, যত হাড়-পাকা, মুখ-চাপা কয়েদীই হোক না কেন, তার বাক্য তাঁর আচরণ, এককথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে সে তার হৃদয়ের গোপনতম কথা প্রকাশ না করে থাকতে পারতো না। মাসখানেক কাজ করার পর তিনি আমাদের এই বাঙালী জেলারটিকে বলেন, ভারতবর্ষের একাধিক জেলে রিসার্চ করার পরও তিনি এ যাবৎ একটি মাত্র জাত-ক্রিমিনাল, অর্থাৎ যে নিরুদ্বেগে, বিবেক নামক প্রতিবন্ধকের নুইসেন্স সম্বন্ধে অষ্টপ্রহর সম্পূর্ণ অচেতন থেকে ক্রাইমের পর ক্রাইম করে যায়, জাস্ট ফর ইট্স্ ওন সেক্—এরকম প্রাণী এদেশে পান নি, তার মানে এদেশে জাত-ক্রিমিনাল নেই। আমারও মনে হয় এদেশে 'জাত-জিল্‌ট্' নেই। সুদ্ধমাত্র ফুলে ফুলে মধু পান করার জন্য একটার পর একটা পুরুষ জিল্‌ট্ করে করে যৌবনটা কাটাচ্ছে এ রকম রমণী এদেশে বোধহয় বিরল। এই যে আপনি হিন্দু নারীর পতিব্রতা হওয়ার আদর্শের কথা একাধিক বার তুলেছেন, সেই সংস্কারটা এদেশের তরুণীর ভিতর আবির্ভূত হয়—যেই সে প্রথম প্রেমে পড়ে। আর আপনার যে উদাহরণ;—একটি তরুণী দুটো প্রেমিকের সঙ্গে একই

সময়ে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাও এদেশে হয় অন্য কারণে। আমার মনে হয়, একটু অনুসন্ধান করলেই ধরা পড়বে, বেচারী মনস্থির করতে পারছে না, দুটোর কোন্‌টাকে বিয়ে করলে সে আখেরে সুখী হবে, এবং তাই কোনোটাই হাতছাড়া করতে পারছে না।

আপনার প্রশ্নের উত্তর খানিকটে তো দিলুম, কিন্তু আমার প্রশ্ন 'জিল্‌টিং' নামক অতি প্রাচীন অথচ নিত্যনবীন কর্মটির প্রতি আপনার এ কৌতূহল কেন? আমি নির্ভয়ে, নিঃসন্দেহে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি আপনি কখনই 'জিল্‌টিং' রহস্যের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারবেন না। আপনি হিন্দু হলে বলতুম, এ জন্মে না, জন্ম-জন্মান্তরেও না।'

'কেন, আমি কি এতই ইডিয়ট?'

আমি বললুম, 'তওবা! তওবা!! আপনি ইডিয়ট হতে যাবেন কেন? আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী—এ-কথা আমি কেন, আমার গুরুর গুরুও বলবেন। কিন্তু, কল্যাণী, এ তো বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার বস্তু নয়। এটা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার, এবং মনে রাখবেন, আপনি আমাকে অতি উত্তমরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়েছেন আপনার অনুভূতি, আপনার স্পর্শকাতরতা এর সব-কিছু গড়ে উঠেছে, আকার নিয়েছে, আর্দ্রতা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, আপনি আপনার হৃদয়ের খাদ্য আহরণ করেন ঐ একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে জিল্‌টিং নিয়ে গান কই? জিল্‌টেড্‌ হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা কি কস্মিনকালেও তাঁর হয়েছিল? শুধু প্রভাত মুখো কেন, ঠাকুরবাড়ির প্রাচীনতম বৃদ্ধবৃদ্ধা এবং সে-বাড়ির সঙ্গে বাল্যকাল থেকে সংশ্লিষ্ট জন কেউই তো কখনো সামান্যতম ইঙ্গিত দেন নি যে রবীন্দ্রনাথ কখনো কাউকে ভালোবেসে জিল্‌টেড্‌ হয়েছেন। তাঁর প্রেমের গানের মূল সুর মূল বক্তব্য কি? 'আমি তোমাকে ভালো-

বেসেছিলুম, তুমিও আমাকে বেসেছিলে। তার পর তুমি হঠাৎ অকালে চলে গেলে। তাই

এখন আমার বেলা নাহি আর
বহিব একাকী বিরহের ভার ?

কিংবা

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি।

এটা অবশ্যই তাঁর দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রিয়া অকালে অন্য লোকে চলে গেলেন। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই তিনি রূপ দিয়েছেন শত শত গানে—দু'দশ বছর ধরে নয়, সমস্ত জীবন ধরে—কিন্তু মোতিফ এক: 'তুমি চলে গেলে; আমি আর কতকাল ধরে তোমার বিরহ-ব্যথা সইব ?'

শহ্‌র্-ইয়ার বললে, 'মাফ করবেন—হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। আমার অনুভূতি আমার ইমোশান যেমন রবীন্দ্রনাথের গান গড়ে দিয়েছে আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই নয় ? আপনি তো তাঁকে কাছের থেকে দেখেছেন, তাঁর বহু বহু গান আপনি এবং আপনার সতীর্থরাই সর্বপ্রথম শুনেছেন।'

আমি বললুম, 'গুরু যেন অপরাধ না নেন! আমার অনুভূতি জগৎ নির্মিত হয়েছে অন্য বস্তু দিয়ে। গুরুর কাছ থেকে সিকিপরিমাণও নিয়েছি কিনা সন্দেহ।'

শহ্‌র্-ইয়ার বিস্মিত হয়ে শুধোলো, 'তবে কোথা থেকে ?'

'বৈষ্ণব পদাবলী থেকে।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাঙলাদেশের সর্বত্রই যে মোতিফ নিয়ে সব চেয়ে বেশী গান গাওয়া হয় সেটি রাধাকৃষ্ণের। এবং আরো পরিষ্কার হয়, আরো সংকীর্ণ পরিসরে সেটা জাজ্বল্যমান হয় যদি বলি আসলে মোতিফটা শ্রীরাধার বিরহ। সেই বিরহের গান গাওয়া হয় নিত্য নব রচা হয় বাঙলাদেশের নানা অঞ্চলে নানা সুরে। কথার দিকে শ্রীরাধার বিরহ-যন্ত্রণার সর্বোত্তম অতুলনীয় প্রকাশ এই

আমাদের বীরভূমের চণ্ডীদাসে। এঁর পরে আসেন বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ইত্যাদি। মুসলমান কবিও বিস্তর আছেন তবে একমাত্র সৈয়দ মর্তুজা ছাড়া আর কেউ খুব উচ্চস্তরে উঠতে পারেন নি—যদিও তাঁদের সহৃদয়তা, শ্রীরাধার প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও সহানুভূতি হিন্দু কবিদের চেয়ে কণামাত্র কম নয়।

আর সুরের দিক দিয়ে শ্রীরাধার বিরহসঙ্গীতের সর্বোত্তম অতুলনীয় বিকাশ ফুটে উঠেছে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে, সুরে।

আমি ঐতিহাসিক নই, তাই বলতে পারবো না, কত শত বৎসর ধরে কত হাজার বৈষ্ণব কবি তাঁদের আপন আপন বিরহবেদনার নিদারুণ অভিজ্ঞতা শ্রীরাধার কণ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ রেখে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা নবীন কাব্য রচনা করে, নূতন নূতন নায়ক নায়িকা নির্মাণ করে, যেমন মনে করুন, নলদময়ন্তী কিংবা লায়লী মজনুন, তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে আপন আপন বিরহযন্ত্রণার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। তাবৎ বৈষ্ণব কবিদের বিরহবেদনা শ্রীরাধার বিরহবেদনা, আর যুগ যুগ ধরে শ্রীরাধার কণ্ঠে সঞ্চিত তাবৎ বিরহগাথা সর্ব বৈষ্ণব কবির গৌরবসম্পদ!

নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে, এমন কি আপন প্রিয়াকে রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসিত করে দুজনারই নিষ্ঠুরতম বিরহজ্বালার অভিজ্ঞতা ব্রজসুন্দরীর কণ্ঠে সমর্পণ—এই যে প্রক্রিয়াটি এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। আপনার মনে আছে, বোলপুরে পারুল বনে যেতে যেতে এক সকালে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করে আপনাকে শোনাই—কোনো টীকাটিপ্পনী না করে?—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে
বিরহ-তাপিত?

অবশ্য আমারও ইচ্ছে করে গুরুকে সবিনয় জিজ্ঞেস করতে, তাঁর বেলা, যাঁর 'বিরহ-তাপিত' অশ্রু তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, যাঁর 'মুখ' যার 'আঁখি' হতে

'——এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি——'

করেছিলেন তিনিও, তাঁর প্রতি তিনি তাঁর কাব্যে সুবিচার করেছেন তো ?

ঠিক ঐ একই প্রক্রিয়াই ইয়োরোপের বহু বহু কবি 'ত্রিস্তান আর ইজলদের' প্রেমগাথায় আপন আপন নিজস্ব প্রেম, বিরহ, মিলন—অবশ্য মিলন অংশ সর্বকাব্যেই অতি ক্ষুদ্র অংশ পায়—অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু বাঙলাদেশের বিরাট বৈষ্ণবগাথার তুলনায় ত্রিস্তানগাথা সূচ্যগ্র পরিমাণ।'

শহ্‌র্-ইয়ার এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এবারে শুধোলো, 'কই, আমি তো ত্রিস্তান ইজলদে কাহিনীর নাম পর্যন্ত শুনি নি।'

বড় বেদনার গাথা। আর ইয়োরোপীয় এ জাতীয় যত গাথা আছে তাদের মধ্যে আমি এটাকেই সর্বোচ্চ আসন দি। আপনি যে শোনেন নি সেটাও খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই এ-সব গাথার প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে 'ফ্রেঞ্চ একাডেমি'—এবং জানেন তো পৃথিবীর আর কোনো একাডেমি এর এক শ যোজন কাছে আসতে পারে না—প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁদেরই এক সদস্যের স্কন্ধে গুরুভারটি দেন তিনি যেন ত্রিস্তান সম্বন্ধে যে কটি ব্যালাড পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে কালোপযোগী একখানা নবীন 'ত্রিস্তান' রচনা করেন। সে 'ত্রিস্তান' আমাকে মুগ্ধ করে, এবং তার বাঙলা অনুবাদ আমি আরম্ভ করি কিন্তু শেষ করতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে আসি। এবং যদি অনুমতি দেন, তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই আরম্ভ করি। আপনার খুব খারাপ লাগবে না, কারণ আপনি আমি দুজনাই মুসলমান; ওদিকে রাধাকৃষ্ণের কাব্যরূপ রসস্বরূপ বাদ দিলে তাঁরা হিন্দুদের—বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের—উপাস্য দেব-দেবী এবং শ্রীকৃষ্ণ শুধু বৃন্দাবনের রসরাজ নন, তিনি গীতাকার রূপে বিষ্ণুর অবতার। আমি মানুষ হয়েছি আচার-নিষ্ঠ মুসলমান পরিবারে। অথচ যে গানটি আমার আট বৎসর বয়সে মনে অদ্ভুত এক নবীন অনুভূতির সঞ্চার করেছিল সেটি

"—দেখা হইল না রে শ্যাম,
আমার এই নতুন বয়সের কালে—"

এ বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত অংশটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সারি, যদিও আমার অভিজ্ঞতাটার কিঞ্চিৎ—অতি সামান্য—মূল্যও আছে।'

শহুর্-ইয়ার দৃঢ় অথচ সবিনয় মধুর কণ্ঠে বললেন, 'আপনি দয়া করে কোনো বস্তু বাদ দেবেন না। কীর্তন গান রেকর্ডে, বেতার থেকে আমি শুনেছি কিন্তু ওর গভীরে আমি কখনো প্রবেশ করি নি।'

আমি বললুম, 'তার কারণও আমি জানি। জানতে চাইলে পরে বুঝিয়ে বলবো।'

হ্যাঁ। আমি পানির দেশের লোক, চতুর্দিকে জল আর জল! সঙ্গে সঙ্গে ভোরে, সন্ধ্যায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনেক পরেও ভাটিয়ালি গীত। নিশ্চয়ই প্রথম শুনেছি মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে। সামান্যতম বোধশক্তি হওয়ার পর থেকেই শুনেছি কান পেতে এবং অতি শীঘ্রই সেটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যে রকম আমার দেশের দানা-পানি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু ঐ 'দেখা হইল না রে শ্যাম'-এর আগেকার কোনো গানই আমার মনে নেই।

আমাদের পরিবার আচারনিষ্ঠ, তার ঐতিহ্যে কট্টর প্যুরিটান। গান-বাজনা আমাদের পরিবারে বরাহমাংসবৎ ঘৃণ্য। কিন্তু সে কোন্ নিয়তি আমাকে ঐ গানের দিক আকৃষ্ট করলো জানিনে। আট বছর

বয়সে 'নতুন বয়সের কালে' দেখা না হওয়ার ট্রাজেডি হৃদয়ঙ্গম করার কথা নয়। তবে আকর্ষণ করলো কি? জানিনে, সত্যি জানিনে।

তার পর বহু গান শুনতে শুনতে পরিচিত হলুম রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে। আমাদের দুজনারই প্রিয় গান 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'-র 'নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে' যেন অকস্মাৎ আমার মত দীন অকিঞ্চনজন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রবেশাধিকার পেল। আপনারই মত যখন আমার হৃদয়ানুভূতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসগন্ধবৈভবে নির্মিত হচ্ছে তখন হঠাৎ পরিচয় হল চণ্ডীদাসের সঙ্গে। তার তাবৎ গানের সঙ্কলন ঘণ্টা তিনেকের ভিতর পড়ে শেষ করা যায়। আমার লেগেছিল পূর্ণ একটি বৎসর। ইতিমধ্যে জানতে পারলুম, চণ্ডীদাসের জন্মস্থল নান্নুর, আমাদের বোলপুর থেকে মাত্র মাইল আষ্টেক দূরে। এক বন্ধুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গেলুম সেখানে পয়দল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, জমিদার অনাদিবাবুর ছোট ভাই শোনালেন কীর্তন গান। তিনি আমাকে ফরমাইশ করতে বললে আমি চণ্ডীদাস থেকে বেছে বেছে আমার আদরের গানগুলো পেশ করলুম। মাত্র কয়েক বছর হলো শুনলুম, তিনি গত হয়েছেন; তাঁর সদ্‌গতি হোক!

তারপর বহু বার শুনেছি সন্ধ্যা আটটা দশটা থেকে ভোর অবধি কীর্তন গান। তার বর্ণনা আপনাকে আরেকদিন দেব। এদেশ থেকে বহু উত্তম উত্তম প্রথা প্রতিদিন লোপ পাচ্ছে; আমার গভীরতম শোক, দুর্নিবার হাহাকার—যার কোনো সান্ত্বনা নেই যে সমস্ত রাত ধরে কীর্তন গান গাওয়ার প্রথা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। আমার মতামতের কী মূল্য? তবু যাবার পূর্বে নিবেদন করে যাই ঐটেই ছিল বাঙলার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ঐতিহ্যগত সম্পদ —এর লক্ষ যোজন কাছে আর কোনো সম্পদ কোনো বৈভব আসতে পারে না।

বিবেকানন্দ 'কুমড়ো গড়াগড়ি' কথাটা একাধিকবার ব্যবহার করেছেন—কারণ ছবিটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

কীর্তনের আসরে ছেলে-বুড়ো রাধার বিরহবেদনা শুনে 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয়। আমি দিই নি কিন্তু দুই চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে গেছে।

গুরু ক্ষমা করবেন, আপনিও অপরাধ নেবেন না, শহুর্-ইয়ার, কারণ আপনার অনুভূতি-ভুবন গড়ে তুলেছে আমার গুরুর শতাধিক গান, কিন্তু যদি বলি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বোত্তম সম্মেলনেও আমি কাউকে কাঁদতে দেখি নি, কুমড়ো গড়াগড়ির কথা বাদ দাও।

ব্যস্! আমি অন্য আর কোনো তুলনা করবো না, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে। ইতিমধ্যে বলে রাখি, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্ববৈভবে অতুলনীয়। যে জর্মন-'লীডার' ইয়োরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, রবীন্দ্রসঙ্গীত তার চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, তার বৈচিত্র্য এবং বহুমুখী বিকাশ কাব্যলোকে তাবল্লোক ছাড়িয়ে চলে গেছে বহু ঊর্ধ্বে।

কিন্তু প্রশ্ন, কীর্তন শুনে বালবৃদ্ধ (আমি যখন প্রথম শুনে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নার শব্দ চাপতে চেয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোল) 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয় কেন? আমি অবশ্যই এখানে আড়াই-খানা কীর্তনের রেকর্ড বা বেতারে আধঘণ্টা কীর্তন প্রোগ্রাম শোনার কথা ভাবছিনে—দ্বিতীয়টা তো বহুবিধ যন্ত্রের খচখচানি এবং অংশতঃ সেই কারণে কীর্তনীয়ার অবোধ্য শব্দোচ্চারণ সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্যকার কীর্তনের এক হাস্যাস্পদ ব্যঙ্গরূপে আধঘণ্টা ধরে মুখ ভ্যাংচায়। আজকের দিনে তাই শতগুণে শ্রেয়ঃ—নিভৃতে নির্জনে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসাদি সশ্রদ্ধ বারংবার পঠন—প্রহরের পর প্রহর ব্যাপী। সে সময়ে গানগুলি যে সুরবর্জিত হয়ে দীনদরিদ্ররূপে হৃদয়ে প্রবেশ করছে সেটা আমার দুর্দৈব কিন্তু তবু সেটাকেও নমস্কার —সেও লক্ষগুণে শ্রেয়, প্রাগুক্ত ঐ অর্ধঘণ্টাব্যাপী নির্মম লাঞ্ছনার চেয়ে। সাহস নেই কলকাতা আকাশবাণীর সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি জনতিনেক কীর্তনীয়া—মূল গায়েন উত্তম হওয়া চাই—এনে একটানা, অবিশ্রান্ত সুদ্ধমাত্র কীর্তন শোনাবার?

বিরক্ত হয়ো না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, এ-নিয়ে আমার ক্ষোভ কোনো সান্ত্বনা মানে না, তাই তোমাকে বললুম।

আরেকটা কথা। জানো বোধ হয়, পাঁচমেশালী গানের মজলিসে কারো যদি কীর্তন গাইবার প্রোগ্রাম থাকে—বেশীক্ষণ না, ধরো আধঘণ্টাটাক—তবে সেটা আসে পুরো প্রোগ্রামের একবারে সর্বশেষে। কেন জানো? ঐ উটকো কীর্তনটাও যদি মোটামুটি রসের পর্যায়ে উঠে যায় তবে তার পর আর কেউ অন্য কোনো গান জমাতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথও কীর্তন সুরের ম্যাজিক জানতেন—কীর্তনের কথার তো কথাই নেই—তাই তিনি এ যুগে যে গান সর্বপ্রথম রেকর্ডে দিলেন সেটি কীর্তন সুরে।

এ সবই বাহ্য। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, কীর্তনে আছে কি যে শ্রোতা কুমড়ো গড়াগড়ি দেবে?

আছে অবহেলিত, অপমানিত, পদদলিত প্রেম। শ্রীরাধার মুখ দিয়ে সহস্র সহস্র কবি শত শত বৎসর ধরে যা বলিয়েছেন তার সারাংশ দেওয়া কি সহজ, না আমার বাদ বাকি জীবনটাতে কুলোবে!

রাধা বেচারী বিবাহিতা কন্যা। ওদিকে কৃষ্ণ অতি শিশু বয়েস থেকেই করেছেন একাধিক অলৌকিক কর্ম—মিরাকল্‌—বৃন্দাবনের সর্বত্র তাঁর যশ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবনে সুন্দরী কুমারী গোপিনীরও অভাব নেই। সেই বালকৃষ্ণকে ভালোবাসে সর্বগোপিনী, তাদের মাতা, পিতামহী, বৃন্দাবনের সর্ব নরনারী। যে কোনো কুমারী কৃষ্ণের অনুরাগ পেলে জীবন ধন্য মনে করবে কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মুগ্ধ করলেন, আকর্ষণ করলেন, সম্মোহিত করলেন, আত্মহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা করলেন বিবাহিতা শ্রীরাধাকে। একদিকে তার আনন্দ গরবের অন্ত নেই, অন্যদিকে তার শাশুড়ী ননদী করে তুললো তার জীবন বিষময়। অলঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পাগলিনী শ্রীরাধা ছুটে আসতেন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনামাত্রই। শত দুঃখ শত যন্ত্রণার মাঝখানেও শ্রীরাধা আনন্দে আত্মহারা—

আর হবেনই না কেন? শ্রীকৃষ্ণের মত প্রেমিক এই ভারতবর্ষে জন্মেছে ক'টি!

তারপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্বত্যাগিনী রাধার প্রেম অকাতরে অবহেলা করে—আমি বলি অপমানিত পদদলিত করে চলে গেলেন মথুরায়।

শহ্‌র্-ইয়ার, তুমি মথুরা বৃন্দাবন দেখেছ?'

'মোটরে দিল্লী থেকে আগ্রা যাওয়ার সময় দেখেছি। ও দুটো তো খুব কাছাকাছি। দুটোর শেষপ্রান্ত তো প্রায় মিলে গেছে।'

'ঠিক বলেছ। সেই মথুরা থেকে তিনি এক দিনের তরে, এক মিনিটের তরে বৃন্দাবনে আসেন নি শ্রীরাধাকে দেখতে। উল্টে বৃন্দাবনের ঐ অতি পাশের মথুরায়, বলতে গেলে শ্রীরাধার কানের পাশে তিনি ঢাকঢোল বাজিয়ে করতে লাগলেন একটার পর একটা বিয়ে—রুক্মিণী, সত্যভামা, আরো কে কে আমি ভুলে গিয়েছি, মনে রাখবার কোনো সদিচ্ছাও আমার কোনোকালে হয় নি।

বুঝলে শহ্‌র্-ইয়ার, একেই বলে টায় টায় জিল্টেড্ লাভ্। তামাম বিশ্বসাহিত্য তন্নতন্ন করে খুঁজলেও এই হতভাগিনী 'জিল্টেড্' শ্রীরাধার শত যোজন কাছে আসতে এমন রিক্তা হৃতসর্বস্বা তুমি পাবে না।

তাই আকারে, গাম্ভীর্যে মহিমায় হিমালয়ের মত বিরাট কলেবর বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল সুর—লাইট-মোতিফ—জিল্টেড্ লাভ্, পদ-দলিত প্রেম।

সে সাহিত্যে দুঃখিনী শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা যে কত কবি কত দিক দিয়ে দেখেছেন, কত ভাবে বর্ণনা করেছেন তার সামান্যতম অংশ কেউ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক ঠিক কি বলেছেন বই না খুলে বলা যায় না তবে যা বলেছেন তার সারাংশ এই, মদ দেখলে নেশা হয় না, শুঁকলেও না, চাখলেও না, এমন কি সর্বাঙ্গে মাখলেও না।' মদ গিলতে হয়।

'পদাবলীরস আকণ্ঠ গিলতে হয়।'

নয়

আজ রববার। সপ্তাহে মাত্র এই একটি দিন ডাক্তার আর শহ্‌র্-ইয়ার একে অন্যকে নিরবচ্ছিন্নরূপে পায়। এ দিনটায় আমি থ্‌ ত্রো—ওয়ান টু মেনি—হতে চাইনে। তাই ব্রেকফাস্টে পর্যন্ত গেলুম না। খাই তো কুল্লে দু কাপ চা—সে কর্মটি শুয়ে শুয়ে দিব্য করা যায়। মোগলাই কণ্ঠে বেয়ারাকে চা আনতে হুকুম দিলুম। কিন্তু উল্টা বুঝলি রাম। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে এলেন 'কপোত-কপোতী'। ডাক্তারের মুখে পুরো উদ্বেগ। ঢুকেই নার্ভাস কণ্ঠে দ্রুতগতিতে বলতে লাগলেন, 'আপনার কি হয়েছে? শরীর খারাপ? জ্বর? ব্যথাট্যথা?' শহ্‌র্-ইয়ার খাটের পৈথানে কাঠের বাজু ধরে শুধু তাকিয়ে আছে। তার মুখে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই।

আমি ভালো করে কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে আমার হাতখানা আপন হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি প্রথম দিনই স্থির করেছিলুম, সুযোগমত আপনার শরীরটা একটু দেখে নেব। এই বেলা সেটা করা যাক। আজ রববার, বেশ আহিস্তা আহিস্তা রফ্‌তা রফ্‌তা।' আমি দ্রুতগতিতে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, আমার স্বাস্থ্যটা পুরুষ্টু পাঁঠার মত, হজম করতে পারি ভেজালতম তেল, নিদ্রা ভিজেল ইডিয়টের চেয়েও গভীরতর—ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল রোঁদের পুলিশের চেয়েও। ডাক্তার কোনো প্রকারের আপত্তি না জানিয়ে, প্রশান্ত নিঃশব্দ হাসি মারফত প্রসন্নতা প্রকাশ করে আমার দেহটি বদখলে এনে তাঁর ইচ্ছামত উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন, যেন ঘড়েল ক্যাশিয়ার হাজার টাকার নোটের কোনো না কোনো জালের চিহ্ন খুঁজে বের করবেই করবে—কারণ ইতিমধ্যে, স্বামীর আদেশ হওয়ার পূর্বেই শহ্‌র্-ইয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্র, স্টিতস্কোপ এবং আরো কিছু আমার অচেনা যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার একাধিকবার বললেন, 'আমি ডাক্তারী ভুলে গিয়েছি সে-কথা তো আপনাকে বলেছি। এটা নিছক, প্রাথমিক আনাড়ি পরীক্ষা। পরে আমার এক বন্ধু এসে পাকাভাবে দেখে যাবেন।'

আমি বললুম, 'আমি কি হিন্দুসমাজের অরক্ষণীয়া যে আমাকে কাঁচা দেখা পাকা দেখা সব জুলুমই সইতে হবে?'

ডাক্তার খুশী মুখে বললেন, 'ভালোই হল, ঐ কনে-দেখার কথাটা উঠলো। আপনার কাছে আমার একটা সবিনয় আর্জ আছে। কিন্তু আপনার যদি কণামাত্র আপত্তি থাকে তবে আপনি দয়া করে অসঙ্কোচে আপনার অসম্মতি জানিয়ে দেবেন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি নিরাশ হব না।'

আমি বললুম, 'অত তকল্লুফ করেন কেন? বলুন না খুলে।'

খোঁড়াদের চলার মত ইনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কথা বললেন। 'মানে, অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে এই; আমার অতি দূর সম্পর্কের একটি ভাগ্নী আছে। বাপ মা নেই—অরক্ষণীয়া বলা যেতে পারে। আপনাদের অঞ্চলে বিয়ের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা কি পদ্ধতিতে হয় আমার জানা নেই। এ অঞ্চলে কিন্তু কনে পক্ষ কখনোই বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় না—সে বড় শরমের কথা। হিন্দুদের মত প্রোফেশনাল ঘটকও আমাদের নেই। তাই চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে কনের মামার ভায়রা-ভাইয়ের ভগ্নীপতি, পারলে তার চেয়েও দূর সম্পর্কের কেউ তার কোনো বন্ধুকে—আত্মীয়কে নয়—বরের ভগ্নীপতির মেসো মশায়ের বেয়াইয়ের কোনো বন্ধুকে যেন ইঙ্গিত দেয় এই বিয়েটা সম্বন্ধে। তারপর স্টেপ বাই স্টেপ সেটা এগোয়। সেগুলো না হয় নাই বললুম। এক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আজ সকালে বরের এক নিকট আত্মীয় এখানে আসছেন—ভদ্রলোক

আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন—কথাবার্তা আরেকটুখানি পাকাপাকি করার জন্য। আপনি তো জানেন, এসব দুনিয়াদারী বাবদে আমি একটি আস্ত গাধা। তাই আপনি যদি সেখানে—'

আমি বললুম, 'আমি সানন্দে উপস্থিত থেকে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু বিপদ কি জানেন, আমি এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিমানী। আলোচনার সময় যদি আমার কখনো মনে হয়, বরপক্ষ আমাদের কনেকে যেন নিতান্ত মেহেরবানী করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন কিংবা—থাক্, অর্থাৎ বাংলা কথায়, কনে কিংবা তার আর্থিক অবস্থা অথবা তার বংশমর্যাদা সম্বন্ধে কোনো প্রকারের সামান্যতম কটাক্ষ যদি বরপক্ষ করে তবে লেগে যাবে ফৌজদারী। আমি খুব ভালো করেই জানি, সেক্ষেত্রে আমার সভাস্থল পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ আলোচনা চালু রাখার জন্যে তো অন্য মুরুব্বিরাও রয়েছেন, কিন্তু আমি পারি না, আমি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি ও আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে যেন ধুঁয়ো বেরুতে থাকে। অতএব বড়ই প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, আলোচনায় আমার যোগদান করাটা কি আপনাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়?'

আমার কথা শুনে দুজনাই এমন হাসি লাগালেন যে তার আর শেষই হয় না। ডাক্তার তার বউকে সঙ্গে সঙ্গে কি যে বলছেন সেটা আমার ঠাহর হলো না। পরে শুনলুম বলছেন, 'ঠিক আমার আপন মামুর মত, হুবহু যেন আমার আপন মামু এ কথাগুলো কইলেন! তুমি তাকে দেখো নি শহর্-ইয়ার—তিনি চলে যান আমি যখন ম্যাট্রিকে। কী দম্ভ, কী দেমাক ছিল ভদ্রলোকের! কিন্তু ঐ একমাত্র বিয়ের আলাপের সময়। অন্য সময় মাটির মানুষ বললেও কমিয়ে বলা হয়। আর তাঁর দোস্তী ছিল কাদের সঙ্গে, জানো? দুনিয়ায় যত মুটেমজুর, গাড়োয়ান বিড়িওলার সঙ্গে। তিনি গত হলে পর আমরা তো বেশ জাঁকজমক করে তাঁর ফাতিহা (শ্রাদ্ধ) করলুম, আর বিশ্বাস করবে না, শহর্-ইয়ার, আরেকটা আলাদা করলো তাঁর

টাঙাওলা বিড়িওলা দোস্তরা—দু'পয়সা, চার পয়সা করে চাঁদা তুলে তুলে।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই অত্যন্ত খানদানী ঘরের শরীফ আদমী ছিলেন।'

ডাক্তার বললেন, 'দি বেস্ট না হলেও ওয়ান অব্ দি ভেরি বেস্ট্ ইন্ মুর্শিদাবাদ। কিন্তু আপনি আঁচলেন কি করে।'

'উচ্চতম স্তরের লোক ভিন্ন অন্য কেউ নিম্নতম স্তরের সঙ্গে মেশবার হিম্মৎ কলিজায় ধরে না।'

ডাক্তার বললেন, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আপনি, স্যার, কি এখনো উনবিংশ শতাব্দীতে বাস করেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। আমি বিংশ শতাব্দীও পেরিয়ে গিয়েছি। যে-কোনো প্রকারেই হোক মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে এই মান্ধাতার আমলের কুসংস্কার আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ-নিয়ে আলোচনা পরে হবে। ওনারা আসবেন কখন?'

'দেরী নেই, এনি মিনিট।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি জেনে নিই। কনের মা'র মহ্‌র্ (স্ত্রীধন) কত ছিল?'

ডাক্তার ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'তাই তো। ওদের আবার ফোন নেই যে শুধোবো।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললে, 'দশ হাজার।'

'সঙ্গে সেকুরিটি হিসেবে জমি-জমা, কলকাতার কোনো স্থাবর সম্পত্তি?'

'না।'

'মুহম্মদী চার শর্ত ছাড়া অন্য কোনো শর্ত ছিল যেটা বর ভাঙলে মেয়ে তালাক চাইতে পারবে?'

'না।'

'কনের কোনো ভাই বোন আছে?'

'একটি দিদি ছিল। বিয়ের অল্প দিন পরেই মারা যায়।'

'কাবিন্-নামায় (ম্যারেজ কন্ট্রাক্টে) ওর স্ত্রীধন (মহ্‌র্) কত ছিল ?'

'হাজার পনরো।'

'ওরা কত গয়না দিয়েছিল ?'

'হাজার তিনেকের।'

'আর আমরা ?'

'ঐ হাজার তিনেক। তবে জেহজের খাটতোষক, ড্রেসিং টেবিল, পেতলের কলসীটলসী নিয়ে হাজার পাঁচেক হবে।'

শহ্‌র্-ইয়ারই সব কটা উত্তর দিলে।

ডাক্তার সত্যই একটা নিষ্কর্মা খোদার খাশী। ফ্যালফ্যাল করে শুধু আমাদের কথাবার্তা শোনে আর তাকানোর ভাব থেকে অতি স্পষ্ট বোঝা যায়, এ সব প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য তার মস্তকে আদৌ প্রবেশ করে নি।

শহ্‌র্-ইয়ারকে শুধালুম, 'বরের বাড়ির মেয়েরা হরেদরে কত স্ত্রীধন পেয়েছে এবং বরেরা আপন আপন দুল্‌হিনকে (কনেকে) কত টাকার গয়নাগাঁটি দিয়েছে সেটা বোধহয় জানেন না এবং আমাদের সুচতুর ডাক্তারও সে খবর গোপনে গোপনে সংগ্রহ করেন নি। না ?'

আমার অনুমান সত্য।

ডাক্তার মেয়েটি কি কি পাস দিয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে কিনা এসব খবর দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি বললুম, 'ওসব জেনে কি হবে ? তার জোরে স্ত্রীধন বাড়াবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরপক্ষ তাদের অন্যান্য ছেলের বিয়েতে কাবিন্-নামায় কনে পক্ষের প্যাঁচের টাইটে কি কি দিয়েছে সেটা জানতে পারলে, বেটার্ স্টিল ওদের দু'চারখানা কাবিন্-নামার কপি যদি গোপনে গোপনে জোগাড় করে রাখতেন তবে সেগুলো হতো আমার এ্যাটম বম্। এখন যা অবস্থা, মনে হচ্ছে, গাদা বন্দুকটি পর্যন্ত হাতে নেই।'

প্রাইজ-ইডিয়ট আর কারে কয়! ডাক্তার বলে কি না, বরপক্ষকে শুধোলেই তো সব জানা যাবে।

আমার কান্না পাবার উপক্রম। বললুম, 'ওরা জলজ্যান্ত মিথ্যে খবর দেবে। আর আমিও কনে পক্ষের সুবিধের জন্যে যে থাণ্ডারিং মিথ্যে বলবো না, সে প্রতিজ্ঞাও করছিনে।'

শহ্‌র্-ইয়ারকে শুধালুম, 'আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন?'

'না।'

'একসেলেণ্ট! কিন্তু আপনি কোথাও পালাবেন না। কোনো খবরের দরকার হলে আপনার কাছে কোনো অছিলায় চলে আসব।'

'আমি ওঁদের জন্যে খাবার-দাবার তৈরী করার তদারকীতে থাকবো।'

বেয়ারা খবর দিল ওঁরা এসেছেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন। আমি পা বাড়াতেই শহ্‌র্-ইয়ার দুষ্টু মুচকি হাসি হেসে বললে, 'আপনাকে যে কত রূপেই না দেখব! এখন দেখছি ঘটক রূপে। এও এক নব রূপ।' গুনগুন করে গান ধরলো—

'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে

ডাক্তার মহা সাড়ম্বরে বর পক্ষের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি যে কনে পক্ষের হয়ে এই আলোচনায় যোগ দিতে রাজী হয়েছি তার জন্য তিনি এবং তাঁর পরিবার নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করছেন। কনে পক্ষের দু'জনও তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমার নাম তাঁদের গোষ্ঠীতে অজানা নয়।

ডাক্তার বললেন, 'ইনি আছেন বলে আমার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই যে, আমরা অতি সহজেই সব বিষয়েই একমত হয়ে যেতে পারবো।'

আমি এ-জাতীয় অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম—অজ্ঞজন যাকে বলে বিবাহের শর্তগুলি স্থির করার জন্য বর ও কনে পক্ষের মধ্যে আলোচনা

—শেষবারের মত দেখেছি দেশে। তার পর দু'একটি বিয়ে-শাদীতে আনুষ্ঠানিকভাবে পেট ভরে খেয়ে এসেছি—ব্যস্।

আমি সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার শেষ অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রামে আমার অদৃশ্য তলওয়ারটাতে শান দিতে লাগলুম।

কিন্তু হা কপাল! সব বেকার, সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল!

এ জাতীয় আলোচনা সব সময়ই আরম্ভ হয় মহর্ বা স্ত্রীধনের পরিমাণ নিয়ে। কনের দিদির স্ত্রীধন পনেরো হাজার ছিল তারই স্মরণে গুনগুন করলুম, 'কুড়ি হাজার।'

আমি ছিলুম তৈরী যে তাঁরা মৃদু হাস্য করে অতিশয় ভদ্রতা সহকারে দশ হাজার দিয়ে দর কষাকষি আরম্ভ করবেন। ইয়া আল্লা! কোথায় কি। দু'জনাই অতি প্রসন্ন বদনে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন! আমি তো সাত হাত পানিমেঁ!

মৃদুকণ্ঠে বললুম, 'আপনারা তো সবই জানেন, কনের বাড়ির হালও জানেন; গয়নাগাঁটি আমরা আর কি দেব আপনারাই বরঞ্চ একটা আন্দাজ দিন।'

ফের ফাটলো বম্-শেল! দু'জনাই সাত তাড়াতাড়ি বললেন, 'একি বলছেন, সাহেব। না, না, না। আপনারা যা খুশ্ দিলে দেবেন আমাদের পক্ষে সেইটেই গণিমৎ (বৈভব, সৌভাগ্য)।'

তার পর ওঁরা নিজের থেকে যা বললেন তা শুনে, বিশেষ করে 'থার্টি ইয়ারস উয়োরের' স্মরণে, আমি আমার কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। ওঁরা কনেকে কি গয়নাগাঁটি দেবেন সে প্রশ্ন ইতিউতি করে আমি শুধোবার পূর্বেই তাঁরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'মাফ করবেন, আর আমাদের পক্ষ থেকে তো বলার কিছু নেই। আপনারা জানেন দুল্হার (বরের) ভাইবোন নেই। কাজেই দুল্হিনই শাশুড়ীর সব-কিছু পাবেন এ তো জানা কথা, আর আমরাও সেই কথাই দিচ্ছি। তার দাম—' ভদ্রলোক সঙ্গীকে শুধোলেন, 'কত হবে ভায়া?' সঙ্গী বললেন, 'হালে যাচাই করা হয়েছিল।

কুড়ি হাজারের কম না। তিন পুরুষের পুরনো গয়না, নূতন করে গড়াতে হবে।'

'কুড়ি হাজার'—বলে কি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি বললুম, 'অমন কর্মটি করতে যাবেন না। আল্লার মেহেরবানীতে ভালোয় ভালোয় আকৃৎ-রসুমাৎ (পরিপূর্ণ শাদী) হয়ে যাক তখন না হয় তুল্‌হিন্ তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করবেন। কি বলেন ডাক্তার? আর আপনারা?'

তুজনেই সানন্দে সায় দিয়ে, একজন বললেন, 'আমার মেয়ে বলছিল, পুরনো ফ্যাশন নাকি আবার হাল ফ্যাশন হচ্ছে! এখন ভেঙে গড়ালে পরে হয়তো তুল্‌হিনই—' কথাটা তিনি আর শেষ করলেন না।

ইতিমধ্যে নাশ্‌তা আসতে আরম্ভ করেছে। সে আসা আর শেষ হয় না। নাশ্‌তা না বলে এটাকে হক্‌ক-মাফিক ব্যানকুয়েট বলা উচিত। বরপক্ষ ক্রমাগত আমাদের শুনিয়ে একে অন্যকে বলে চলেছেন, 'হবে না কেন? চিরকালই হয়ে আসছে এরকম। এঁয়ার ওয়ালেদের (পিতার) আমলে আমি কতবার খেয়েছি এ রকম। আমার দাদাকে (ঠাকুদ্দা) কত শত বার বলতে শুনেছি, এঁয়ার ঠাকুদ্দার শাদীর দাওয়াৎ! তিন রকমের খানা তাইয়ার হয়েছিল। তিন বাবুর্চীর একজন এসেছিল পাটনা থেকে, অন্যজন দিল্লী থেকে আর তিসরা হায়দ্রাবাদ নিজামের খাস বাবুর্চী-খানা থেকে। আর—' চললো তো চললো—তার যেন শেষ নেই।

নাশ্‌তার বাসন-বর্তন খাওয়াদাওয়ার পর যখন সরিয়ে নেওয়া হলো তখন আমি অতিশয় মোলায়েম সুরে বললুম, 'আমার একটি আর্জ্‌ আছে; যদি অভয় দেন—'

উভয়ে সমস্বরে বললেন, 'আপনি আর্জ্‌ না, হুক্‌ম্ করুন।'

আমি বললুম, 'আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা বোধ হয় আদালতে টেকে না। কুরান শরীফের কানুন মতাবেক যে কোনো মুসলমান

চারিটি বীবী একই সময়ে রাখতে পারে। এখন আমরা যদি কাবিন্-নামায় তুল্‌হার কাছে শর্ত নিই অর্থাৎ আপনারা যদি মেহেরবানী করে সে শর্ত কবুল করেন যে তিনি তুল্‌হিনের বিনা অনুমতিতে তুসরী শাদী করবেন না, তবে আইনত সেটা বোধ হয় আলট্রা ভাইরেস্। আদালত খুব সম্ভব বলবে, "কুরান শরীফ মুসলিমকে যে হক্‌ক দিয়েছেন, মানুষ একে অন্যের কাছ থেকে শর্ত আদায় করে সে হক্‌ক খর্ব করতে পারে না।" আমি এতক্ষণ ধরে এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করছিলুম।'

কন্যাপক্ষ বললেন, 'আমরা খুশীর সঙ্গে সে শর্ত দেব। সে শর্ত আপনাদের তরফ থেকে নিতে তো কোনো দোষ নেই। তার মূল্য শেষ পর্যন্ত যদি না থাকে তো নেই। এখন নিতে আপত্তি কি?'

সমস্ত বাক্যালাপটা আমার কাছে অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকছিল। কোথায় গেল সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লড়াই? আলোচনার নামে চিৎকার, রাগারাগি, নাশ্‌তা স্পর্শ না করে বরপক্ষের সভাত্যাগ; এমন কি বিয়ের রাত্রেও—উভয় পক্ষ ততদিনে বিয়ের প্রস্তুতির জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন—কাবিন্-নামা লেখার সময় সামান্য একটা শর্ত নিয়ে বচসা, তারপর মারামারি, সর্বশেষে বিয়ে ভণ্ডুল করে বরপক্ষ বাড়ি যাবার পথে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ পর্ব সমাধান করে মুখ রক্ষা করলো—এ ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়েছে।

আর আজ দেখি তার উল্টো! আমি যা শর্ত চাই সেটাতেই তাঁরা রাজী! যেন সমস্ত কলকাতা শহরে আর কোনো বিবাহযোগ্যা কুমারী নেই! এই ত্রিশ বছরে তুনিয়াটা কি আগাপাস্তলা বদলে গেল?

এ অবস্থায় আর খাঁই বাড়ানো চামারের আচরণ হবে। শুধু বললুম, 'আর বাকী যেসব ছোটোখাটো শর্ত আছে, যেমন আমাদের মেয়ে যদি—আল্লা না করুক—শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু বাপের বাড়িতে এসে কিছুকাল বা দীর্ঘকাল বাস করে তবে সে

শ্বশুরবাড়ি থেকে কত টাকা মাসোহারা পাবে, আপনারা যে স্ত্রীধন দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন তার জিম্মাদার কে কে হবেন, এ সবের জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। বিয়ের পূর্বে আমাদের উকীলের সঙ্গে আপনাদের উকীল বসে এ-সব ফর্মালিটিগুলো দুরুস্ত করে নেবেন। আজ আমি এতই খুশী যে বিনা তর্কে বিনা বাধায় বড় বড় শর্তগুলো সম্বন্ধে একমত হতে পেরেছি যে অন্য আর কোনো ছোটো শর্ত স্পর্শ করতে চাইনে।'

সবাই সমস্বরে তখন আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন আল্লার কাছে শুক্‌রিয়া জানিয়ে একটি মনাজাত (প্রার্থনা) করি। এসব মোল্লাদের (পুরুৎদের) কাজ,—তারা দু'পয়সা পায়ও—এসব আমাদের (অর্থাৎ 'স্মৃতিরত্নদের') কাজ নয়। তবু অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা সমাপ্ত করলুম।

ডাক্তার বললেন, 'আমার খুব ছেলেবেলায় এবাড়ির দু'তিন জন অতি বৃদ্ধ মুরুব্বির কোলে বসে তাঁদের আদর পেয়েছি, আর মনে আছে, আমাকে আদর করতে করতে হঠাৎ তাঁরা কেঁদে ফেলতেন। আমি তখন এই বিরাট বাড়ির বিরাট গোষ্ঠীর একমাত্র সন্তান। আপনি যে-সব প্রশ্ন শুধোলেন, এর অধিকাংশের উত্তর এই মুরুব্বিরা নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু আমি তখন এতই অবোধ শিশু যে আমাকে তাঁরা প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনীই বলেন নি।'

একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু এই বৃদ্ধেরা একটা গভীর পরিতৃপ্তি সঙ্গে নিয়েই ওপারে গেছেন। ঐ নিতান্ত শিশু বয়সেই আমি ওঁদের নামাজের সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, বসে, সজ্‌দা দিয়ে তাঁদের অনুকরণ করতুম, তাঁদের কোলে বসে মসজিদে যেতুম, আর বাড়িতে শিনী বিলোবার সময় সদর দরজায় তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম। আমাকে তাঁরা তখন একটা খুব উঁচু কুর্সীতে বসিয়ে জমায়েত গরীব-দুঃখী, নায়েব-গোমস্তা সবাইকে বলতেন, "ইনিই বাড়ির মালিক; এঁর হুকুমমত চললে আমাদের দোওয়া তোমাদের উপর থাকবে।' আর সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন, সৈয়দ সাহেব, আমার আপন ঠাকুদ্দার বড় ভাইসাহেব, যিনি তখন বাড়ি চালাতেন, তিনি প্রায় প্রতিদিন আমার পড়ার ঘরে এসে বলতেন, 'ভাইয়া, শোনো। মির্জাপুর (উনি অবশ্য মীরজাফর-ই বলতেন) অঞ্চলে আজ আরেকটা বাড়ি কেনা হলো। ঠিক আছে তো?' কিংবা ঐ ধরনের ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু-একটা। আজ ঐ ছবিটা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন হাসি পায়। ঠাকুদ্দা খবরটা দেবার সময় ভাবখানা করতেন, যেন তিনি আমার নায়েব, কিছু একটা করে এসে

হুজুরের পাক্কা সম্মতি চাইছেন! এরকম একাধিক ছবি আমার চোখের সামনে এখনো আবছা-আবছা ভাসে।

ছ'মাসের ভিতর তিন ঠাকুর্দাকেই গোরস্তানে রেখে এলুম। আমার তখনকার শিশু-মনের অবস্থা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করবো না।

ঐ যে পুরো একটা উইং জুড়ে রোজ সন্ধ্যায় সাজানো গোছানো ঘরে আলো জ্বলে তাঁরা ঐখানে বাস করতেন, তাঁদের আপন আপন শ্বশুরবাড়ির কিংবা ঐ ধরনের কিছু কিছু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে। বহু বৎসর পরে আমাদের প্রাচীন দিনের নায়েব সাহেব আমাকে বলেন, 'ঐ বুড়া ঠাকুর্দারা তাঁদের মৃত্যুর বছরখানেক আগে কলকাতার অন্যত্র পুষ্যিদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেন, ঠাকুর্দারা নাকি চান নি যে তাঁরা এ বাড়িতে পরবর্তী কালে আমার কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেন।'

আমি শুধালুম, 'এই নায়েব নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। তিনি আপনাকে প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনী বলেন নি? পাড়ার আর পাঁচ বুড়ো?'

'কি করে বোঝাই, ডাক্তার সাহেব, বাপ মা, আমার আপন ঠাকুর্দা নিয়ে চারজন ঠাকুর্দা—আমার আপন ঠাকুর্দা আর পাঁচ জন চাচা মারা যান আমার জন্মের পূর্বে—এঁদের সবাইকে হারিয়ে ছ' বছর বয়েস থেকে আমি একা—এই বিশাল বাড়িতে একা। শুধু নায়েব সাহেবের ক্ষুদ্র পরিবার এবং তাঁর এক বিধবা পুত্রবধূ—ইনিই আমাকে মানুষ করেন আপন ছেলের মত করে। কিন্তু আমার এমনই কিস্মৎ, এঁরাও সবাই চলেন গেলেন ওপারে—ততদিনে আমি মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারে। বাকি রইলেন, শুধু আমার ঐ মা-টি। তাঁকেও হারালুম এমন এক সময় যে আমি রাত্রে হাউ হাউ করে কেঁদেছি। এই মা আমার আত্মগোপন করে শহ্‌র্-ইয়ারকে গোপনে দেখে এসে আমাকে বললেন, 'জুল্‌ফিকার, আমি নিজে তুল্‌হিন দেখে তোর বিয়ে ঠিক করে এসেছি। এইবারে তুই রাজী

লেই আমি পাকা খবর পাঠাই।' আমি জানতুম, ঐ নিঃসন্তান দ্ধার ঐ একটি মাত্র শেষ শখ। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রক্ত ম্পর্ক নেই, সুদূরতম আত্মীয়তাও নেই, অথচ তিনি আমাকে দিনে দিনে মানুষ করে তুলেছেন সামান্যতম প্রতিদানের চিন্তা পর্যন্ত না করে,—ঘোর নেমক-হারামী হতো এঁর শেষ আশা পূর্ণ না করলে। আর বিয়ে তো করতেই হবে একদিন—বংশরক্ষা করার জন্যে, অন্য কোনো কারণ থাক্ আর নাইবা থাক্। বিয়ে না করলে আমার পিতৃপুরুষ পরলোক থেকে আমাকে অভিসম্পাত দেবেন, এ-কুসংস্কার আমার নেই ; কিন্তু তাঁরা যতদিন এ-লোকে ছিলেন ততদিন আমিই, একমাত্র আমিই যে তাঁদের শেষ আশা, আমিই তাঁদের বংশরক্ষা করবো—সে-আশা যে এ বাড়ির বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাকে প্রাণবায়ু দিচ্ছে। এক মুহূর্ত চিন্তা না করে সম্মতি দিলুম।'

আমি শুধালুম, 'ইতিমধ্যে আপনি প্রেমেট্রেমে পড়েন নি ? লকাতার ডাক্তারি শিক্ষা বিভাগ পাছে আমার বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা করে তাই সভয়ে বলছি, অন্যদের তুলনায় প্রেমট্রেম করার ধিবে আপনাদেরই তো বেশী। আর আপনার চেহারা, ধনদৌলত—'

হেসে বললেন, 'প্রেমট্রেম হয় নি, তবে মাঝে মাঝে যে কি াঞ্চল্য হয় নি একথা অস্বীকার করলে গুনাহ্ হবে। তবে আর ানেন, আমি যে মুসলমান সে-বিষয়ে আমি সচেতন এবং তাই নিয়ে ামার গর্ববোধ আছে। ওদিকে হিন্দুরা নিজেদের মুসলমানের াইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন। সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রত্যেক াতই—একস্ট্রীম এবনরমেল কণ্ডিশন না হলে—নিজেকে অন্য াতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অবশ্য এসব বাবদে সম্পূর্ণ উদাসীন মহাজনও কিছু কিছু সব সময়ই পাওয়া যায়। আমার সহপাঠী াহকর্মী প্রায় সবাই হিন্দু, কিছু কিছু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, যে দু'এক জন মুসলমান তাঁরা থাকেন হস্টেলে। কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে

অন্তরঙ্গতা হয়—এখনো আছে—এবং তাঁরা অত্যন্ত সজ্জন বলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মা-বোনদের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেন। সেখানে প্রেম করে হিন্দু পরিবারে বিপর্যয় কাণ্ড বাধাবার কোনো বাসনাই আমার ছিল না—তদুপরি কোনো হিন্দুতরুণী যে আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন সেটাও আমার গোচরে আসে নি।'

আমি বললুম, 'অত অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে প্রেম হয় না। তারপর কি হলো, বলুন।'

ডাক্তার বললেন, 'পাক্কা হক্ কথা বলেছেন। আচ্ছা, তবে এখন পুরনো কথায় ফিরে যাই। বিয়ের সম্মতি পেয়ে আমার মা তো আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। বাড়ির লোকজন পাড়াপড়শী সবাইকে বার বার শোনান—যা দিনকাল পড়েছে, আপন গর্ভের সন্তান মায়ের মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয় না। আর আমার জুল্‌ফিকার একবার একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো না, দুল্‌হিন্ কোথাকার, লেখাপড়ি করেছে কি না, দেখতে কি রকম। বললে, মা, তুমি যখন পছন্দ করেছ, তখন নিশ্চয়ই ভালো হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলে।

তারপর বুড়ির দিনগুলো কাটলো বিয়ের ব্যবস্থা করতে। চাচা আমাদের বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে তিনি হার্টফেল করে বয়েযায় নিলেন।'

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকার পর বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ প্রাচীন যুগের নায়েব সাহেবের কথা হচ্ছিল যিনি যখের মত এ গোষ্ঠীর বিষয়-সম্পত্তি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আগলিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু বলেন নি, কারণ আমার দিক থেকে তিনি কখনো কণামাত্র কৌতূহল দেখতে পান নি। আর তিনিই বা এসব কথা আমার স্মরণে এনে কি আনন্দ পাবেন? ঠাকুদ্দাদের বয়েসি নায়েব সাহেব আমার ঠাকুদ্দার বাবাকেও তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন, তাঁর জন্ম হলে নাকি আকবরী মোহর দিয়ে

তিনি তাঁর মুখ দেখেছিলেন। কারণ তাঁর বাপ ছিলেন আমার ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার নায়েব। এবং সেই ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার আব্বা বানান এই বাড়িটা। তিনি তাঁর ভাই বেরাদর ভাতিজা ভাগিনা, আপন এবং ভাই-ভাতিজাদের শালা-শালাজ জ্ঞাতিগোষ্ঠী পুষ্যি, মসজিদের ইমাম সায়েব, মোয়াজ্জিন (যে আজান দেয়), পাশের মকতবের গোটা চারেক মৌলবী—মকতবটা বহুকাল উঠে গেছে—বিষয়-আশয় দেখবার দু'পাঁচজন কর্মচারী, ডজনখানেক মাদ্রাসার গরীব ছাত্র নিয়ে এ বাড়িতে থাকতেন। এইটুকু ভাসা ভাসা ভাবে শুনেছি।

কিন্তু মোদ্দা কথা এই: ঠাকুদ্দাদের গোর দেবার সময় আমার অতীত এবং এ-বাড়ির অতীতকেও আমি যেন আমার অজানতে সঙ্গে সঙ্গে গোর দিলুম। বুদ্ধিসুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীতের প্রতি কৌতূহল, আকর্ষণ দুটোই যেন আরো নিভে যেতে লাগল, বরঞ্চ উল্টে অতীতের প্রতি যেন আমার একটা রোষ জন্মাল। মনে হলো সে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর অবিচার করেছে। আমাকেও তো সে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতো। আমি কি তার যক্ষ যে এ বাড়ি ভূতের মত আগলাবো?

আমার মনে হয়, বুড়া নায়েব এবং পাড়ার পাঁচবুড়ো আমার চোখেমুখে অতীতের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা দেখতে পেতেন এবং তাই স্বেচ্ছায় ঐ পাঁক ঘ্যাঁটাতেন না।

আর বলতে গেলে তাঁরা বলবেনই বা কি? সেই ১৮২৫-এর গমগমে বাড়ি কি করে একজনাতে এসে ঠেকলো। একজন একজন করে সক্কলের 'বংশলোপ পেল—এ ছাড়া আর কি? আপনিই বলুন, সে-সব শুনতে কার ইচ্ছে যায়?

তবে হ্যাঁ, কারো যদি ইচ্ছে যায় পুরো ইতিহাসটা গড়ে তোলবার, তবে সে সেটা করতে পারে—কিন্তু বিস্তর তকলীফ বরদাশ্‌ত করার পর। নিচের তলায় 'এল্' উইঙের শেষ দুখানা ঘরে আছে, যাকে

বলতে পারেন আমাদের পারিবারিক আর্‌কাইভ অর্থাৎ মহাফেজ-খানা। ১৭৮০ বা ৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত যেমন যেমন দলীল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ, কর্মচারীদের রিপোর্ট, মোকদ্দমাসংক্রান্ত কাগজ এবং আরো শত রকমের ভিন্ন ভিন্ন কাগজপত্র, টুকিটাকি প্র্যাক্‌টিকাল কারবার-ব্যবসায়ের জন্য বেকার হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো রেখে দেওয়া হয় ঐ দুখানা ঘরে। বেশ যত্নের সঙ্গেই রাখা হয়েছে, এবং পুরুষানুক্রমে নায়েবরাও সেগুলোর যত্ন নেন। শহুর্‌-ইয়ারও মাস তিনেক অন্তর অন্তর সেগুলোর তদারক করে। আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, আমার কিন্তু মাষা পরিমাণ দিল্‌-চস্‌পী এ-সব কাগজপত্রের প্রতি নেই।'

আমি চুপ করে ভাবলুম এবং ডাক্তারকে মোটেই কোনো দোষ দিতে পারলুম না। যে অতীত তাঁর গোষ্ঠীর সব-কিছু নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে তাকে আবার যত্নআত্তি করে পুঁথির পাতায় লেখার কি প্রয়োজন? এবং এর সঙ্গে আরেকটা তত্ত্ব বিজড়িত আছে। পরিবারের অতীত ইতিহাস নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে তাদের বেশীর ভাগই কেমন যেন পূর্ব ইতিহাসের স্মরণে বেশ-কিছুটা দম্ভী হয়ে যায়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের ডাক্তার তো ফকীর, সূফীর বিনয় আচরণ ধরেন, সংসারে থেকে, গৃহীরূপে।

একটু প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি দেখিয়ে শুধালুম, 'এই যে শূন্য অন্ধকার একতলা, দোতলার একটা পুরো উইং, তেতলা—এগুলোর একটা ব্যবস্থা করেন না কেন?'

'কি ব্যবস্থা? ভাড়া দেওয়া ছাড়া আর গতি কি? কলকাতায় আমার যে-সব বাড়ি ভাড়ায় খাটছে তার আমদানীই আমাদের দু'জনার পক্ষে যথেষ্টেরও ঢের ঢের বেশী। পরিবার যে অনতিবিলম্বে বৃহত্তর হবে তার সম্ভাবনাও তো দেখছিনে।'

এর পর ডাক্তার কি বলেছিলেন সেটা আমি সম্পূর্ণ মিস করলুম, কারণ আমার মনে তখন অদম্য ইচ্ছা যে তাঁকে শুধোই: দশ বছর

লা তাঁদের বিয়ে হয়েছে, এখনো কোনো বংশধর না আসার কারণ
? তিনি স্বয়ং ডাক্তার, তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে
রেন, প্রয়োজন হলে বিদেশে যেতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছেটা অতি কষ্টে
ন করলুম। আমি ভীরু; যদি কোনো অপ্রিয় সংবাদ শুনতে হয়।
আবার কান পেতে শুনলুম, বলছেন, 'অতি বিশ্বস্ত আমাদেরই
চীন নায়েব বংশের ছেলে এখন নায়েব আছেন, কর্মচারীরাও
শ্বস্ত, তবু আমার জান পানি পানি। নায়েবকে আমি সর্ব ডিসিশন
বার ভার কমপক্ষে সাতান্নবার বলেছি, বিরক্ত হয়ে কাগজ লিখে
কে তার বাড়িতে পাঠিয়েছি। কোনো ফল হয় নি। সে কাজ করে
য় তার আব্বার কাছ থেকে ঐতিহ্যগত যে পদ্ধতিতে কাজ
খেছে। দুদিন অন্তর অন্তর এ-বাড়িতে এসে সভয় নয়নে উঁকিঝুঁকি
রে—হুজুরকে কখন বিরক্ত না করে দুটো ডিসিশন ফাইনেলাইজ
র নেওয়া যায়। এই উঁকিঝুঁকিটা আমাকে বিরক্ত করে আরো
শী। আমি কি বাঘ, তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব! যদ্দিন তার
প বেঁচেছিলেন, আমি ছিলুম সুখে। সপ্তাহে একদিন এসে
মিনিট ধরে গড়গড় করে যা কিছু করেছেন সেগুলো বলে নিয়ে
ধাতেন, "ঠিক আছে তো, মিয়া?" অনেকটা আমার সেই
কুদার রিপোর্ট দেওয়ার মত। অবশ্য প্রায় দুটি বচ্ছর সর্ব আপত্তি,
তিবাদ, চিৎকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বলতে গেলে প্রায় আমার
নে ধরে সব কটা বাড়ি বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, সব
জ শিখিয়েছেন। ঐ সব বাড়ি আর তাদের ভাড়াটে আমার
য় দুনিয়ার দোজখ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এখন যদি একতলা আর তিনতলাটা ভাড়া দি তবে সেটা খাল
টে ঘরে কুমির আনা নয়, সেটা হবে ক্লাইভ এনে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনা
া। সিরাজ্ উদ-দৌলার মত আমার মুণ্ডুটি যাওয়াও বিচিত্র নয়।
অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা যে একেবারেই ভাবি নি তা নয়,
ন্তু আমার সময় কোথায়?'

এগারো

আল্লাতালা যাকে খুশী তোলেন, যাকে খুশী নামান—এ সত্যি পাপীতাপী আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

ডাক্তারের ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। তার অবতরণিকা যে কৃতিত্ব সব-কিছু দুরুস্ত-সহী করেছিলুম তাই নিয়ে বেশ একা আত্মপ্রসাদ – এমন কি দম্ভ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—অনুভ করছিলুম। অবশ্য বরপক্ষ যদি একটুখানি লড়াই দিত তা হ তাদের ঘায়েল করে কৃতিত্ব ও আত্মপ্রসাদ হতো পরিতৃপ্তি ভরা। ত ওরা যদি লড়াই না দেয়, তবে আমি তো আর ডন্‌কুইকসটের ম উইণ্ডমিল আক্রমণ করতে পারিনে!

কিন্তু শুয়ে শুয়ে সব-কিছু বিচার-বিবেচনা করার পরও যে সু পাচ্ছিলুম, সেটা অস্বীকার করবো না।

এমন সময় মুচকি মুচকি হেসে শহ্‌র্-ইয়ার খাটের পৈথা দাঁড়াল।

বিজয়ী সেনাপতি যে রকম পদাতিকের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষে করেন, আমিও ঠিক তেমনি শহ্‌র্-ইয়ারকে যেন মেহেরবানী মনজু করে বললুম, 'বসতে পারেন।'

তারপরই ফাটলো আমার ঢাউস বেলুনটা!

শহ্‌র্-ইয়ার হাসি মুখে বললে, 'বলুন তো, আমরা কতবা আলোচনা করেছি—মুসলমান মেয়েদের পর্দার আড়াল থে বেরনো নিয়ে। পাল্লায় তুলেছি একদিকে সুবিধেগুলো, অন্য দি অসুবিধাগুলো এবং যেহেতু আমরা উভয়ই শেষ রক্তি তক্ ইমানদা সদাগর তাই কখনো আপনি বাটখারার পর বাটখারা চাপি গেছেন একদিকে আর আমি অন্য পাল্লায় চাপিয়ে গেছি মালের প মাল। তারপর হয়তো আপনি চাপিয়েছেন মাল আর আ

টখারা। তার অর্থ, আমাদের আলোচনার স্বপক্ষে বিপক্ষে যা যা ক্তি আমরা বের করেছি কেউ কোনোটা লুকিয়ে রাখি নি। নয় কি?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই। এ নিয়ে তো আমরা কেউ কোনো াকারের সন্দেহ এযাবত প্রকাশ করি নি। আপনার মনে কি ানো সন্দেহের উদয় হচ্ছে!'

শহ্‌র্-ইয়ার জিভ কেটে বললে, 'উপরে আল্লা; সন্দেহের াবকাশ নেই।

আমি শুধু এসেছিলুম আরেকটি অতি সদ্য আবিষ্কৃত যুক্তি নিয়ে যটা মুসলমান মেয়েদের অন্দর-ত্যাগের স্বপক্ষে যায়। আপনি তো সদিন আমাদের ভাগ্নীর জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের স্ত্রীধন, প্রচুর গয়না, এমন কি শেষ পর্যন্ত আইনে টেকে কি না টেকে এমন একটি শর্তও াগ্নীর সুবিধার জন্য আপনার সুললিত রসনা সঞ্চারণ করে বিস্তর দৌলত জয় করে—রূপকার্থে বলছি—লোহার সিন্দুকে তুলে াখলেন। আপনার ডাক্তার সে কেরদানী দেখে অচৈতন্য। াছে আপনার ন্যাজ মোটা হয় তাই তাঁর সবিস্তর প্রশস্তিগীতি আর াইবো না। তবে একটি বাক্য আপনাকে শোনাই। তিনি বললেন, "এরকম মধুর, ললিত বিদগ্ধ ভাষা ব্যবহার করে মানুষ যে নিষ্ঠুর কাবুলীওলার মত তার প্রাপ্যের অগুনতি গুণ বেশী চাইতে পারে—এ আমি স্বকর্ণে না শুনলে কক্‌খনো বিশ্বাস করতুম না।" তা সে যাক্। এইবারে আসল তত্ত্বটি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

আমাদের ভাগ্নী তো তার প্রাচীনপন্থী চাচার সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া করে যেতে আরম্ভ করলো কলেজে—অবশ্যই 'কালো তাঁবু' নামক বোরকা সর্বাঙ্গে লেপ্টে নয়। মেয়েটি যে বেহেশ্‌তের হুরীর মত খাপসুরত, তা নয়—তবে সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী আর চলাফেরায়, কথাবার্তা বলায় হায়া-শরম আছে। লেখা-পড়ায় খুবই ভালো, প্লেস পাবার সম্ভাবনাও কিছুটা আছে, এবং গোঁড়া চাচাটিকে না জানিয়ে হিন্দু বান্ধবীদের বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল ইসলাম ও অতুল-

প্রসাদের গানও বেশ খানিকটে আয়ত্ত করে ফেলল। গলাটি মি
তাই গানের ভুলচুকগুলো ওরই তলায় চাপা পড়ে যায়। চাচা
অবশ্য এসব কীর্তিকলাপের কিছুই জানেন না, শুধু মাঝে মা
দেরিতে বাড়ি ফিরলে একটুআধটু চোটপাট করেন। তাও খুব বে
না, কারণ তিনি কখনো কলেজে পড়েন নি, তদুপরি কুনো মানুষ-
তাই কলেজের কায়দা-কেতা, এমনিতে কখন, কলেজ ছুটি হ
ফান্‌কৃশন থাকলেই বা কখন, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ বে-খবর।

কিন্তু বাদবাকি দুনিয়াটা তো আর বেখেয়াল নয়। একটি এ
এ. ক্লাসের ছেলে তাকে লক্ষ্য করছিল বছর দুই ধরে। কারণ ভাগ্নী
যে-বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে গান শিখত ছেলেটি থাকে তার সামনে
বাড়িতেই। প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিল ভাগ্নীর মিষ্টি গলাটি শুনে, তারপ
সামান্য অনুসন্ধান করে তার সম্বন্ধে বাদবাকি খবর যোগা
করলো। বিবেচনা করি ছোকরা আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছি
যখন জানতে পারলো মেয়েটি তারই মত মুসলমান। ইতিমধ্যে
আবার এম. এ. পাস করে কোনো একটা কলেজের লেকচারার হ
গিয়েছে। তাকে তখন ঠেকায় কে?

ভাগ্নীর নাম ঠিকানা, তার সম্বন্ধে যাবতীয় বৃত্তান্ত তার চাচা
ভাবীকে বয়ান করে বললে, বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও—অব
সোজাসুজি না, কনে পক্ষের এক দূর আত্মীয়ের কাছে। আলাপচা
বেশ খানিকটে এগিয়ে যাওয়ার পর স্থির হলো, অমুক দিন বরপ
থেকে অমুক অমুক মুরুব্বী মহর্‌ ইত্যাদি স্থির করবার জন্য আমাদে
বাড়িতে আসবেন। ইতিমধ্যে অবশ্য ভাগ্নীর চাচা খবর নি
জেনেছেন ছেলেটি সত্যই অত্যুত্তম দুল্‌হার পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের এখানে এসে আলোচনা করার আগের দিন সেই দু
ভদ্রলোক—যাঁদের সঙ্গে পরে আপনি কথাবার্তা কইলেন—দুল্‌হা
বাপ মা এবং অতিশয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বসে আলোচ
করে জেনে নিলেন, মহর্‌, গয়নাগাটি, ফালতো শর্ত যদি আম

চাই ইত্যাদি তাবৎ আইটেমে তাঁরা কতখানি ম্যাকসিমামে উঠতে পারেন। এবং আকছারই এ-সব ক্ষেত্রে যা হয় তার ব্যত্যয়ও হলো না। রাত দুটো না তিনটে অবধি দফে দফে আলোচনা করার সময় বিস্তর মতভেদ, প্রচুর তর্কাতর্কি ততোধিক মনোমালিন্য হলো। দুল্‌হার চাচার অনেকগুলো ছেলে! তাঁর বক্তব্য—এবং সে-বক্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত—যে, তোমরা যদি আজ দরাজদিলে, মুক্তহস্তে বরপক্ষের দাবীদাওয়া মেনে নাও তবে আমার ছেলেগুলোর বিয়েতেও দুল্‌হিন পক্ষ এই বিয়ের নজির দেখিয়ে এরই অনুপাতে দাবী করে বসবে প্রচণ্ড মহর্‌, অষ্ট-অলঙ্কারের বদলে অষ্টগণ্ডা এবং খুদায় মালুম আর কি কি। অতএব সর্ববাবদে ম্যাকসিমামটা আরো নিচে নামাও, কলকাতায় দুল্‌হিনের অভাব নেই, তাঁরই পরিচিতদের ভিতরে এন্তার ডেনা-কাটা হুরীপরী রয়েছে।

সবাই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তাঁর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। অর্থনৈতিক চাপেই হোক বা সামাজিক যে কোনো কারণেই হোক, এখন মুসলমান মেয়ের অবস্থা প্রায় হিন্দু মেয়েরই মত। তাদেরই মত এখন বরপক্ষই জোরদার পক্ষ। দুল্‌হার চাচা তাঁর এতগুলো ছেলে নিয়ে তো রীতিমত ম্যারেজ মার্কেট কর্নার করবেন—এবং ঐ ধরনের আরো কত কী।

তা সে যা-ই হোক, রাত প্রায় দুটো না তিনটের সময় রফারফি হয়ে দফে দফে ম্যাকসিমামগুলো পিন্‌ ডাউন করা হলো।

এ সভাতে দুল্‌হার থাকার কথা নয়। সে ছিলও না। কিন্তু সামনের ঘরে তার চাচাতো ভাবীর সঙ্গে বসে আলোচনার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয় নি। সে গুম্‌ হয়ে বসে রইল।

পরদিন অতি ভোরে ভাবীর মারফত সে তার আব্বাকে খবর পাঠালে, দুল্‌হিন্‌ পক্ষের সর্ব দাবীদাওয়া যেন তাঁদের চাহিদা-মাফিক মেনে নেওয়া হয়। দুল্‌হা পক্ষের দর কষাকষির দরুন যদি শাদী ভেস্তে যায় তবে সে স্কলারশিপ নিয়ে নাক বরাবর বিলেত চলে যাবে

এবং কস্মিন কালেও এদেশে ফিরবে না। পক্ষান্তরে শাদী যদি হয়ে যায় তবে সে চাচাতো ভাইদের পরিবারের পছন্দমত জায়গায় তাদের শাদীর জিম্মাদারী এই বেলাই আপন্ স্কন্ধে নিচ্ছে।

প্রথমটায় তো লেগে গেল হৈহৈ রৈরৈ। কিন্তু বাপ-মা জানতেন, ছেলেটা ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে এবং চাচাও জানতেন তার কথার নড়চড় হয় না। ভাইদের বিয়ে সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছে সেটা রাখবেই। অতএব শেষটায় সেই দুই ভদ্রলোককে সর্ববাবদে আকাশ-ছোঁয়া ম্যাকসিমামের সর্ব এখতেয়ার দেওয়া হলো।

অবশ্য আপনার কেরদানি কিছু কম না।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'ব্যস্, ব্যস্ হয়েছে।'

শহ্‌র্-ইয়ার আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আহা! আপনি কেন বিরক্ত হচ্ছেন? আপনি না থাকলে আপনার ডাক্তার সাহস করে পাঁচ হাজারেরও মহ্‌র্ চাইতে পারতেন না। আর বরপক্ষ যে সুবোধ বালকদ্বয়ের ন্যায় আপনার সব তলব মেনে নেবে, এ তত্ত্বটা না জেনেই তো আপনি কনের জন্য বেস্ট্ টার্মস গুছিয়ে নিলেন! আচ্ছা, আমি কি বলি আর কি কই সে আপনি বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু শুনে রাখুন; ডাক্তারের ভাগ্নীবাড়িতে আপনার খ্যাতি রটেছে যে আপনি এমনই ত্রিকালজ্ঞ পীর সাহেব যে বরপক্ষের উপর এক ঝলক চোখ বোলাতে না বোলাতেই সাফসুৎরো অতিশয় পরিপাটি রূপে মালুম করে নিয়েছিলেন যে ওঁরা আপনার তলব মাত্র আপনার খেদমতে পেশ করার জন্য সঙ্গে ফ্লাস্কে করে বাঘের দুধ নিয়ে এসেছিল।'

বললুম, 'আপ্যায়িত হলুম এবং আজ সন্ধের গাড়িতেই আমি বোলপুর চললুম।'

শহ্‌র্-ইয়ার সেদিকে খেয়াল না দিয়ে বললে, 'কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয় নি। আমি কোন্ কথা দিয়ে আমার বয়ান আরম্ভ করেছিলুম মনে আছে?—মুসলমান মেয়ে অন্দরমহল

ত্যাগ করলে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা। এইবারে দেখুন, ডাক্তার সাহেবের ভাগ্নী যদি জনানা ত্যাগ করে কলেজ যাওয়া আরম্ভ না করতো তবে কি এরকম একটি উৎকৃষ্ট বরের নজরে পড়তো, এবং এরকম সসম্মানে তার বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারতো? ও যদি ম্যাট্রিকের পর চাচার সঙ্গে ফসাদ করে না বেরিয়ে পড়ে অন্দরমহলে বসে বসে দিন কাটাতো তবে কি তার চাচা মাথা খুঁড়েও এ-রকম একটি বর জোটাতে পারতেন?'

আমি বললুম, 'গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সেই কবে যে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সেটা স্মরণেই আসছে না। এদিকে আবার কলকাতা আর রাঢ়ের মুসলমানদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয় নি। তাই জানতে ইচ্ছে করে, আপনাদের ভিতরও মেয়ের জন্য বর যোগাড় করা কি একটা সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে?'

'আমাদের আত্মীয়-স্বজন তো নেই বললেই হয়; তবু যেটুকু খবর কানে আসে তার থেকে মনে হয়, কলকাতার মুসলমান সমাজের প্যাটার্ন ক্রমেই হিন্দু প্যাটার্নের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমান যুবকও চায়, তার স্ত্রী যেন শিক্ষিতা হয়, গানটান জানলে তো আরো ভালো, এবং সে নিজে যদি লেখাপড়ায় নাম করে থাকে তবে হয়তো মনে মনে এ-আশাও পোষণ করে যে শ্বশুর তাকে বিলেত পাঠাবে। তবে যতদূর জানি, এদের খাঁইগুলো এখনো রূঢ় কর্কশরূপে সমাজে প্রকাশ করা হয় না।'

আমি বললুম, 'সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু সমাজ ও তার প্যাট্যার্ন বদলে বদলে আমাদের কাছে চলে আসছে। আমার ছেলেবেলায় হিন্দুর পণপ্রথা যতখানি নির্দয় ছিল আজ তো নিশ্চয়ই ততখানি নয়। আর 'লভ্ ম্যারেজের' সংখ্যা যতই বাড়বে, পণপ্রথা ততই বাতিল হতে থাকবে।'

শহর্-ইয়ার বললে, 'আমার কিন্তু ভারি কৌতূহল হয়, এই যে হিন্দুরা ডিভোর্স, মনোগেমি, বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার এসব

আইন চালু করলো তার ফল আখেরে হিন্দু সমাজকে কি ভাবে পরিবর্তন করবে ?'

'গ্রামাঞ্চলে কিচ্ছুই হবে না। মনোগেমি ছাড়া আর দুটো আইন তো মুসলমানদের ছিলই। তবু আমাদের সমাজে ডিভোর্স হতো ক'টা ? বাপের সম্পত্তির হিস্যে নিয়ে ক'টা মেয়ে ভাইদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়েছে ? আর মনোগেমি আইন না থাকা সত্ত্বেও বাঙলাদেশের ক'টা মুসলমান ভদ্রলোক দুটো বউ পুষেছে ? হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হয়েছে প্রায় একশ বছর আগে। ভদ্র হিন্দু সমাজে তার ফলে প্রতি বৎসর ক'টা বিধবা-বিবাহ হয় ? না দিদি, এদেশের অদৃশ্য, অলিখিত আইন—মেয়েরা যেন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তা সে মুসলমানই হোক, আর হিন্দুই হোক।'

শহ্‌র্-ইয়ার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'বোধ হয় আপনার কথাই ঠিক।'

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, 'কিন্তু যা বললুম, তার সঙ্গে আমার আরেকটা কথা যোগ না দিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা সোজা বাঙলায় এই, বলি তো অনেক কথা, কিন্তু যখনই চিন্তা করি তখনই দেখি, আমাদের সমাজ যে কোন্ দিকে চলেছে তার কোনো-কিছুই অনুমান করতে পারছি না।'

শহ্‌র্-ইয়ার আমার সর্বশেষ মন্তব্যটি বোধহয় শুনতে পায় নি দেখি, দৃষ্টি যেন দেয়ালের ভিতর দিয়ে দূর দূরান্তর চলে গিয়েছে হঠাৎ বললে, 'এদেশের মেয়েরা আপন পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামান্যতম প্রতিবাদ জানাবে কি করে ? তার জন্য তো আপনার ঐ শ্রীরাধাই দায়ী। বৈষ্ণব কবিরাই তো তাঁকে শত শত গানে সহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ মূর্তিমতী প্রতিমারূপে নির্মাণ করে তুলেছেন। কৃষ্ণ তাঁর প্রতি যে অবিচার করে চলে গেলেন তাই নিয়ে তাঁর রোদনক্রন্দন হাহাকার আছে শতশত গানে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা বিদ্রোহ, অভিসম্পাত না হয় বাদই দিলুম, আছে কি কোনোখানে ?

উল্টে তিনি তো বসে রইলেন গালে হাত দিয়ে ঠাকুরের প্রতীক্ষায়। যদি তিনি কোনো দিন ফিরে আসেন! এই শ্রীরাধাই তো হলেন আমাদের হিন্দু প্রতিবেশিনীর আদর্শ!'

শহর্-ইয়ার গরম। অবশ্য মাত্রাধিক নয়।

আমি বললুম, 'সুন্দরী, আপনি এখন যা বললেন তার উত্তরে আমাকে একখানা পূর্ণাঙ্গ থীসিস ঝাড়তে হয়। অতিশয় সংক্ষেপে উত্তর দি।

ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবদের অন্ধকার যুগে—জাহিলীয়ায়—অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য রচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য সে কাব্যে ইসলামের একেশ্বরবাদ তো নেইই, যা আছে সে-সব জিনিস কেউ বিশ্বাস করলে তাকে আর মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে না, অথচ এসব কাব্য পড়েন শিক্ষিত আরব মাত্রই—তা সে তিনি ধার্মিক মৌলানাই হোন, আর সাদামাটা কাব্য-রসিকই হোন—কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যরূপে, অতি অবশ্যই তার থেকে ধর্মানুপ্রেরণা পাবার জন্য নয়। তাই আমার তাজ্জব লাগে, যখন এদেশের গোঁড়ারা আপত্তি তোলেন কোনো মুসলমান বালক বাঙলা সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য পড়লে। মধ্যযুগের একাধিক মুসলিম কবি বাণী-বন্দনা দিয়ে তাঁদের কাব্য রচনার গোড়াপত্তন করেছেন। অথচ কাব্যের গভীরে প্রবেশ করলেই দেখা যায়, এঁদের প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের মূল সরল নীতি বাঙলার মাধ্যমে প্রচার করা। আরেকটা উদাহরণ নিন। পরধর্ম বাবদে খৃষ্টান মিশনারিরা যে অত্যধিক সহিষ্ণু এ-কথা তাঁদের পরম শত্রুরাও বলবে না। অথচ এঁদের অধিকাংশই গ্রীক শেখার সময়—ঐ ভাষাটি না শিখে নিউ টেস্টামেণ্ট মূলে পড়ার উপায় নেই—বিস্তর দেবদেবীতে ভর্তি প্রাক-খৃষ্ট গ্রীক সাহিত্য গভীরতম শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েন। হাতের কাছের আরেকটা উদাহরণ নিন। ইরাণে ইসলাম আগমনের পূর্বে যেসব রাজা, বীর, প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী

লোকমুখে প্রচলিত ছিল, সেগুলো নিয়ে মুসলমান ফিরদৌসী লিখলেন তাঁর মহাকাব্য 'শাহনামা'—সে কাব্য পড়েন না কোন্ মৌলানা ?

আপনি হয়তো বলবেন, পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গ বিশেষ ; অতএব সে-সাহিত্য থেকে হিন্দু তার জীবনাদর্শ গ্রহণ করেন। উত্তম প্রস্তাব। আপনি ভাবছেন বাঙলার হিন্দু রমণী শ্রীরাধার কাছ থেকে তার সহিষ্ণুতা শিখেছে। কিন্তু কই, সে তো তারই অনুকরণে আপন স্বামী ত্যাগ করে অন্য পুরুষে হৃদয় দান করে না। এদেশের কোনো মেয়েরই প্রশংসা করতে হলে আমরা সর্বপ্রথমই বলি, 'আহা, কী সতী লক্ষ্মী মেয়েটি !'

অবশ্য এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব যোগ না করলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অনেকেই রূপক রূপে গ্রহণ করেন। রাধা মানবাত্মার প্রতীক। কৃষ্ণ পরমাত্মার। কৃষ্ণমিলনের জন্য রাধার হাহাকার আর পরমাত্মার কামনায় মানবাত্মার হাহাকার একই ক্রন্দন।

সূফীদের ভিতরেও ঐ জিনিসটি আছে। আপনি পাঁচজন মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর অন্তত চারজন বলবেন, হাফিজ যেখানে মদ্যপানের উল্লেখ করছেন সে মদ্য মদ্য নয়। সে মদ্য আল্লার প্রতি মহব্বৎ—ভগবদ্‌প্রেম। যে সাকী মদ্য বিতরণ করেন তিনি মুর্শীদ অর্থাৎ গুরু। তিনি শিষ্যকে মদ্যপানে আসক্ত করান—গূঢ়ার্থে আল্লার প্রেমে অচৈতন্য হতে, সেই চরম সত্তা পরমাত্মায় আপনা সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে শিক্ষা দেন।

পার্থিব প্রেমকে আধ্যাত্মিক প্রেমের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য খৃষ্টান এবং ইহুদি মিস্টিক—রহস্যবাদী—ভক্তও ঐ প্রতীকের শরণাপন্ন হন।

কিন্তু আপনি আমি—আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা কাব্য পড়ি কাব্য-রসের জন্য। আর কোনোদিন যদি আপনার ধর্মানুরাগ নিবিড়তর হয় তবে আপনার ভাবনা কি ? আপনার ঘরেই তো দেখলুম ইমাম গজ্জালীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' বাঙলা অনুবাদে।'

বারো

পরিপূর্ণ সুখশান্তির উপর অকস্মাৎ কী ভাবে বজ্রপাত হয়—এই আমার বিকটতম অভিজ্ঞতা।

ইতিমধ্যে আমি অভিমন্যুকে হার মানিয়ে, শহ্‌র্-ইয়ার ও ডাক্তার নির্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করে মোকামে ফিরে এসেছি।

আবার সেই খাড়াবড়ি-উচ্ছেতে যখন অধরোষ্ঠ পরিপূর্ণ বিতিক্ত তখন হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলুম, ডাক্তার পরিবার আমাকে যেন 'কট্' করেছে। আমি পর পর দু'খানা চিঠি লিখলুম শহ্‌র্-ইয়ারকে। কোনো উত্তর পেলুম না। এ যে নিদারুণ অবিশ্বাস্য! তখন লিখলুম ডাক্তারকে। অবিশ্বাস্যের তারতম্য হয়? হয়। এ যেন আরো অবিশ্বাস্য! এ যেন সেই প্রাচীন যুগের টেলিফোনে 'নো রিপ্লাই, মিস্?'

আমি কী হীন নীচ! যাক্‌গে চুলোয়। বলে যেই বারান্দায় বেরিয়েছি, দেখি, দূর থেকে মাঠ ঠেঙিয়ে আসছে ডাক্তার। আর তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে যাচ্ছে আমার আলসেশিয়ন 'মাষ্টার' তার রিজার্ভ স্পীডও ছেড়ে দিয়ে।

আমি বারান্দা ছেড়ে যেই রোদ্দুরে নামতে যাচ্ছি এমন সময় লক্ষ্য করলুম, দূর থেকে ডাক্তার হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আমি যেন অযথা এই কড়া রোদ্দুরে না নামি।

ডাক্তার পৌঁছল। লগেজ দূরের কথা, হাতে একটি এটাচি পর্যন্ত নেই।

এ-বাড়ির কর্তা দিলবরজান—কুক্-শেফ্-মেজরডমো—দুই মিনিটের ভিতর বালতি করে জল, সাবান গামছা ধুঁতুল, ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখলো। ডাক্তার তার আপন-জন। মনে নেই, কখন কোন্ বারে সে দিলবরের কোন্ এক মাসীকে বাঁচিয়ে ছায়!

ডাক্তারের চুল উস্কোখুস্কো। হাত দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। কপালে ঘামের ফোঁটা।

শুধু দেহের দিক দিয়ে, এ ধরনের অপ্রমত্ত, শান্তসমাহিতচিত্ত লোকও যে রাতারাতি হঠাৎ মৃগী রুগীর মত চেহারা ধারণ করতে পারে, এ যেন সূফী-সাধুর অকস্মাৎ মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে নীরব আর্তনাদ!

আমি এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম যে তাঁকে কুশল প্রশ্নও শুধোতে পারলুম না। কিংবা হয়তো আমার মগ্নচৈতন্য তার অতল থেকে কোনো প্রকারে প্রতিক্রিয়া আমার চৈতন্যলোকে পাঠাতে সম্মত হলো না। আর কুশল প্রশ্ন শুধোবই বা কি? যা দেখছি সে তো জড়ভরতও লক্ষ্য করতো। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আল্লা যেন হঠাৎ আমাকে আদেশ দিলেন। দিলবরজানকে বললুম, 'এখানে না। ওঁকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে চান করিয়ে, তাজা জামা কাপড় পরিয়ে নিয়ে আয়।'

যে ডাক্তার কারো কোনো প্রকারের সাহায্য নিতে সদাই কুণ্ঠিত, বিব্রত—বিদ্রোহী পর্যন্ত বলা চলে—সেই ডাক্তার কলের পুতুলের মত দিলবরের পিছনে পিছনে চলে গেল।

আমি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে শুধালুম—কি করে শুধালুম জানিনে—'শহ্‌র্-ইয়ার?'

যেন পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, ভালো আছে। না, ভুল বললুম। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে ঐ সংবাদটুকু দিলে।

তাহলে কি হয়েছে?

এরপর তাকে খাওয়াবার চেষ্টা, শোওয়াবার চেষ্টা, কথা বলাবার চেষ্টা—এসব নিষ্ফল প্রচেষ্টার পীড়াদায়ক বর্ণনা দিয়ে কে কাকে পীড়া দিতে চায়!

কোথা থেকে মানুষ কখন কি অনুপ্রেরণা পায় কে জানে? দিলবরকে বললুম, 'যাও, রিকশা নিয়ে এসো। আমরা কলকাতা

াচ্ছি। আর ডাক্তারের কোট পাতলুন আমার সুটকেসেই ভরে াও।' এ লোকটাকে আবার কাপড় ছাড়ানো—সে তো হবে ালট্রামডার্ন সোসাইটি লেডির রুগ্ন বাচ্চাকে সায়েবী কায়দায় বকার পাঁচবার কাপড় বদলানো।

আমি অন্ধভাবে বুঝতে পেরেছি, এখানে ডাক্তারকে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই। যা হবার হবে কলকাতায়। ডাক্তারের জীবন বলতে বোঝায় তার দুটি শ্বাস প্রশ্বাস—তার শহ্‌র্-ইয়ার আর তার রিসার্চ। এবং যেহেতু শহ্‌র্-ইয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আসে নি অতএব নিশ্চয়ই সে-ই। তবে যে ডাক্তার ঘাড় নেড়ে জানালে সে ঠিক আছে—ও, না, সে তো আমার অনুমান।

সঙ্গে নিলুম ইমাম গজ্জালীর কিমিয়া আর হুজবেরীর কশ্‌ফ্-অল্-মহজুব।

রিকশাতে উঠে ইচ্ছে করেই আরম্ভ করলুম, বকর বকর। কিন্তু সেটা মোটেই সহজ কর্ম হয় নি। আর সহজ কঠিন যাই হোক, ফল হলো সম্পূর্ণ বেকার। এ যেন ধূঁয়োর সঙ্গে কুয়াশার লড়াই। এমন কি তাতে করে ধূঁয়াশাও তৈরি হলো না।

ডাক্তার আচারনিষ্ঠ মুসলিম। তাই আরম্ভ করলুম ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যেন কিছুটা আত্মচিন্তা কিছুটা বক্তৃতা। একটা বিশেষ মতলব নিয়ে।

বললুম, 'আপনি তো ইমাম গজ্জালীর ভক্ত। তাঁর জীবনটাও ভারী অদ্ভুত। তিনি ছিলেন বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির—যে আমলে কি না, হয়তো এক চীন ছাড়া অন্য কোথাও ঐ 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ের' জুড়ি ছিল না—আমি অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যাপীঠের সমন্বয়কে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে ধরছি না। একে তো সর্বজনমান্য রেক্টর, তদুপরি শাস্ত্রীরূপে তিনি মুসলিম জগতে সর্বপ্রখ্যাত। রাজদত্ত অত্যুত্তম পোশাক পরিধান করে যেতেন রাজদরবারেও।

হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল গেল, এ সব তাবৎ কর্ম অর্থহীন—

বর্বরস্য শক্তিক্ষয়—ভ্যানিটি অব্ ভ্যানিটিস, অল্ ইজ ভ্যানিটি, বাইবেলের ভাষায়। সেই রাত্রেই মাত্র একখানা কম্বল নিয়ে বাগদাদ থেকে অন্তর্ধান। পৌঁছলেন গিয়ে সিরিয়ার দমশকশে—আশ্রয় নিলেন মসজিদে, ছদ্মনামে। সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন উচ্চস্তরের পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে একদিন শাস্ত্রালোচনা হতে হতে সেই পণ্ডিত বললেন, 'এ আবার আপনি কি বলছেন। স্বয়ং ইমাম গজ্জালীর মত সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেছেন ঠিক তার বিপরীত বাক্যটি!'

গজ্জালী ভাবলেন, আর এ-স্থলে থাকা নয়। কোন্ দিন এরা জেনে যাবে আমার প্রকৃত পরিচয়। আর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে আমার ধ্যানধারণার সর্ব অবসর।

সেই রাত্রেই অন্তর্ধান করলেন বয়তুল্ মুকদ্দস—জেরুজালেমের—দিকে। সেখান থেকে গেলেন ইহুদি, আরব, খৃষ্টান তিন কুলের পূর্ব-পুরুষ হজরৎ ইব্রাহিমের পুণ্য সমাধি দর্শন করে অশেষ পুণ্য লাভার্থে। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যে রকম পুণ্যতীর্থে দেবতাকে কোনো-কিছু প্রিয় খাদ্য বা অন্য-কিছু দান করে, ঠিক সেই রকম ইব্রাহিমের মোকামে মুসলমানরা একটা বা একাধিক শপথ নেয়। ইমাম নিলেন তিনটি। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল 'এ জীবনে আমি কোনো বিতর্কমূলক বাক্য (কন্‌ট্রভার্সিয়াল) উত্থাপন করবো না।'

এখানে এসে আমি চুপ করে গেলুম। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় কূট উদ্দেশ্য নিয়ে।

জয় হোক ভারতীয় রেলের! শতম্ জীব, সহস্রং জীব—ভারতীয় রেলের কর্মকর্তাগণ!

বোলপুর স্টেশন আমাকে দু'খানা ফার্স্টক্লাস টিকিট বেচলে।

দার্জিলিং মেল পৌঁছল—এই অতি সামান্য নস্যবৎ—দু'ঘণ্টা লেটে, যাকে বলে 'বিলম্বিত গাড়ীয়াঁদের' একটি হয়ে। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ফার্স্টক্লাস সব-ক'টা কামরা যে দার্জিলিং থেকেই

প্রতি আউন্‌স্‌ ভর্তি সে খবর না জেনে—খুব সম্ভব জেনেই—বোলপুর স্টেশন টিকিট বেচেছে। দার্জিলিঙের ক'গণ্ডা মেয়ে-ইস্কুলের ছুটি হয়েছে জানিনে—নীলে নীলে উর্দিপরা মেয়েরা কাঁঠাল বোঝাই করে ফেলেছে সব ক'টা কামরা।

সে দুঃস্বপ্ন আজ আর আমার নেই—কি করে কোন্ কামরায় উঠেছিলুম। খুব সম্ভব ক্যাট্‌ল্ ট্রাকে, কিংবা হয়তো এঞ্জিনের কারনেসে। একদিক দিয়ে ভালোই হল। সেই সঙ্কটময় অভিযানে দুজনা দুই কোণে ছিটকে পড়েছি। ডাক্তারের মনটাকে পুনরায় সজীব করার গুরুভার থেকে রেহাই পেলুম বটে, কিন্তু আমার মনটা ক্রমেই নির্জীব হতে লাগলো।

দিলবরকে বলেছিলুম কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল্ করতে। ডাক্তারদের সেই প্রাচীন দিনের গাড়িটা এত দিনে আমার বড় প্যারা হয়ে গিয়েছিল। সেও স্টেশনে আসে নি। দুঃখের দিনে নির্জীব প্রাণীও প্রিয়জনকে ত্যাগ করে বলেই কবি হাহাকার করেছেন—

তঙ্গ দস্তীমে কৌন্ কিসকা সাথ দেতা হৈ
কি তারিকী মেঁ সায়া ভী জুদা হোতা হৈ ইন্‌সাঁসে।
দুর্দিনে বলো, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয়?
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয়॥

অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। যে পুরো সম্পূর্ণ ফাঁকা উইংটি ঠাকুর্দাদের স্মরণে ডাক্তারের আদেশানুযায়ী চিরন্তন দেয়ালি উৎসব করতো সেটিও অন্ধকার। আমি আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। স্পষ্ট বোঝা গেল বেয়ারাই সেটা গোছগাছ করেছে। শহ্‌র্-ইয়ার কোথায়? কে জানে? আমি শুধালুম না। ডাক্তার বললেন, তিনি খাবেন না। ট্রেনের ভিড়ে সন্ধ্যার নামাজ পড়তে পারেন নি। এখন এষার নামাজ পড়ে ঘুমুবেন। কিন্তু শহ্‌র্-ইয়ার কোথায়, যার পরম পরিতৃপ্তি ছিল স্বহস্তে তাঁর নামাজের ব্যবস্থা করে দেবার?

আমি স্থির করলুম, ডাক্তার যতক্ষণ না নিজের থেকে কথা পাড়ে আমি কিছু শুধোবো না।

বিছানায় শুয়ে বই পড়ছি। এমন সময় আমার প্যারা বেয়ারা —শহ্‌র্-ইয়ারেরও—ঘরে ঢুকলো। অন্য সময় তার মুখে হাসিই লেগে থাকতো, আজ সে যন্ত্রের মত তার নৈমিত্তিক কর্তব্যগুলো করে যেতে লাগলো।

আমি খুব ভালো করেই জানি গৃহস্থের পারিবারিক ব্যাপার কারকুন-কর্মচারী সহচর-সেবকদের শুধোতে নেই, তবু বড় দুঃখে মনে পড়লো শহ্‌র্-ইয়ার দিলবরজানকে আমার আচার-অভ্যাস সম্বন্ধে একদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধিয়েছিল, যাতে করে আমি তাদের কলকাতার বাড়িতে এলে আমার কোনো অসুবিধা না হয়।

তবু দ্বিধাভরা মনে জমীল শেখকে শুধালুম, 'আমাদের ট্রাঙ্ক-কল সময়মত পৌঁছয় নি?'

'জী হাঁ, সে তো সন্ধ্যা সাতটার সময়ই। আমিই ধরেছিলুম।'

'তবে?'

প্রশ্নটার তাৎপর্য ঠিক বুঝেছে। বললে, 'মা জী বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তো দুপুর বেলাই গাড়ি নিয়ে তাঁর পীর সাহেবের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, আমি—'

শহ্‌র্-ইয়ারের পীর! বলে কি! হাবার মত শুধালুম, 'পীর!'

জমীল ঘাড় ফিরিয়ে যেন অতি অনিচ্ছায় অত্যন্ত আফসোস করে আস্তে আস্তে বললে, 'সেখানেই তো প্রায় সমস্ত দিন কাটান।' তারপর যতদূর সম্ভব আদব-ইনসানিয়ৎ বাঁচিয়ে, 'সালাম হুজুর, গরীবের বেয়াদবী মাফ করবেন' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আল্লার কসম খেয়ে বলছি, জমীল যদি বলতো, শহ্‌র্-ইয়ার আত্মহত্যা করেছে তা হলেও আমি এরকম বুড়বক্ বনে যেতুম না! শহ্‌র্-ইয়ার পীর ধরেছে! এ যে বাতুলের বাতুলতার চেয়েও অবিশ্বাস্য।

ধারণতম মুসলমান মেয়েরও নামাজ-রোজার প্রতি যেটুকু টান কে সেটুকুকেও ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিলেও যেটুকু থাকার সম্ভাবনা ও তো আমি শহ্‌র্-ইয়ারের কথাবার্তা চালচলনে কখনও দেখি নি। নিজেই আমাকে একাধিকবার বলেছে, তার দিল্ তার জান্, ার সবকিছুর এমারৎ দাঁড়িয়ে আছে—চৌষট খাম্বার উপর নয়— ীন্দ্রনাথের গানের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর। াখানে গুরুবাদই বা কোথায়, আর পীর সাহেব তো সেই হাজারো ম্ভের কোনো একটার পলস্তরা পর্যন্ত নন।

আর এই রমণীর মণি মমতার খনি— সে তো কিছু পাগলা ারদের ইম্‌বেসাইল নয় যে চায়ের কাপে জল ভরে, পেন্সিলের গায় সুতো-বঁড়শি লাগিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করবে! গুরু বুঝি তা লে চায়ের কাপ্, আর শহ্‌র্-ইয়ারের ভক্তি সেই পেন্সিলের বঁড়শি! াই দিয়ে সে ধরবে ভগবদ্-প্রেম, নজাৎ-মোক্ষ!

তাও বুঝতাম যদি তার বাউলদের দেহতত্ত্ব গীতে, লালন কীরের রহস্যবাদ-মারিফতী জনপদসঙ্গীতের প্রতি মমতা থাকতো! মন কি এই যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত, বাউল-গান—তার প্রতিও হ্‌র্-ইয়ারের বিশেষ কোনো মোহ নেই—সে-কথাও তো সে ামাকে স্পষ্ট বলেছে!

খাটে শুয়ে, বই হাতে নিয়ে পড়ছি, পাতার পর পাতা উল্টে াচ্ছি—তার এক বর্ণও মাথায় ঢুকছে না; ভাবছি শুধু শহ্‌র্-ইয়ারের থা, যাকে আল্লা মেহেরবানী করে আমার কাছে এনে দিলেন, যে ামার বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া!

রাত তখন এগারোটা। শহ্‌র্-ইয়ার ঘরে ঢুকলো।

তাকে কিভাবে দেখব, সে নিয়ে আমার মনে তোলপাড় হচ্ছিল খন থেকে শুনতে পেয়েছি, সে 'গুরু লাভ' করেছে।

যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে। শুধু পূর্বেকার মত যখন

খাটের পৈথানে এসে খাড়া কাঠের টুকরো ধরে দাঁড়ালো ত
স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, চোখ দুটোর উপর যেন অতি হাল্কা স্ব
দু'খানা ফিলমের মত কি রকম যেন কুয়াশা কুয়াশার ম
আবরণ। এ জিনিসটে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কা
কুয়াশাভাব থাকা সত্ত্বেও তাতে রয়েছে কেমন যেন একটা বিদ্র
দ্যোতি।

পীর-ভক্ত হওয়ার পূর্বে শহ্‌র্-ইয়ারের হার্দিক ও দৈহিক সৌ
একদিনে আমার কাছে স্বপ্রকাশ হয় নি। তার হাসি তার গা
দূর থেকে দেখা তার আপন মনে মনে একা একা তালসারির গা ঘে
ঘেঁষে ভ্রমণ, আমার বাড়ির দেড়তলাতে তার আবাস নির্মাণ, মুসলম
রমণীর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তার অভিমান—তার আরো কত ম
আহারশয্যাসনভোজন, কত কিছুর ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আম
পরিচয় হয়েছে। দিনে দিনে সে আমার কাছে সুন্দরের চেয়ে সুন
মধুরের চেয়ে মধুর হয়ে বিভাসিত হয়েছে।

আর আজ? আজ থেকে আবার তাকে নূতন করে চিন
হবে! এ যদি একেবারে নূতন মানুষ হতো তবে তো কো
ভাবনাই ছিল না। নূতন মানুষের সঙ্গে তো আমাদের জীবন
পরিচয় হয়। কোনো পুরনো মানুষকে আবার নূতন করে চেন
সামান্য লেখক হিসাবে বলতে পারি: নূতন লেখা তো দু'দিন অ
অন্তরই লিখতে হয়, কিন্তু কোনো একটা লেখা যদি হারিয়ে য
এবং সেইটেই আবার নূতন করে লিখতে হয়, তখন যা যন্ত্র
ভিতর দিয়ে যেতে হয় সে-তত্ত্বটা শুধোন গিয়ে—আমাকে না
খ্যাতনামা লেখকদের।

এর চেয়েও সোজা উদাহরণ দি। আপনি রইলেন পড়ে দে
বন্ধু বিলেত থেকে ফিরলেন পাঁচ বছর পরে। তার সঙ্গে ফের ব
জমাতে গিয়ে খান নি মার?

আশ্চর্য! এখনো শুধোলে না, আমার কোনো অসুবিধা হয়

খাওয়া-দাওয়া কি রকম হয়েছে—কিছুই না। না, আমি শ্চর্য হই নি। আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পেরেছি।

আমি স্থির করেছি আমি কোনো ফরিয়াদ করবো না—চিঠির ত্তর দিলে না কেন, আপন হাতে প্রত্যেকটি জিনিস বেছে বেছে—ত কিছু কলকাতা থেকে সঙ্গে এনে—আমার বাড়ির দেড়তলাতে তোমার বাড়ি বানালে সেটা এরকম ছেঁড়া চটিজুতোর মত বলে না কয়ে হঠাৎ এরকম উৎখাত করে দিলে কেন; না না, ছু শুধোবো না। আমি ভাবখানা করবো, সে হঠাৎ যেন কোনো তিমখানা বা নাইটইস্কুলে এমনই মেতে গিয়েছিল যে আমার ত্বতাবাস করতে পারে নি। সমস্তটা সহজভাবেই গ্রহণ করবো। ন্তু হায়, সহজ হওয়া কি এতই সহজ? সহজিয়া ধর্মের মূল মন্ত্র হজ হবি, সহজ হবি'—সেটা যদি অতই সহজ হবে তবে বিশ্বসংসারে াবৎ ধার্মিক অধার্মিক সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ঐ ধর্মই গ্রহণ করলো কেন?

ওদিকে হৃদয় ভরে আছে অভিমানের বেদনায়।

এ-রমণীর সঙ্গে যদি আমার সম্পর্ক প্রণয়ের হতো তবে তার জকের অবহেলা আমার হৃদয়ে অন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। প্রম তো পূর্ণচন্দ্র। তাই তার চন্দ্র-গ্রহণও হয়। কিন্তু বন্ধুত্বও ক্লপক্ষের চন্দ্রমার মত রাতে রাতে বাড়ে এবং চতুর্দশীতে এসে ামে। পূর্ণিমাতে পৌঁছায় না। তাই তার গ্রহণ নেই ক্ষয়ও নেই, ক্লপক্ষও নেই। তবে আমাদের বন্ধুত্বের উপর এ কিসের করাল ায়া!

কিন্তু অতশত চিন্তা করার পূর্বেই প্রাচীন দিনের অভ্যাস মত খ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কি পড়ছো, আজকাল?' ঐটেই ছিল ামাদের প্রিয় অবতরণিকা—যা দিয়ে 'মুখবন্ধ' নয়, মুখ খোলা হতো।

বললুম, 'বসো।'

কেমন যেন সঙ্কোচের সঙ্গে খাটের বাজুতে বসলো।

এই মেয়েই না একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পদসেবা করতে চেয়েছিল!

তবে কি পীরের মানা—গুরুর বারণ—পরপুরুষস্পর্শ বিষবৎ বর্জনীয়?

নিকুচি, নিকুচি। পীরের গুষ্টি আর গুরুর দঙ্গল!

'অভিমানের বদলেতে নেব তোমার মালা' এ-সব মরমিয়া মাল আমার তরে নয়। আমার হলো রাগ। এই নিষ্পাপ শিশুটিকে কে শেখালে এইসব কাল্পনিক পাপ? কে সে পীর? তাকে একবার দেখে নিতে হবে। কিন্তু পীরের নিকুচি যতই করি না কেন, আমার ঠাকুরদা থেকে ঊর্ধ্বতম ক'পুরুষ যে পীর ছিলেন সে তত্ত্ব অদ্যাপিও বিলক্ষণ অবগত আছে তরফ্ পরগনার কিছু কিছু চাষাভুষো মোল্লামুনশী। এরা বংশানুক্রমে আমাদের পরিবারের শিষ্য। কিন্তু আমার পিতা এবং আমার অগ্রজেরা পীর হতে রাজী হলেন না বলে এদের অধিকাংশই অন্য পীরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু গুরুভক্তি শুধু গুরুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সে-ভক্তি গুরুর বংশধরগণকেও নিষ্কৃতি দেয় না; তাই এদের কয়েকটি পরিবার অন্য পীর বরণ না করে দু'তিন পুরুষ ধরে অবিশ্বাস্য ধৈর্য ধরে বসে আছে, আমার দাদাদের বা আমার বেটা-নাতি যদি সদয় হয়ে কোনো এক দিন এদের বেটা-নাতিদের শাগির্দ-(সাকরেদ) রূপে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে-পীর বাঙলাদেশে এসে আমাদের বংশ স্থাপনা করেন তাঁর দর্গাতে এই সব প্রতীক্ষমাণ সাকরেদরা শিনী চড়াচ্ছে, ফুল সাজাচ্ছে, মানত মানছে।

মাত্র এই দু'পুরুষ—আমার পিতা আর আমরা তিন ভাই—পীর হতে রাজী হই নি। তাই বলে চোদ্দপুরুষ যে-সব ধ্যানধারণা করেছে, সাকরেদদের দীক্ষা দিয়েছে, ধর্মপথে চালিয়েছে সেটা কি দু'পুরুষেই আমার রক্ত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? হাঁসকে দু'পুরুষ খাঁচায় বন্ধ রাখার পর তৃতীয় পুরুষের বাচ্চাদের জলে ছেড়ে দিলে কি তারা সাঁতার না কাটতে পেরে পাতর-বাটির মত জলে ডুবে মরবে!

এই তো মাত্র দু'তিন বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ আমার উপর হামলা করে অনুরোধ—আদেশও বলতে পারেন—করলেন, পৌষমেলা ও সমাবর্তন উৎসবের প্রাক্কালে যে সাম্বৎসরিক উপাসনা করা হয় তাতে আচার্যের আসন গ্রহণ করতে। আমি সাতিশয় সবিনয় সবিস্তর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম। ওঁদের বলি নি কিন্তু আমি মনে মনে জানি এসব কর্ম ক'রে পুরুত-মোল্লারা পেটের অন্ন জোটায়—অবশ্য এ-স্থলে এঁরা আমাকে একটি কানাকড়িও দেবেন না, সে-কথা আমি বিলক্ষণ অবগত ছিলুম। আবার এ তথ্যও তো জানি যে, বিপদে-আপদে কাছেপিঠে নিতান্তই কোনো মোল্লা-মুন্‌শী ছিল না বলে আমার পিতৃপুরুষ এ-সব ক্রিয়াকর্ম কালেকস্মিনে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমাধান করেছেন। পূর্বেই বলেছি, তবুও আমি আপত্তি জানিয়েছিলুম। তখন কর্তৃপক্ষ তাঁদের আখেরী মোক্ষম বজ্রবাণ ছেড়ে বললেন, আমারই উপর ভরসা করে তাঁরা অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নি; এই শেষ মুহূর্তে অন্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার সন্দেহপিচেশ মন অনুমান করলো, অন্য কোনো ডাঙর চাঁইকে হয়তো কর্তারা কাবু করে রেখেছিলেন এবং তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে খবর পাঠিয়ে কর্তাদের সমূহ বিপদে ফেলেছেন। বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়। তাই এসেছেন অধমের কাছে। অবশ্য এনরা শয়তান নন, আস্তো মাছি নই। আমি শুধু রিলেটিভিটি সিম্‌প্লিফাইড থ্রু প্রভার্ব বোঝাবার জন্য এই প্রবাদটি উদ্ধৃত করলুম।

তখন অবশ্য আমি তিন কবুল পড়ে মুসলমান যে-রকম বিয়ে করে সে-রকম ধারা আমার সম্মতি দিলুম।

এটা আমার 'পীরত্ব' প্রমাণ করার জন্য শহর্-ইয়ারকে বলবোই বলবো। সে কোন্ দম্ভভরে চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছে যে তার পীরই ইহলোক পরলোকের একমাত্র পীর! আমি সপ্রমাণ করে ছাড়বো, বেলাভূমিতে তাঁর পীরই একমাত্র মুড়ি নন্, আরো 'বিস্তরে বিস্তর'

আছে, এবং আমি তো রীতিমত একটা বোল্‌ডার—এ্যাব্বড়া পাথরের চাঁই।

অবশ্য সেও ধুরন্ধরী। সে যদি শুধোয়, শান্তিনিকেতনে আচার্যের কর্ম আমি কি ভাবে সমাধান করলুম তখন আমি কিচ্ছুটি না বলে সাক্ষী মানবো কলকাতার একখানি অতি প্রখ্যাত দৈনিকের সম্পাদক মহাশয়কে। তিনি সে-উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন।

গতানুগতিক সাধারণ অবস্থায় আমি আত্মচিন্তার জন্য এতখানি ফুরসৎ পেতুম না। ইতিমধ্যে শহর্‌-ইয়ারের সফেন বুদ্‌বুদিত চিত্ত কথায় কথায় বকবকানিতে ফেটে পড়তো। কিংবা তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে ফেলত—তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রত্যেকটি অসমাপ্ত রেখে।

এমন কি, এদানির সে কি পড়ছে, আমার সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরও এ-তাবৎ সে দেয় নি।

আমি বললুম, 'জানো, শহর্‌-ইয়ার, আমার চতুর্দশ পুরুষ কিংবা ততোধিক ছিলেন পীর—সূফী?'

এতক্ষণ অবধি শহর্‌-ইয়ার ছিল আপন মনের গভীর গহনে আত্মচিন্তায় নিমগ্না। "পীর," "সূফী" এ-দুটি শব্দ তার কানে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো। তার নিষ্প্রভ, কুয়াশা-মাখা চোখ দুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দিনের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফুটলো যেন হোঁচট খেতে খেতে।

শুধোলো, 'সে—সে—সে কি? আপনি—আপনি—আপনি তো আমাকে কখনো বলেন নি। কি বললেন?—সূফী?'

আমি তন্মুহূর্তেই বুঝে গেলুম, শহর্‌-ইয়ারের পীর তাকে সূফী-মার্গে দীক্ষিত করেছেন। কিংবা চেষ্টা করছেন।

আমি কিন্তু অত সহজে ধরা দেব না। তুমি কি আমার কানু যে, বাঁশী শুনেই উদোম হয়ে ছুটবো!

আমি প্রাচীন দিনের চটুলতা আনবার ভান করে বললুম, 'তা,

আমি তো কখনো বলি নি—তুমিও শুধোও নি—আমি প্রথম যৌবনে ক'বার প্রেমে পড়েছিলুম, তুমি তো কখনো শুধোও নি—'

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করে মনে মনে কিছুটা তৃপ্তি পেলুম। শহ্‌র্-ইয়ারের গুরু তাকে অজগরের মত আষ্টেপৃষ্টে পেঁচিয়ে ধরতে পারেন নি। নইলে অন্য গুরু অন্য সূফী সম্বন্ধে সে কণামাত্র কৌতূহল দেখাতো না। বরঞ্চ এ-স্থলে কুরুচিরা মাত্রই অন্য গুরুর কথা উঠলেই তাকে নস্যাৎ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রাচীন দিনের আপ্তবাক্য মনে এল—অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করেও আপন পিতার প্রশংসা করা যায়।

ওদিকে দেখি, শহ্‌র্-ইয়ার আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর এই সর্বপ্রথম দেখলুম, আমার 'রসিকতা' প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার সদা শান্ত ভালের এক প্রান্তে, আঁখিকোণে যেন সামান্যতম অসহিষ্ণুতার ভ্রূকুঞ্চন পরশ লাগিয়ে চলে গেল।

আর দুঃখ হলো এই দেখে যে, যে-শহ্‌র্-ইয়ার আমার ভোঁতা রসিকতাতেও একটুখানি সদয় স্মিতহাস্য করতো—দু'একবার বলেওছে, "এটা কিন্তু জুতসই হলো না"—সে আজ রসিকতার পুকুরে (মানছি, ঘোলা জলের এঁদোপুকুরে) যেন সাক্ষাৎ পরমহংসিনী হয়ে গিয়েছেন!

এ-অভিজ্ঞতা আমার বহুকালের। যে-কোনো-কিছুতেই মানুষ মজে গিয়ে সিরিয়স হলেই সবচেয়ে সর্বপ্রথম তার লোপ পায় রসবোধ। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ প্রেমের বেলা। রসে টইটম্বুর পাড়ার সুকুমার যখন প্রথম প্রেমে পড়ে—ইংরিজিতে যাকে বলে 'কাফ লভ্'—তখন তাকে যদি আপনি কোনো-কিছু না জেনেশুনে নিতান্ত হার্মলেসলি শুধোন 'কি হে মুখখানা এত শুকনো কেন?' সে তখন সেই কাঠিয়াওয়াড়ি চাষার মত তেড়ে বলবে, 'শুখ্-শুখ্‌কে লকড়ি বন্ জাউংগা—তেরা ক্যা শালা।'

ধর্মরাজ্যে আমাদের অখণ্ডসৌভাগ্যবতী খাজিস্তে-বানু মুসম্মৎ বেগম শহ্‌র্-ইয়ার—আল্লা তাঁর শান্-শওকৎ লুৎফ্-নজাকৎ হাজার

চন্দ্‌ বৃদ্ধি করুন !—কোন্‌ গৌরীশঙ্করের শীর্ষদেশে তথাগতা হয়েছেন সে জানেন তাঁর অধুনালব্ধ পীর সাহেব ; আমার কিন্তু এ তত্ত্ব বিলক্ষণ মালুম হচ্ছে, বীবীজান তাঁর স্বামী এস্তেক বাড়ির খানসামা-বাবুর্চি এবং আর পাঁচজনের লবেজান করে এনেছেন তো বটেই, আমার সঙ্গে তাঁর যে রসে রসে ভরা রসের মিতালী দিনে দিনে গড়ে উঠছিল সেই শিশু নীপতরুটি অধুনা অবহেলার খর তপনে বিবর্ণ পাণ্ডুর ; আসন্ন কালবৈশাখীতে ধূলিদলিতা এবং শ্রাবণে হবে কর্দমমর্দিতা।

শান্তকণ্ঠে বললুম, 'তুমিই তো আমাকে একাধিকবার বলেছ—এখন মনে হচ্ছে, তাতে হয়তো সামান্য বিষাদের সুর মাখানো ছিল—যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত তোমার বুকে তুফান তোলে না। অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই শ্লাঘার সঙ্গে নিজেকে ধন্য মেনেছ যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম প্রকৃতির গান তোমার অস্থিমজ্জা তোমার অনিন্দ্যমোহন চিন্ময় ভুবন নির্মাণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সেই ধর্মসঙ্গীত এবারে একটু কান পেতে শোনো তো।

আমাদের পরিবারে একাধিক সাধক সুফীমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। এ-পন্থার শেষ পথচারিণী ছিল আমার ছোট বোন সৈয়েদা হবীবুন্নেসা, সে এখন ও-পারে। আমার এক ভাগ্নী ঢাকাতে বাংলার অধ্যাপনা করে। সে তার সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখেছে। আমার এই বোনটি আবার ছিল সিলেটের 'পীরানী'। প্রতি ভোরে তার বাড়ির সামনে জমে যেত মেয়েছেলেদের ভিড়। তারা এসেছে বোনের দোওয়া নিতে কাচ্চাবাচ্চাদের অসুখ সারানোর জন্য, বন্ধ্যারা এসেছে মা হবার জন্য, আরো কত কী! আমার বোন তাজিব-কবজ পানি-পড়া কিচ্ছুটি দিত না। এক এক জন করে মেয়েরা ঘরে ঢুকতো আর সে শুধু আশীর্বাদ করতো। বহুকাল ধরে, কেন জানিনে, সে শয্যাগ্রহণ করেছিল। শুয়ে শুয়ে গুনগুন করে

গান গাইত। সূফীতত্ত্বের মারিফতী গান। এবং নিজেই সুর দিয়ে অনেকগুলো গান রচেছিল। ঢাকা বেতার মাঝে মাঝে সেগুলো শোনায়। তার একটা গীতিসঙ্কলন আমার আব্বা প্রকাশ করেন। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি বলছিলুম—'

শহ্‌র্-ইয়ার প্রাচীন দিনের দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললে, 'না। আপনার বোনের কথা বলুন।'

আমি দৃঢ়তর কণ্ঠে বললুম, 'না।' আমিও এখন তপ্ত গরম। তুমি যদি গুরু নিয়ে মেতে উঠে আপন-জন, বেগানা-জন সর্বজনকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারো, তবে আমিও তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তারও বেশী অবহেলা করতে পারি।

বললুম, 'তুমি প্রশ্ন শুধিয়েছিলে, আমাদের পরিবারের সূফীদের সম্বন্ধে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু বললুম। নইলে কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনমান্য ধর্মসঙ্গীত—আফ্‌টার অল্, গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীতই তো তাঁকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দেয়—আর কোথায় আমার ছোট বোনের মারিফতী সূফীগীতি?'

আমি কিন্তু তখন মনে মনে বেশ খানিকটে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছি। বীবীকে যে তাঁর আকস্মিক ধর্মোন্মত্তার কচ্ছপের খোল থেকে (তওবা! তওবা!! কাছিম আমাদের কাছে হারাম—পাপবিদ্ধ অপবিত্র—না হলেও মকরূহ, অর্থাৎ বর্জনীয়) বের করতে পেরেছি সেটাও তো কিছু হেলাফেলার ফেলনা নয়।

যদিও আমি নম্রা শান্তা সূফী-কন্যার অগ্রজ তবু তুর্ক্-সিপাহীর মোগলাই কণ্ঠে আদেশ দিলুম, 'ঐ রেকর্ডটা বাজাও তো—

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে"॥'

শহ্‌র্-ইয়ার রেকর্ডটি লাগালো। এতদিন অন্য গানের বেলা

মাঝে মাঝে সে যে-রকম গুনগুন করতো, এ-গানে সে সেটা করলে না। ধর্মসঙ্গীত তার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে সেটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারলুম না।

গান শেষ হলে বললুম, 'জানো শহ্‌র্-ইয়ার, এ-গানেরই একটি লোকায়ত রূপ আছে :—

জ্ঞানের অগম্য তুমি, প্রেমের ভিখারী।
দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি॥
কোথায় তোমার ছত্রদণ্ড কোথায় সিংহাসন।
পাতকীর চরণতলে লুটায় আসন॥'

শহ্‌র্-ইয়ার কোনো কিছু বলার পূর্বেই আমি আদেশ দিলুম, 'অনেক রাত হয়েছে ; ঘুমুতে যাও।'

আসলে শহ্‌র্-ইয়ার এখন ধর্মপথে স্বপনচারিণী। পরিপূর্ণ সুষুপ্ত অবস্থায় কোনো কোনো মুদ্রিতাঁখি নারী পুরুষ দৃঢ়পদক্ষেপে ভয় নির্ভয়াতীত অবস্থায় ভ্রমণ করে সংকীর্ণতম আলিসার উপর দিয়ে—কোন্ বিধাতা বা অপদেবতার অদৃশ্য করাঙ্গুলি সঙ্কেতে কে জানে ? এই স্বপনচারীর হাল তখন বড়ই নাজুক এবং সঙ্কটময়। অকস্মাৎ কেউ তখন তার নাম ধরে ডেকে উঠলে বা তার গাত্রস্পর্শ করলে সে তার সম্মোহিত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সেই মুহূর্তেই কোনো একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে ওঠাটা মোটেই অসম্ভব নয়।

শহ্‌র্-ইয়ার এখন যে ক্ষুরস্য ধারা সূফীরহস্যের কেশ-পরিমাণ সংকীর্ণ পথের উপর দিয়ে এই নব অভিযানে বেরিয়েছে—অর্ধসম্মোহিত অর্ধসচেতনাবস্থায়—তাকে এখন আকস্মিক তর্ক-মুদ্গর দ্বারা সচকিত জাগরণে ফিরিয়ে আনা কি আদৌ সমীচীন হবে ?—যদ্যপি সেটা আদপেই সম্ভবে।

কিন্তু প্রশ্ন, তাকে জাগাতে যাবো কেন ? নিতান্ত জড়বাদী চার্বাকপন্থী ভিন্ন এ দায়িত্ব নেবে কোন্ সবজান্তা প্যাকস্বর ! হয়তো সে সত্য পথেই চলেছে। তদুপরি আমার জানা আছে, খৃষ্টান, মুসলিম,

জৈন-বৌদ্ধ, হিন্দু ভক্তি-তত্ত্বের বহু তথাগত মহাত্মা বলে গেছেন, এ-মার্গে পদার্পণ করার প্রথম অবস্থায়—অবতরণিকায়—প্রায় প্রত্যেক সত্য সাধকই অল্পাধিককাল মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটায়। সামান্য মানবীর প্রেমমুগ্ধ দাস্তেও নাকি মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় দিক্‌-ভ্রান্তের মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। আর এ নারী তো মুগ্ধা সবচেয়ে 'সর্বনেশে' প্রেমে।

কিংবা এ-নারী কি এখন দ্বিতীয় মন্‌জিলে—খৃষ্টান মিস্টিকরা যাকে বলে মেনশন? এখানে নাকি আসে এ্যারিডিটি—উষরতা, অনুর্বরতা। জগদ্বল্লভ নাকি ভক্তকে গোড়ার দিকেই এক ঝলক 'দর্শন' দিয়ে মিলিয়ে যান। শ্রীরাধা তাঁর বল্লভ রসরাজের সঙ্গসুখ কতকাল পেয়েছিলেন সেটা পরবর্তীকালে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর—তিনি নিজেই বলতে পারতেন না। সিলেটের একাধিক গ্রাম্যগীতিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার মরম তাঁর স্মরণে বলে আমি তাঁকে পেয়েছি ঐটুকু সময়ের তরে বিদ্যুল্লতার পৃথ্বীতলে পৌঁছতে যতখানি সময় লাগে।' তারপরই আরম্ভ হয় আকুলি-বিকুলি।

বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের মধুরা-গমন এবং সাধককে একবার ক্ষণতরে 'দর্শন' দিয়ে জগদ্বল্লভের অন্তর্ধান—সম্পূর্ণ একই ঘটনা।

তখন সেই উষরকালে সর্বপ্রেমিকই প্রেমিকাই আর 'গৃহবাসিনী' হয়ে থাকতে চায় না, তার 'কোন্ প্রয়োজন রজত কাঞ্চন', সে তখন 'গেরুয়া বসন অঙ্গেতে' ধরে তার স্নেহময়ী মাতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে।

শহ্‌র্-ইয়ার যে আত্মজন প্রিয়জনকে অবহেলা করেছে সেটা তো সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় নয়।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের জন্য, ক্যাথলিক নান্‌-দের জন্য যে রকম সংঘ মনাস্‌টরি আছে, মুসলমান রমণীর জন্য সে-রকম কিছু একটা থাকলে এতদিনে হয়তো সে সেখানে আশ্রয় নিয়ে নিত। জীবন কাটাতো ধ্যানধারণায়, উপবাস-কৃচ্ছ্রসাধনে, জনসেবায়—

সেবা ?

আমি যে এতক্ষণ শহ্‌র্-ইয়ারের সমর্থনে যুক্তিতর্ক দিয়ে মহলের পর মহল গড়ে তুলছিলুম সেই চিন্ময় এমারৎ এক লহমায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে ধূলিদলিত—মাত্র একটি শব্দের অনধিকার প্রবেশে। 'সেবা'!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, নবীন সাধকের প্রতি সূফী সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হুজবেরীর প্রত্যাদেশ :—

সাধনার প্রথম বৎসর মানুষের সেবা করবে,
দ্বিতীয় বৎসরে আল্লার সেবা করবে,
তৃতীয় বৎসরে আত্মদর্শনে নিয়োজিত হবে।

ডাক্তার, আমি, বাড়ির এত যে খেদমৎগার সুবো-শাম শহ্‌র্-ইয়ারের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, তাকে সত্যকার মা জেনে আম্মা বলে ডাকে—আমরা কি মানুষ নই ? সাধনার প্রথম বৎসরে তো মানুষের সেবা করারই প্রত্যাদেশ।

একদা শহ্‌র্-ইয়ারকে বলেছিলুম, তোমার সর্বাঙ্গসুন্দর বেশভূষা হবে তোমার স্বামীর জন্য। আর আজ যদি তুমি সর্বসুন্দরের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করো, তবে তার সর্বপ্রথম সর্বোত্তম সেবা পাবে তোমার স্বামী।

তেরো

খুব বেশীক্ষণ আত্মচিন্তা করি নি। দেহের ক্লান্তি তো ছিলই, তদুপরি ডাক্তারের বিপাক-বিহ্বলতা, শহর্-ইয়ারের দূরত্ব-দূরত্ব ভাব আমার মনকেও অসাড় করে তুলেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম অল্পক্ষণের মধ্যেই। হজরত পয়গম্বর নাকি বলেছেন—যদিও তাঁর বাক্যটি কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে আমি স্বচক্ষে দেখি নি—'মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ।' কিন্তু মূর্খের নিদ্রা কোন্ পর্যায়ে পড়ে সে-সম্বন্ধে কোনো আপ্তবাক্য আমি এ-তাবৎ শুনি নি, শাস্ত্রেও দেখি নি। আমি মূর্খ। জাগ্রতাবস্থায় আমার পাপাত্মা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে না। তাই বোধহয় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় তাঁর নামগান শুনিয়ে দেন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে সম্পূর্ণ সচেতন হলুম।

শুনতে পেলুম, বেশ কিছুটা দূর থেকে অতি মধুর কণ্ঠে জপগীতি :

ইয়া লতীফুল্ / তুক্‌বি না।
নাহ্নু'বিদক্ / কুল্লি না॥

আরবী ভাষার দোঁহা।

হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য আমাদেরকে দাও।

(কারণ) আমরা তোমার পূজারী, আমরা সকলেই।

আমার মনে ধোঁকা লাগল, শহর্-ইয়ার কি এ দোঁহাটির গভীরে পৌঁছে পুরোপুরি মর্মার্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে?

যে আল্লাকে এ-স্থলে আহ্বান করা হচ্ছে তিনি 'লতীফ'। শব্দটি সুন্দর এবং করুণাময় দুই অর্থই ধরে। অর্থাৎ একই শব্দে তাঁকে 'শিবম্' ও 'সুন্দরম্' বলা হচ্ছে। এখানে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে 'উল্‌তুফ'।

এর একটি অর্থ সরল—'তুমি করুণাময় হও' ('বি' 'না'—আমাদের

প্রতি) কিন্তু অন্য অর্থ—'তোমার সৌরভ আমাদের প্রতি বিকিরণ করো' কিংবা / এবং 'আমাদেরকেও সুন্দর করে তোলো।'

আল্লার বহু গুণ বোঝাবার জন্য মানুষ তাঁকে বহু নাম দিয়েছে। কিন্তু সূফীদের কাছে তিনি 'হক্‌ক্', অর্থাৎ 'সত্যম্'। প্রখ্যাত সূফী মনসূর অল্-হল্লাজ 'আনাল্ হক্‌ক্', অর্থাৎ 'আমিই সত্য' 'আমিই ব্রহ্ম' প্রচার করার দরুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে, যখন তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্তিত হয় তখন প্রতি খণ্ড থেকে রব ওঠে 'আনাল্ হক্‌ক্, আনাল্ হক্‌ক্!'

শহ্‌র্-ইয়ার 'সত্যের' সন্ধানে বেরিয়েছে, না সুন্দরের সন্ধানে?

তার ললিত কণ্ঠের করুণ জপের ('জিক্‌র্'):

'—সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর।
.....আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতম আরম্ভের মঙ্গল বারতা।'

কিন্তু আপন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্য করলুম শহ্‌র্-ইয়ারের কণ্ঠস্বর তাদের শোবার ঘর থেকে আসছে না। তবে কি সে স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করেছে! ইসলামের আইন-অনুযায়ী সে তো তা পারে না, তার স্বামীও পারে না।

কিন্তু আমিই বা ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছি কেন?

হয়তো ত্রিযামাযামিনীব্যাপী তার জিক্‌র্ স্বামীর নিদ্রাকে ব্যাঘাত করবে বলে সে অন্য কামরায় আশ্রয় নিয়েছে।

অবসন্ন মনে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। রাত্রির কলকাতার আকাশ যেন নির্গুণ ব্রহ্ম। কোনোরকম পরিবর্তন তার হয় না। সদাই একই, কেমন যেন হিমানীর গ্লানি-মাখা পাণ্ডুর ধূসর। শুনেছি, যুদ্ধের সময় নাকি ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে কলকাতার 'মডার্ন' কবিরা জীবনে প্রথম চন্দ্রমা দেখতে পান, এবং ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন।

এটা কাল সকালেই শহ্‌র্-ইয়ারকে বলতে হবে। সে আকছারই গবিতা' নিয়ে টকঝাল ফোঁড়ন কাটে—ওদিকে এসব আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েও। একদিন বিষাদমাখা সুরে আমাকে বলেছিল, 'আমি যে-এ-সব কবিতাতে রস পাইনে তার জন্য কি আমার দুঃখ হয় না? আমি এরই মধ্যে এত বুড়িয়ে গেলুম কি করে যে নবীনদের সুর আমার প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না?'

তখন হঠাৎ মনে ব্যথা জাগলো, সে-সব উষা-রসের নিশা তো তার আর নেই।

এ-সব ব্যথার উপশমের জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেছেন নিদ্রা।

বেলাতে ঘুম ভাঙল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে, বাবা।' এতক্ষণে নিশ্চয়ই ডাক্তার চলে গেছেন কর্মস্থলে এবং শহ্‌র্-ইয়ার গেছেন তার পীরের আস্তানায়। কে যেতে চায় ঐ নিরানন্দ ডাইনিংরুমে? আর এই তো প্রথম আমরা তিনজন এক সঙ্গে মুখোমুখী হব। কি হবে গিয়ে ঐ আড়ষ্ট মূক সমাজে। আমি তো আর বাগ্দেবী নই যে, মূককে বাচাল করে তুলবো!

কিন্তু শান্তি কোথায়? কৌটিল্য যে বলেছেন, উৎসবে ব্যসনে, দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবে যে সঙ্গ দেয় সেই ব্যক্তিই বান্ধব—তার কি?

ব্যসন মানে অত্যধিক আসক্তিজনিত বিপত্তি। শহ্‌র্-ইয়ারের এই অত্যধিক ধর্মাসক্তিও এক প্রকারের ব্যসন। কিন্তু এটাই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে কে বলতে পারে? অবশেষে সে হয়তো তার ভারসাম্য ফিরে পাবে এবং সর্বশেষে সে শব্দার্থে ডাক্তারের সহধর্মিণী হবে। ভুল বললুম, এতদিন ধরে ডাক্তার তো ভেবেছে, সে যে ক্রিয়াকর্ম করে যাচ্ছে সেখানেই তার ধর্মজীবনের পরিসমাপ্তি—সেই শুষ্ক আচারানুষ্ঠানের বিশীর্ণ তরুমূলে বরঞ্চ শহ্‌র্-ইয়ার তখন সিঞ্চন করবে সূফী-সন্তদের প্রেম-উৎস থেকে আহরিত নব মন্দাকিনীধারা। ধর্মবাবদে কৌতূহলা অথচ সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে যে ধ্যানধারণা

সাধনা-উপাসনার প্রয়োজন সে-খাতায় সম্পূর্ণ রিক্ত এই যে অধম—সেও উপকৃত হবে।

'গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং' হেঁকে খানা-কামরায় ঢুকলুম।

ডাক্তারকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লতর দেখাচ্ছে। তবে কি এই খোদার-সিধে লোকটা ঐ দুরাশা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, আমি আসার দরুন তার সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে! মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ! আমি কি টেলিফোনের 194 যে, 'হোয়েন ইন্ ট্রবল্'-এ নম্বর রিং করলেই সর্ব ঝামেলা ফৈসালা হয়ে যাবে, না আমি পীরপ্যাকম্বর-গুরুগোসাঁইয়ের খ্যাঁট?—যদ্যপি শহ্‌র্-ইয়ারের নবলব্ধ গরিমা—রোওয়াব্‌টাকে কথঞ্চিৎ ঘায়েল করার জন্য কাল রাত্রে আমি মুখে মুখে হাইজাম্প লঙজাম্প মেরেছি বিস্তর—শহ্‌র্-ইয়ারের 'জিক্‌রের সেই লতীফ্' তাঁর 'লুৎফ্' (দাক্ষিণ্য) বর্ষণ করে বর্বরতম আমার এ মদদর্প যেন ক্ষমা করে দেন।

ডাক্তারকে শুধালুম, 'কই, আজ যে এত্তা ল্যাটে? তবে কি যে-সব কঙ্কাল নিয়ে রিসার্চ করছেন তারা সরকারী ধর্মঘট করেছে, না রবিঠাকুরের 'কঙ্কালের' মত মোলায়েম মোলায়েম গল্প বলার জন্য 'মহিলা-মহলের' প্যাটার্নে 'কঙ্কাল-মহল' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাবৎ কঙ্কাল বেতার থেকে দাওয়াৎ পেয়েছে?'

অনুমান করলুম, ডাক্তার সজ্ঞানে কর্মস্থলে যেতে বিলম্ব করছে। বউকে যতখানি পারে ঠেকিয়ে রাখছে।

ডাক্তার বললেন, 'তা আর বিচিত্র কি? শহ্‌র্-ইয়ারই কিছু দিন পূর্বে বলছিল বেতারের হাঁড়িতে যা চাল বাড়ন্ত, আমার কঙ্কালের না ডাক পড়ে?'

শহ্‌র্-ইয়ার তখন ডাক্তারের লাঞ্চের জন্য স্যালাডে যে মায়োনেজ দেবে তার জন্য ডিমের কুসুম, সরষের তেল আর লেবু নিয়ে বসেছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'তবেই দেখ, ইয়ার, শুধু যে "গ্রেট মাইন্‌ড্‌জ্ থিন্‌ক্ এলাইক" তাই নয়, দৈবাৎ কখনো-

এখনো কোনো 'নীলমণিচন্দ্রমায়' তোমার মত গ্রেট মাইন্ড্ আর আমার মত স্মল মাইন্ড্ও একই রকম চিন্তা করে। আর তুমি যে বেতার তথা কঙ্কালতত্ত্ব ডাক্তারকে বলেছ সেটি আমি একটি ব্যঙ্গচিত্রেও দেখেছি। গত যুদ্ধে হিটলারের যখন তাবৎ সৈন্য খতম, তখন আমাদেরই ডাক্তারের মত এক ডাক্তার বার্লিনের জাদুঘরে গিয়ে একটা কঙ্কালের পাঁজরার উপর স্টিতস্কোপ রেখে পাশের রংরুট আপিসারকে বলছেন, "হ্যাঁ, ফিট্ ফর্ দি আর্মি!" '

তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললুম, 'আমি তো শুনেছি, মায়োনেজ তৈরি হয় অলিভ অয়েল আর সিরকা দিয়ে।'

শহ্‌র্-ইয়ার আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, 'ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু অনেকেই তো মায়োনেজের ধক্ বাড়াবার জন্য ফিকে অলিভ অয়েলে ঝাঁঝালো মাসটার্ড পাউডার দেয়। ও-দুটোতে মিশে তা হলে তো সর্ষের তেলেই দাঁড়াবে। আর ইয়োরোপে টক নেবু নেই বলেই তো শুনেছি, তারা ভিনিগার ব্যবহার করে। নেবু অনেক তাজা।'

ইতিমধ্যে জমীল এসে শুধোলো, কি খাব?

উদাত্ত কণ্ঠে বললুম, 'ব্রাদার, আমি তো ব্রেকফাস্ট খাইনে। কিন্তু কাল রাত্রের খানাতে ঠিক রুচি ছিল না বলে মেকদারে একটু কমতি পড়ে গিয়েছিল। ··দাও কিছু একটা।' শেষ কথা টি বললুম ঈষৎ অবহেলা ভরে।

আমার মতলব, শহ্‌র্-ইয়ারকে ইঙ্গিতে অতি মোলায়েম একটি খোঁচা দেওয়া। ভাবখানা এই, 'তুমি সামনে বসে ভালো করে খাবার জন্য চোটপাট করবে, রসালাপের মধুসিঞ্চন করবে, তবে তো আমার জিভে জল, পেটে জারক রসের ছয়লাপ জাগবে। নইলে আমার কি আর অন্যত্র অন্ন জোটে না?'

এবারে শহ্‌র্-ইয়ার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। সে-দিঠিতে আমি যেন দেখতে পেলুম, কেমন যেন একটা বেদনা-ভরা নৈরাশ্য

তবে কি সে বলতে চায়, সে খেয়ালখুশীতে আমাকে অবহেলা করে নি ; আমাকে, তার স্বামীকে সেবা করার মত শক্তি তার আর নেই।

তারপর ধীরে ধীরে জমীলের কাছে গিয়ে বললে, 'আমি খাবার তৈরি করছি, তুমি কমলালেবুর রস ঠিক করো।'

আমার আপসোস হলো। কী দরকার ছিল আমার এ-অভিমান দেখাবার। আমি না স্থির করেছিলুম, আমি অভিমান করবো না। আমি, অগা, কি করে জানবো এ-মেয়ের বুকের ভিতর কি তুফান উঠেছে? আমি কি করে বুঝবো ওর মনের কথা? আপন মা-ই কি সব সময় বুঝতে পারে, তার সন্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব! আমার তরুণ বয়সে দেখেছি, একাধিক সুশিক্ষিতা মাতা পুত্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নামতে বাধা দিয়েছেন। হয়তো সন্তানের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ কারাবাসের দুঃখ যন্ত্রণা মাতাকে ত্রাসাতুর করে তুলেছিল। যাই হোক যাই থাক, মা তো তখন বুঝতে পারে নি, ছেলে বিভীষিকা দেখছে, সে যদি তার আদর্শ ত্যাগ করে কারাগারের বাইরে থেকে যায় তবে সেই মুক্ত পৃথিবী তখন তার পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে বৃহত্তর, বৃহত্তম কারাগার!

শহ্‌র্-ইয়ার আমার কে, যে, আমি তার হৃদয়মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবো? মুসলমান সমাজের ভিতর আমাদের দু'জনার মধ্যে যে সম্পর্ক দিন দিন ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল, সে রকম সম্পর্ক আমাদের সমাজে কিছুদিন পূর্বেও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব, এখনো সাতিশয় বিরল। খুদ আরব দেশ, ইরান-তুরান-আফগানিস্তান এমন কি এদেশের হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশও তো এ-সব বাবদে বাঙালী মুসলমান সমাজের ঢের ঢের পিছনে ও-সব দেশে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে হদীস খুঁজতে যাওয়া বিলকুল বেকার। বরঞ্চ শহ্‌র্-ইয়ার ও আমার উভয়ের অনুভূতিক্ষেত্রে যিনি আবাল্য রসসিঞ্চন করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে শুধোই। তিনি এই

সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করে করে পৌঁচেছিলেন কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' আখ্যানে। সেখানে পত্রলেখা নাম্নী তরুণী কুমারী যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের "পত্নী নয়, প্রণয়িনীও নয়, কিংকরীও নয়, পুরুষের সহচরী'।

কিন্তু শহর্-ইয়ার আমার সহচরী কেন, নর্মসহচরীও তো নয়।

তদুপরি সে বিবাহিতা, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা; আমিও একদারনিষ্ঠ।

কবিগুরুর তীক্ষ্ণদৃষ্টির খরতর শর কিন্তু আমাদের এই 'নাজুক' বা ডেলিকেট্ সম্পর্কের অন্তত একটি সূক্ষ্মতম কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে। 'পত্রলেখা যেখানে (চন্দ্রাপীড়ের সান্নিধ্যে) আসিয়া যে অতি স্বল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনো প্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড় সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট।'

পরিস্থিতিতে অবশ্য পার্থক্য আছে। পত্রলেখা ছিলেন চন্দ্রাপীড়ের তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পরিচারিকা; চন্দ্রাপীড় যুবরাজ। যুবরাজকে তো সাবধানে পা ফেলতে হয় না। কিন্তু শহর্-ইয়ার ও আমার সম্পর্ক তো 'বরাবরেষু'।

তাই শহর্-ইয়ারের 'স্থানটি তাহার পক্ষে' যেমন 'বড় সংকীর্ণ' আমারও 'একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট'।

তার প্রতি আমার সহানুভূতি, তার প্রতি আমার ভালোবাসা, তার অন্তরের দ্বন্দ্বে তাকে সহায়তা করা—এসবই যেন 'একটু এদিকে ওদিকে পা না ফেলে'! তা হলেই সংকট।

আমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। ডাক্তার আসন ছেড়ে উঠে বললে, 'তা হলে আসি; আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, অর্ধসমাপ্ত ব্রেকফাস্ট টেবিলে রেখে। বললুম, 'আমাকেও একটুখানি বাইরে যেতে হবে। আপনি আমাকে ড্রপ্ করতে পারবেন?'

উভয়েই আশ্চর্য। কারণ আমি এ-বাড়ি থেকে মাত্র একবার বেরিয়েছিলুম—তাও ওদেরই সঙ্গে।

ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু আপনি ব্রেকফাস্ট শেষ করুন।'

আমি তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠে বললুম, 'ওঃ! ব্রেকফাস্ট! সে বালাই যা আমি কালেকস্মিনে খাই, সে তো বুড়ি ছোঁয়ার মত।'

এটা নিছক শহ্‌র্-ইয়ারকে খুশী করার জন্য। সে যেন না ভাবে যে, সত্যসত্যই কাল রাত্রে আমি অভুক্ত ছিলুম।

ওষুধ কিছুটা ধরলো; শহ্‌র্-ইয়ার আমার দিকে যেন একটুখানি কৃষ্ণনয়নে তাকালো। মেয়েটি সর্বার্থে অতুলনীয়া।

ওরা কিছু শুধোয় নি। আমি নিজের থেকেই বললুম, 'চললুম অভিসারে। আমার সিঁথির সিঁদুরের সন্ধানে।'

ডাক্তার তো বিস্ময়বিহ্বল, 'সিঁথির সিঁদুর? সে আবার কি? শহ্‌র্-ইয়ারও তদ্বৎ।

একগাল হেসে বললুম, 'আমার পাবলিশার গো, আমার পাবলিশার। উনি আছেন বলেই তো দু'পয়সা পাই, মাছ-মাংস খাই। সিঁথির সিঁদুর না তো কি?' ওদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করেই বললুম, 'আমার ফিরতে দেরি হবে। আমার পাবলিশার রীতিমত খানদানী মনিষ্যি। সায়েবসুবোদের মত পয়লা নম্বরী হোটেলে লাঞ্চ খান। বিজনেস টক্ মক্ যা-কিছু সেসব হোটেলের 'বার'-এ—পিন্‌জিন্ (পিংক্ জিন্) গেলাসের থার্মোমিটার সাইজের ডাঁটাটি ঘোরাতে ঘোরাতে।···আমার গাড়ির দরকার নেই।'

আমার ইচ্ছা, শহ্‌র্-ইয়ারের এদানিংকার প্রোগ্রাম ডিস্টার্ব না করা। মুরশিদ-মঞ্জিলে যাবার জন্য তার যদি নিত্যিনিত্যি পারিবারিক গাড়ির প্রয়োজন হয় তবে তাই হোক্। আমি রাত না করে ফিরবো না।

আমি আশা করেছিলুম, সে বুঝে যাবে এটা আমার কোনো

অভিমানজাত প্রত্যাখ্যান নয় কিছুটা প্রসন্ন নয়নে আমার দিকে মুহূর্তেক তাকাবে।

রহস্যময়ী এ নারী। শুধু বললে, 'আমারও তো গাড়ির দরকার নেই।'

আমার খুশী হওয়ার কথা, কারণ এ-যুগে মায় ড্রাইভার চোপ্পর দিনের জন্য মোটরপ্রাপ্তি যেন চৌরঙ্গীতে সোঁদরবনের কেঁদো বাঘ-সওয়ার গাজী পীরের ইয়ার দক্ষিণ-রায়ের দাক্ষিণ্যপ্রাপ্তি! কিন্তু আমার উল্টে হলো গোশ্‌শা। ওঃ! তুমি বুঝি ধরে নিয়েছো, যানাভাবে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে, ঘর্মাক্ত কলেবরে যত বেশী ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে গুরুর পদপ্রান্তে পৌঁছবে সেই অনুপাতে তোমার মুরশিদসেবার পুণ্যধ্বজা মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে আল্লাতালার কুর্সিপানে ধাওয়া করবে! 'তকলীফ বরদাস্ত করাতেই সওয়াব্' 'কৃচ্ছ্রসাধনেই পুণ্য'—অর্ধসিদ্ধ বৈরাগ্যবিলাসীদের মুখে এ জাতীয় জনপদসুলভ নীতিবাক্য শুনে শুনে এক কামিল্ সূফী বিরক্তিভরে বক্রোক্তি করেছিলেন, 'তবে চড়ো না গে' প্রতি ভোরে হিমালয়ের চুড়ো, সেখানে পড়ো গে' ফজরের নামাজ! বেহেশ্‌তের বেবাক ফেরেস্তা সেই হুদো হুদো পুণ্যের খতেন রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাবেন। আর চুড়ো চড়ার বেপথে যদি টেঁসে যাও তবে তা তো হাজার দফে বেহ্‌তর্। তখন তুমি পাবে শহীদের উচ্চাসন। পূর্বকৃত সর্বপাপভার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সরাসরি চলে যাবে বেহেশ্‌তে!'

না গো, শহ্‌র্-ইয়ার, তোমার পুণ্যপন্থা আমি অত সহজে নিষ্কণ্টক করে দেব না। দুপুরে বাড়িতে খাবও না। তোমার প্রোগ্রাম-প্ল্যান আমি এতই নর্মাল সহজ করে দেব যে তুমি কৃচ্ছ্রসাধন করার রন্ধ্রটি পর্যন্ত খুঁজে পাবে না। আমি সতী বেহুলার চেয়ে ঢের বেশী চালাক।

উপস্থিত আমি স্রেফ একটিবারের তরে তোমার মুর্‌শিদ্-বিরিঞ্চি-বাবার মুখারিবন্দরুচিটির দর্শন লাভ করে যে পুণ্যসঞ্চয় হবে সেইটে

মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব স্বর্গের পোস্টাপিসে—হোথায় সীট রিজার্ভেশনের জন্য ইনসিওরেন্সের পয়লা কিস্তি!

আহা, শহর্-ইয়ার, তুমি দর্শন পেয়ে গেলে, তুমি ভাগ্যবতী :—

'অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

এবং ততোধিক বিস্ময় মানতে হয় যে আবাল্য ধর্মশাস্ত্র, এমন কি ধর্মসঙ্গীতও উপেক্ষা করে কোন্ মন্ত্রবলে কোন্ পুণ্যফলে নিরঙ্কুশ অব্যবহিত পদ্ধতিতে আজ অকস্মাৎ হৃদয়ঙ্গম করে ফেললে,

'যদ্যপি আমার গুরু বেশ্যাবাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥'

চৌদ্দ

সর্বপ্রকারের বাদ-প্রতিবাদ অখণ্ড উপেক্ষা করে গেলুম শোবার ঘরে। চীনাংশুক-অঙ্গবাসটি স্কন্ধোপরি লম্বমান করে দৃঢ়পদক্ষেপে দৃক্‌পাত না করে সোপান অবরোহণান্তে রাজসিক পদ্ধতিতে আরোহণ করলুম সেই মান্ধাতাত্যুবনাশ্ব সমসাময়িক স্বতশ্চলশকটে।

ডাক্তার সভয় সবিনয় কণ্ঠে অনুরোধ করলেন, 'গাড়িটা রাখুন না সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে। আমি ভারি খুশী হব। আর জানেন তো কলকাতায় যানবাহনের হাল।'

আমি স্থির কণ্ঠে বললুম, 'আপনাকে কোনো বাবদেই "না" বলতে আমার বড় বাধে। কিন্তু ক্ষণতরে বিবেচনা করুন, আমি বেরিয়েছি চতুর্বর্গের দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ অর্থের সন্ধানে; পক্ষান্তরে শহর্-ইয়ার বেরুবেন চতুর্থ বর্গ অর্থাৎ মোক্ষের সন্ধানে। কার সেবাতে এস্থলে নিয়োজিত হবে এই শকট?' তারপর মৃদুহাস্য করে বললুম, 'অপরাধ নেবেন না, শকটটিও মুমূষু তথা মুমুক্ষু—তারও তো ভূত-ভবিষ্যৎ আছে। সেই বা যাবে না কেন রাজেন্দ্রাণী সঙ্গমে দেবদর্শনে?'

ডাক্তার নিম-সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এ গাড়ি আমি অতি অবশ্যই স্ক্রেপরূপে বিক্রি করবো না। তাকে তার আপন গারাজচ্যুতও করবো না। এবং নিশ্চয়ই রাখবো নিত্য রানিং অর্ডারে, আপনার ভাষায় স্বতশ্চলাবস্থায়।'

আমি প্রসন্ন-বদনে বললুম, 'আর আপনার নাতি সেটি চড়ে 'ভিন্‌টেজ কার' রেসে নামবে।'

বলতে পারবো না, হয়তো আমার দৃষ্টিভ্রম—কিন্তু আমার যেন মনে হলো ডাক্তার অন্যদিকে অতি সামান্য মুখ ফেরালেন।

আমি সে-কুহেলি কাটাবার জন্য শুধালুম, 'ডাক্তার, আপনার মনে আছে, গত বর্ষারম্ভে আপনারা যখন শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন তখন একদিন অপরাহ্নে ওঠে প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়, তারপর মুদ্‌গরধারে শিলাবৃষ্টিপাত এবং সর্বশেষে রূপালী ঝালরের মত রিম্‌ঝিম্‌ বরষন ? শহ্‌র্‌-ইয়ার বৃষ্টিতে ভিজবে বলে একা চলে যায় আদিত্যপুরের দিকে ?

আমরা দুজনাতে তখন বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার নিয়ে আলোচনা করি। শেষের দিকে আপনি ইসলাম সম্বন্ধে ভালো ভালো রেফ্‌রেন্‌স্‌ বইয়ের একটি ফিরিস্তি আমার কাছে চান। সে-নির্ঘণ্ট শেষ করার পূর্বেই শহ্‌র্‌-ইয়ার বাড়ি ফেরে।—তাই তখন দশ খণ্ডে অসমাপ্ত একখানি অতুলনীয় গ্রন্থের কথা আমার আর বলা হয়ে ওঠে নি।

বইখানির—বরঞ্চ বলা উচিত "ইসলামবিশ্বকোষ"-এর নাম "আন্নালি দেল্‌ ইসলাম" অর্থাৎ অ্যানালস্‌ অব্‌ ইসলাম,—ইতালীয় ভাষায় লেখা। কিন্তু তার পূর্বে এই অজাতশত্রু বিশ্বকোষের একক স্রষ্টার পরিচয় কিছুটা দিই। এঁর নাম প্রিন্‌স্‌—ডিউকও বলা হয়—লেওনে (অর্থাৎ সিংহ) কাএতানি। ইতালীর তিনটি পরিবারের যদি নাম করতে হয়, যাঁদের সঙ্গে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহলে কাএতানি পরিবারের নাম বাদ যাবে না। কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে এ-পরিবারের যশ প্রতিপত্তি আরম্ভ হয় যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ-পরিবারেরই একজন বনিফাতিয়ুস নাম নিয়ে তদানীন্তন খৃষ্ট-জগতের পোপ নির্বাচিত হন। ইনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও কূটনীতিতে চাণক্য! ওদিকে যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী। ডেনমার্কের রাজাকে তিনি পদানত করেন এবং ফ্রান্সের সম্রাটকেও প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। কিন্তু এসব তথ্য বলার কোনো প্রয়োজন নেই—এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে তাঁর সমসাময়িক অমর কবি দান্তে তাঁকে

তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্যে যীশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। তত্ত্ব কথা এই যে বনিফাতিয়ুস সে-যুগের সর্বোত্তম দার্শনিক স্পেনের মুসলমান আবূ রুশ্‌দের দর্শন প্রায় সর্বাংশে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। কারণ আবূ রুশ্‌দ্ (ঐ যুগেই তাঁর দর্শন একাদশ খণ্ডে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়—লাতিনে রুশ্‌দের নাম আভের এস্) যুক্তিতর্কদ্বারা প্রমাণ করতেন যে মৃত্যুর পর মানবাত্মা অ ন ন্ত স্বর্গভোগ বা অ ন ন্ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। তার কারণ অনন্ততা, আনন্ত্যগুণের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লা। মানবাত্মা নয়, এবং অনন্ত স্বর্গ অনন্ত নরকের আনন্ত্যগুণ স্বীকার করলে এরা সকলেই সেই মহান আল্লার (বেদান্তের ভাষায় একমেবাদ্বৈতম্ ব্রহ্মের) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবে—এ-ধারণা কিম্ভূতকিমাকার অশ্বডিম্ব—আটারলি এব্‌সার্ড। তাই আবূ রুশ্‌দের মতে মৃতাত্মারা স্বর্গ-নরক যথোপযুক্ত কাল ভোগ করার পর আল্লাতালা অবশেষে সর্ব আত্মা, স্বর্গ, নরক সব, সব-কিছু নিজের মধ্যে আ প না তে সংহরণ করে নেবেন। তখন তিনি আবার একম্, অদ্বৈতম্।'

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, 'এই মতবাদটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। একটু সবিস্তার বলুন।'

আমি বললুম, 'নোঃ! আমি দর্শন প্রচার করিনে। আমি শোনাই কাহিনী। একটি করুণ কাহিনী। শোনাবার জন্য আমি এস্থলে অতি সংক্ষেপে একটি পটভূমি নির্মাণ করলুম মাত্র। তৎপূর্বে আরো আধ মিলিগ্রাম দর্শনবিলাস করতে হবে। এদিকে আবার খৃষ্টান মাত্রেরই অটল অচল বিশ্বাস পুণ্যাত্মা অনন্ত স্বর্গসুখ এবং পাপাত্মা অনন্ত নরকযন্ত্রণা পাবে। ওদিকে পোপ, খৃষ্টজগতের পিতা, যাঁর পুণ্যাস্যনির্গত প্রতিটি বাক্য শাস্ত্রাতিশাস্ত্র আপ্তবাক্য, সেই সর্বশাস্ত্রবিশারদ পোপ বনিফাতিয়ুস 'ম্লেচ্ছ যবন' দার্শনিক আবূ রুশ্‌দের মতবাদ এমনই আকণ্ঠ গিলে বসে আছেন যে তিনি তাঁর সহকর্মী

কার্ডিনালদের সমক্ষে গোপন রাখতেন না যে, তিনি মৃতাত্মার অনন্ত স্বর্গনরক-ভোগাদিতে বিশ্বাস করেন না। তাই পূর্বেই বলেছি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। খুদ বাইবেলের বিরুদ্ধে এই 'ম্লেচ্ছ' 'যাবনিক' মতবাদ প্রচার করার জন্য পোপকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। তারই উল্লেখ করে কবি দান্তে বিলাপ করে তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁর জল্লাদরা যেরকম তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাঙ্গবিদ্রূপ করেছিল ঠিক সেই রকম 'প্রভু যীশুকে দ্বি তী য় বারের মত বাঙ্গবিদ্রূপ করা হলো।

কিন্তু এহ বাহ্য।

যে কাএতানি পরিবারে এই পোপের জন্ম সে-পরিবারে যুগ যুগ ধরে বহু পণ্ডিত, বহু গবেষক জন্ম নিয়েছেন। এ-পরিবারের শেষ পণ্ডিত, আমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক লেওনে কাএতানি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, এই পোপের উপর আরব দার্শনিক আবু রুশ্‌দের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর পারিবারিক ও পোপদের প্রচলিত ইতিহাস অধ্যয়ন করার ফলে তিনি আরবী ভাষা ও মুসলিম সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন।

পর পর দু'খানি অত্যুত্তম গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি ইয়োরোপ তথা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ভূখণ্ডে নব "শমসুল্-উলেমা" (জ্ঞান-ভাস্কর) রূপে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও অকুণ্ঠ প্রশস্তি লাভ করলেন। তখন তিনি স্থির করলেন, এ-সব উটকো বই না লিখে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন নিয়োজিত করবেন ইসলামের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করাতে। বিদ্বজ্জন সোল্লাসে হর্ষধ্বনি তথা সাধুবাদ প্রকাশ করলেন।'

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলুম, মেডিকেল কলেজ আর বেশী দূরে নয়। বললুম, 'এবার আমি আমার মোদ্দা কথাতে চলে এসেছি।

রাজপরিবারের অংশবিশেষ, অসাধারণ সুপুরুষ, সংগীতচিত্রভাস্কর্য ইত্যাদির সক্রিয় সমঝদার কাএতানি প্রেমাবদ্ধ হলেন এক পরমা

সুন্দরী, সর্বগুণান্বিতা রোমান রমণীর সঙ্গে। সৌভাগ্যক্রমে প্রেমটি হলো উভয়ত ও গভীরতম।

বিবাহ হয়ে গেল। তাবৎ ইতালী এক কণ্ঠে বললে, তাদের দেশের নীলাম্বুজের ন্যায় গভীর নীলাকাশের সঙ্গে চক্রবালবিস্তৃত ইন্দ্রধনুর এহেন পূর্ণাঙ্গ আলিঙ্গন ইতিপূর্বে তাদের এবং সর্ববিশ্বপূজ্য 'রোমেও জুলিয়েতের' প্রেমভূমিতেও হয় নি।

তারপর আমাদের লেওনে—"নরসিংহ"—ডুব দিলেন তাঁর ইসলামের ইতিহাস—তাঁর "আন্নালি" বা "অ্যানালস—" গ্রন্থে।

বউ এসে বললেন, "ওগো, শুনছো, কাল সন্ধ্যায় আমাদেরই তসকানীনি আসছেন সঙ্গীত পরিচালনা করতে। ঐ দেখো টিকিট পাঠিয়েছেন। অন্যলোকে হন্যে হয়ে ধন্না দিচ্ছে শুদ্ধমাত্র ওঁর দর্শন পাবার জন্য।"

লেওনের মুখ বিবর্ণ। অপরাধীর মত বললেন, "কিন্তু আমার 'আন্নালি'—এ-অধ্যায়টা শেষ না করে—আচ্ছা, কাল দেখব।"

কিন্তু 'কাল' ও সেই 'দেখবো'টা দেখা হয়ে উঠলো না। লেওনে ডুব মেরেছেন 'আন্নালির' গভীর অরণ্যে।

তারপর এলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ টেনর গাওয়াইয়া কারুজো। ফল তদ্বৎ.

মাঝে মাঝে বলতেন, "তা তুমি, ডার্লিং (দিলেত্তো), দিনোর সঙ্গে যাও না কেন? সে তো সবসঙ্গীতে আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সমঝদার। আমার আন্নালি—"

বউ ঠোঁট চেপে বললেন, "দিনো তার 'প্যতীত্ আমির' (প্রিয়া বান্ধবী-র) সঙ্গে যাচ্ছে।"

আকাশপানে হানি যুগল ভুরু লেওনে অবাক হয়ে শুধোলেন, "সে কি? দিনোর তো সুন্দরী বউ রয়েছে। এই হালেই বিয়ে করেছে। এর-ই মধ্যে 'প্যতীত্ আমি'?"

যা শুনেছি, তারই স্মরণে যতটুকু মনে আসছে তাই বলছি, বউ নাকি ঠোঁট দুটি আরো কঠিনভাবে চেপে চলে যাচ্ছিল—

লেওনে তোৎলাতে তোৎলাতে—তিনি ছিলেন লক্ষ্মীট্যারার মত অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্মী-তোৎলা—বললেন, 'কিন্তু, কিন্তু, ডার্লিং, আমার আন্নালি, আ—'

আন্নালি, আন্নালি—আবার সেই আন্নালি।

প্রেমিক, রসিক, ললিতকলার বিদগ্ধ সমঝদার লেওনে এখন হয়ে গিয়েছেন শুদ্ধমাত্র পণ্ডিত। পণ্ডিতেরও বউ থাকে। কিন্তু এ-স্থলে লেওনের একটি 'প্যতীত্ আমি' তাঁর হৃদয়াসন জুড়ে বসে গেছেন। আন্নালি।

লেওনে যে তাঁর বউকে সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবেসে তার পদপ্রান্তে তাঁর সর্বাত্মা নিবেদন করেছেন এ-তত্ত্ব তাইবেরিয়ো রোমবাসী জেনে গিয়েছে। বস্তুতঃ লেডিকিলার রোমান নটবররা যখন ফস্‌ফস্ গুজগুজ করতে আরম্ভ করেছে, লেওনেটা একটা স্ত্রৈণ ভেড়ুয়া, ভাত্তুয়া (পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় বউয়ের দেওয়া 'ভাত' না পেলে যে-ক্লাবের দিন গোজরান হয় না), আস্ত একটা নপুংসক।

এদিকে লেওনে তাঁর সর্বসত্তা স্ত্রীর কাছে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত। তাঁর দেবী যে তাঁর আন্নালিকে তার সপত্নী, তার "প্যতীত্ আমি" রূপে কস্মিন কালেও ধরে নিতে পারে সেটা তার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে। কিন্তু ডাক্তার, এই দগ্ধ জগতে কত ঢপবেঢপেরই না সতীন হয়। সেই যে হিংসুটে দ্বিতীয়পক্ষ দেখলো তার স্বামী একটা মড়ার খুলি বেড়ার কঞ্চির উপরে রাখছে সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা করে ফেললে, এটা নিশ্চয়ই তার মৃতা সপত্নী সীমন্তিনীর সীমন্তবহনকারী মস্তকের খুলি! তাই না মিনষের পরানে এত সোহাগের বান জেগেছে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। তন্মুহূর্তেই—না, বরঞ্চ বলবো—তন্মুহূর্তেরও তিন মিনিট আগে, রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে "ফৌরনকে পাঁচ মিনট পেহ্‌লে", সেই খুলিটা ফেলে দিলে বাড়ির পিছনের

বিষ্ঠাকুণ্ডে। সে কেচ্ছা থাক, ডাক্তার, এ-বাবদে আমি বিস্তর গবেষণা করেছি—সুবিধে-কুবিধে মত কোনো এক সময়ে সেটা হবে। শুধু একটি আপ্তবাক্য বলি, এ-দেশের হরিপদ কেরানী যে তার কুল্লে জীবনের দশটা-পাঁচটা বেঁচে দিয়েছে তার জন্য তার বউ খেদ করে না। কিন্তু বাবদ-বাকি ষোল সতেরো ঘণ্টা সেই পদী-বউ হয়ে যায় রাজ-রাজ্যেশ্বরী পট্টমহিষী রানী পদ্মিনী পদ্মাবতী—শাহ্-ইন্-শাহ বাদশা আলাউদ্-দীনও সেখানে ইতর জন।

আমাদের পণ্ডিত লেওনে একটি আস্ত মূর্খ।

এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্যন্ত জানেন না, গভীর, উভয়পাক্ষিক প্রেমের পর, বিয়ে হওয়ার পরও অনেক কিছু করার থাকে। সেগুলো অতি ছোটোখাটো জিনিস। কিন্তু ছোট হলেই কি ছোট জিনিস সর্বাবস্থাতেই ছোট, বড় জিনিস বড়? পিপীলিকা অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণী; হাতি বৃহত্তম। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বানানের বেলা? সেখানে পিপীলিকার বানান ঢের বেশী শক্ত—হাতির তুলনায়।

লেওনে মূর্খ। তিনি বুঝতে পারেন নি, এসব ছোটোখাটো অনেক ব্যাপার আছে। বউকে কনসার্টে নিয়ে যাওয়া, তার জন্মদিন বা নামকরণ দিন স্মরণে রেখে ভালোমন্দ কিছু-একটা সওগাৎ নিয়ে আসা, বিবাহের বর্ষাবর্তনের দিন হৈ-হুল্লোড় করে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে উত্তমরূপে সমাধান করা—এ-সব কিছুই লেওনের স্মৃতিতে আসে না। আম্মালির গভীর গর্ভে এসব জিনিস ডুবে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ।

হঠাৎ এক সকালে লেওনে ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে এসে দেখেন, তাঁর পেলেটের উপর ছোট্ট একটি চিরকুট।

এবং ইতিমধ্যে তাঁর মত আপন-ভোলা লোকও লক্ষ্য করলেন, যে-বউ সদাসর্বদা তাঁর ব্রেক্‌ফাস্ট তৈরি করে দিত, সেও সেখানে নেই।

চিরকুটটি খুলে পড়লেন, 'আমি তোমার ভবন পরিত্যাগ করলুম। অপরাধ নিয়ো না।'

ডাক্তার হতভম্ব।

তারপর রাম-গবেটের মত তোৎলাতে তোৎলাতে যা শুধোলো তার বিগলিতার্থ, এ-রকম একটি সর্বগুণসম্পন্না মহিলা যিনি তাঁর আপন দয়িতের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন পেয়েছেন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন?

আবার নূতন করে বুঝতে পারলুম, আমাদের এই মাইডিয়ার লার্নেড ডাক্তারটি হয়তো তাঁর চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞানপ্রসাদাৎ মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন, কিন্তু জ্যান্ত লোক যে দৈহিক মৃত্যু ভিন্ন অন্য নানাভাবে মরতে পারে—কএস যেরকম লায়লাকে ভালোবেসে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়ে লোকমুখে প্রচারিত মজনূন (যার স্কন্ধে জিন্=ভূত চেপেছে; উপাধি পান—এ-সবের কোনো এনট্রি তাঁর জীবনের খাতাতে নেই। তাঁর কাছে সব-কিছুই সরল সিলজিমে প্রকাশ করা যায়:—

ডাক্তার শহ্‌র্-ইয়ারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছেন।

শহ্‌র্-ইয়ার ডাক্তারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছে।

অতএব এঁদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ আসতে পারে না।

কিউ ই ডি!!!

প্রভু যীশু নাকি বলেছেন, শুধু রুটি খেয়েই মানুষ বাঁচে না, ঠিক তেমনি বলা যেতে পারে দাম্পত্যজীবনে শুধু প্রেম দিয়েই পেট ভরে না।

কিন্তু এসব তত্ত্বকথা ডাক্তারকে এখন বলে আর কি লাভ? মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গিয়েছে।

বললুম, 'ডাক্তার, আমাকে অনেকেই শুধোয়—বিশেষ করে আমার মস্তান চেলারা শুধোয়, কোন্ দেশের রমণী আমাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। কী প্রশ্ন! আমি কি দেশে দেশে কান্তা, দেশে

দেশে প্রিয়া করে বেড়িয়েছি না কি যে, এর পাকি উত্তর দেব। তবে নিতান্ত 'হাই-কোর্ট' মাত্রই দেখি নি বলে চোখ কান খোলা ছিল। এবং লক্ষ্য করেছি, স্পেন আর ইতালির মেয়েরা হয় তেজী আর স্বামী হ'ক প্রেমিক হ'ক তার উপর যে হক্‌ক বর্তায় সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানটি হয় খুবই টনটনে—ভয়ঙ্কর জেলাস্। 'অভিমান' শব্দের ইংরিজি প্রতিশব্দ নেই, ইতালি ভাষায়ও খুব সম্ভব নেই। তবু ইতালির নিম্নশ্রেণীতে হিংসুটে রমণী প্রতি গলিতে গণ্ডায় গণ্ডায়, আর ভদ্রসমাজে অভিমানিনীরা অভিমানের চূড়ান্তে পৌঁছে আত্মহত্যাতে বোধ করি জাপানীদেরও হার মানায়। কাএতানির বউ এক অর্থে আত্মহত্যাই করলেন, এবং করলেন একটি জলজ্যান্ত খুন। কিন্তু এহ বাহ্য।

লেওনের মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবিস্তর সংবাদ কেউই দিতে পারে নি। তবে তাঁর পরবর্তী আচরণ থেকে এ-সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

আন্নালির দশাংশের একাংশ তখনো শেষ হয় নি।

তার পর একদিন লেওনে ইতালি থেকে উধাও। কেউ জানে না কোথায় গেছেন।

তার কিছুদিন পরে খবর এল লেওনে তাঁর বিরাট জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গেছেন দূরের চেয়ে দূর সুদূর ক্যানাডায়। সেখানে সামান্য জমিজমাসহ একটি কুটির খরিদ করেছেন। বনের ভিতর।

সেখানে দিন কাটান কি করে?

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জলের ধারে, বঁড়শি ফেলে।

কে জানে মাছ ধরা পড়তো কিনা।

আর তাঁর হাজার হাজার বই—অন্তত ত্রিশটি ভাষায়—যার উপর নির্ভর করে, যে সব ইঁট-সুরকি দিয়ে তিনি তাঁর আন্নালি-কুৎবমিনার গড়ে তুলেছিলেন?

জানিনে। কিন্তু এ-কথা জানি, তিনি ক্যানাডা যাবার সময় একখানা বইও সঙ্গে নিয়ে যান নি।'

ডাক্তার বললেন, 'সে কি কথা? তাঁর সমস্ত সাধনা বিসর্জন দিলেন?'

'তাই তো বললুম, লেওনের বউ তাঁকে ছেড়ে যাবার সময় খুন করে গেলেন, প ণ্ডি ত লেওনেকে। আর যেহেতুক পণ্ডিত লেওনেই ছিলেন লেওনের চোদ্দ আন্না সত্তা তাই বলা যেতে পারে, তিনি লেওনেকেই খুন করলেন।

তিনি যেন যাবার সময় বলে গেলেন, "আন্নালিই যদি তোমার আরাধ্য দেবী হন, তবে আমার স্থান কোথায়?"

লেওনে যেন উত্তরে বললেন, "তুমিই ছিলে আমার জীবনের আরাধ্যা। আন্নালি নয়। প্রমাণ? সেই অসমাপ্ত আন্নালি-প্রতিমাকে ভেঙে চুরমার করে চললুম নিরুদ্দেশে।"

এবং আমার মনে হয়, লেওনে যেন পত্নীর উদ্দেশে বলতে চেয়েছিলেন, "তুমি রোমান সমাজের উচ্চশিক্ষিতা রমণী হয়েও বুঝতে পারলে না, আমি কাকে কোন্ জিনিসকে কতখানি মূল্য দিই!"

এ-কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই নয়।

লেওনে কিন্তু তাঁর তাবৎ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করতে পারেন নি বা তাঁর সে-দিকে হুঁশ ছিল না। কাজেই দশ দশ বিরাট ভলুমে বেরুলো তাঁর আন্নালির অতিশয় অসমাপ্ত অংশ। আরবী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা সেটিকে রাজমুকুটের কুহ্-ই-নূরের মত সম্মান দেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা আন্দেশা করতে লাগলেন, লেওনেকে কি করে সেই পাণ্ডববর্জিত ক্যানাডা থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় তাঁকে সুস্থ স্বাভাবিক করা যায়—যাতে করে অন্তত তিনি তাঁর আন্নালি সমাপ্ত করে যান।

এক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবদের সাধারণ সম্মেলনের পর পণ্ডিতরা গোপন বৈঠকে বসে স্থির করলেন কয়েকজন সমঝদার গেরেস্তারী বৃদ্ধ পণ্ডিতকে পাঠাতে হবে, ডেপুটেশনে, লেওনের কাছে। এঁদের সবাইকে বিনয়ী লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এঁরা আপন আপন খরচে পৌঁছলেন, পৃথিবীর সেই সুদূর অন্য প্রান্তে ক্যানাডার ভ্যানকুভারে—বিন্ নোটিশে। লেওনে সবাইকে তাঁর সরল অনাড়ম্বর কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন।

ডেপুটেশন ডিনারের পর কফি-লিকোর খেতে খেতে অতিশয় যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে, তাঁদের সমস্ত ধার, সমস্ত ভার, লেওনের স্কন্ধে নামিয়ে কি সব উপদেশ দিয়েছিলেন, কি সব অনুনয়বিনয় করেছিলেন তার কোনো প্রতিবেদন বা রিপোর্ট নেই, তবে আমি কল্পনা-রাজ্যে উড্ডীন হয়ে কিছুটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু আমার অনুমানে কি যায় আসে! এ যে এক বিরাট ট্রাজেডি। এ তো শুধু দুটি নরনারীর ব্যক্তিগত মান-অভিমান বিরহ-মিলন এবং সর্বশেষে অন্তহীন বিচ্ছেদের কাহিনী নয়—যেটা হর-আকছারই হচ্ছে—এখানে যে তার বাড়া রয়েছে, অকস্মাৎ অকালে একটি প্রজ্ঞাপ্রদীপের অন্ধকারে নিলয়। শুধু পণ্ডিতজন না, য়ুরোপের বহু সাধারণ জনও আশা করেছিল, লেওনের আন্নালির জ্যোতিঃ ইসলাম-ইতিহাসের বহু অন্ধকার গুহাগহ্বর প্রদীপ্ত করে তুলবে—কারণ লেওনে লিখতেন অতিশয় সাদামাটা সরল ইতালীয় ভাষা।

ডেপুটেশনের সর্ব বক্তব্য লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে শুনে বললেন, কয়েকদিন চিন্তা করে তিনি ডেপুটেশনকে তাঁর শেষ মীমাংসা জানাবেন।

ডেপুটেশন দেশে ফিরে গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও তাঁরা লেওনের তরফ থেকে কোনো চিঠি পান নি।

লেওনে কাএতানি তাঁর খোলস দেহটি ত্যাগ করে ইহলোক ছাড়েন ক্যানাডাতেই, খৃষ্ট জন্মদিবসে, বড়দিনে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে।

তাঁর জন্ম রোম শহরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। আমার গুরু আমাকে এ-কাহিনীটি বলেন লেওনের মরজগৎ ত্যাগ করার প্রায় এক বৎসর পূর্বে।

যুদ্ধে মিসিং জোওয়ানের মা যেরকম বছরের পর বছর নিস্তব্ধ, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা করে, তার দুলাল একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, আমার গুরু আরবী শাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত, স্নেহময়ী মাতার ন্যায় বহু বৎসর ধরে প্রতীক্ষা করতেন লেওনে একদিন আবার তাঁর ক্যানাডার অরণ্যানীর বনবাস ত্যাগ করে ফিরে আসবেন তাঁর মাতৃভূমি ইতালিতে। তার পর অধ্যাপক গুনগুন করে যেন আপন মনে বলতেন, "লেওনের মত এরকম স্পর্শকাতর লোক কি আমৃত্যু বিদেশ-বিভূঁইয়ে পড়ে থাকবে? নাঃ, হতেই পারে না। সে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পূর্বে রোমে ফিরে আসবে। যাতে করে তার হাড্ডিগুলো তার মায়ের হাড্ডিগুলোর পাশে শেষ-শয্যায় শয়ান করা হয়।" কিন্তু আমার গুরুর এ দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি।'

ততক্ষণে ডাক্তার আবার খানিকটে সংবিতে ফিরে এসে কি যেন শুধোচ্ছে। আমি ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে বললুম, 'ব্যস, আমরা মেডিকেল কলেজে পৌঁছে গিয়েছি। এবারে আমি পাবলিশার্সদের কাছে যাচ্ছি।'

মনে মনে বললুম, বুদ্ধুটা এখনো যদি না বোঝে আমি কোন্ দিকে নল চালাচ্ছি, তবে ঝকমারি, ঝকমারি, হাজার বার ঝকমারি।

পনরো

প্রকাশকদের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এ স্থলে অবান্তর।

তবে এ স্থলে এ-বাবদে একটি কথা বলতে হয়। শহ্‌র্-ইয়ারদের বিস্তর টাকাকড়ি। আমার অর্থাভাব সে ভালোভাবেই বুঝতো, কিন্তু বুদ্ধিমতী রমণী বলে আরো জানতো আমাকে কোনো প্রকারের সাহায্য করতে চাইলে আমার আত্মাভিমানে লাগবে।

একদিন তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলুম, 'আমি জীবনে সাতবার না আটবার ক'বার চাকরি রিজাইন দিয়েছি বলতে পারবো না। কারো সঙ্গে আমার বনে না। যখন চাকরিতে থাকি, তখন 'সাহিত্য-সৃষ্টির' কোনো কথাই ওঠে না। মাইনের টাকা তো আসছে। বই লেখার কী প্রয়োজন? চাকরি যখন থাকে না, তখন 'পঞ্চতন্ত্র', 'শব্‌নম্' এসব আবোল-তাবোল লিখতে হয়।'

শহ্‌র্-ইয়ার তাজ্জব হয়ে শুধিয়েছিল, 'আপনি শুধু টাকার জন্য লেখেন!'

আমি বলেছিলুম, 'এ্‌গ্‌জ্যাক্‌ট্‌লি! মোস্ট্ সার্টেনলি!'

তারপর বলেছিলুম, 'জানো, শহ্‌র্-ইয়ার, এ-বাবদে অন্তহীন সাহিত্যাকাশে আমিই একমাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকা নই। মহা মহা গ্রহ উপগ্রহও ঐ একই নভোমণ্ডলে বিরাজ করার সময় বলেছেন, লজ্জাঘৃণাভয় অনায়াসে তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, কথাগুলো আমার ঠিকঠিক মনে নেই, তবে মোদ্দা কথা এই, "নান্ বাট্ এ ফুল রাইট্‌স একসেপ্ট ফর মানি" অর্থাৎ "অর্থাগম ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে শুধু গাড়লরাই।" স্বয়ং ডক্টর জনসন বলেছেন "আমি লিখি টাকার জন্য!" বুঝলে ইয়ার, শহ্‌র্-ইয়ার?'

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করে শহ্‌র্-ইয়ার শুধিয়েছিল, 'আচ্ছা, কাল যদি আপনি দশ লক্ষ টাকার লটারি জিতে যান তবে কি করবেন ?' (আমি জানতুম, ডাক্তারের জমিদারী, কলকাতার গণ্ডা গণ্ডা বাড়ি থেকে প্রতিমাসে ওদের দশ-পনরো হাজার টাকা আমদানি হয়, আর ব্যাঙ্কে আছে দশ পঁচিশ লাখ)।

আমি সোল্লাসে বললুম, 'দশ লাখ ? পাঁচ লাখ পেলেই আমার কাজ হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে কালি কলম কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে বলব, বাঁচলুম। এখন থেকে লিখব শুধু প্রেমপত্র, আর, আর চেকের উল্টো দিকে নাম সই।'

শহ্‌র্-ইয়ার টাকাকড়ি বাবদে বড়ই অনভিজ্ঞা। শুধোলো, 'চেকের উল্টো-পিঠে সই, তার অর্থ কি ?' আমি লক্ষ্য করলুম, প্রেমপত্র নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন শুধোলো না। আর চেক্‌ফেক্ তো তার স্বামীর নায়েব সই করে। সে-সব জিনিস তার জানার কথা নয়।

বললুম, 'চেকের উল্টো-পিঠে সই, মানে, সে-টাকা আমি পাবো। আর এ-পিঠে সই, তার মানে টাকাটা আমাকে দিতে হচ্ছে। জানো না, দিশী ছড়া :—

"হরি হে রাজা করো, রাজা করো।
যার ধারি তারে মারো॥
যার ধারি দু'চার আনা,
তারে করো দিন-কানা।
যার ধারি দু'শ চার শ'
তারে করো নির্বংশ॥"

বুঝলে, চেকের এ-পিঠে সই করার প্রতি আমার অনীহা কেন ?'

এ স্থলে বলে রাখাটা প্রয়োজন মনে করি যে, আমার যে-ক'টি ইয়েসমেন চেলা আছে, তারা সবাই তখন বলে, "না, স্যর! আপনার দশ লাখ টাকা পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ভগবান করুন, আপনার যেন চাকরি না জোটে। তাহা হইলে আপনি লেখনী

বন্ধ করিবেন না। ফলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য শ্রীবৃদ্ধিশালী হইবেক, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে উচ্চাশ্রমে প্রবেশ করিবেক।"

কিন্তু শহ্‌র্-ইয়ার এ স্থলে সে-বুলি আওড়ালো না। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিলক্ষণ জানে, আমার 'সাহিত্যসৃষ্টি' সাম্প্রতিক যত মূল্যই ধরুক তার দীর্ঘস্থায়ী মূল্য নাও থাকতে পারে।

তা সে যাই হোক, প্রকাশকের কাছে দরিদ্র লেখকের দু'পাঁচ টাকার জন্য ধন্নে দেওয়াটা সে বিতৃষ্ণার সঙ্গে শুনে যেত। তার সহানুভূতি ছিল লেখকের সঙ্গে।

তাই জানতুম, সে আমাকে শুধোবে না, আমি টাকা পেলুম কি না।

ড্রাইভার যখন বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীটে পৌঁছল তখন তাকে বললুম, 'তুমি বাড়ি যাও, আমি ট্যাক্‌সি ধরে নিয়ে যাব। মা-জী পীরের বাড়ি যাবেন। গাড়িটার দরকার হবে।'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "কিন্তুক সায়েব যে বললেন, আমি আপনার জন্য গাড়িটা রাখি।"

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ড্রাইভারও শহ্‌র্-ইয়ারের এই গুরু নিয়ে মাতামাতি পছন্দ করে না।

তাই দৃঢ় এবং মোলায়েম কণ্ঠে বললুম, 'না, ভাই, তুমি বাড়ি যাও।'

ড্রাইভারকে শুধিয়েছিলুম, পীরের নাম ঠিকানা কি?

ঘণ্টাখানেক পরে সেই উদ্দেশে রওয়ানা দিলুম।

আমার এক মুসলমান চেলা একদিন আমাকে বলেছিল, সে নাকি তার এক ল্যাটাই-ভক্ত দোস্তের পাল্লায় পড়ে সেই দোস্তের পীর দর্শনে যায়। গিয়ে তাজ্জব মেনে দেখে, গুরু বসে আছেন একটা বিরাট হলের মাঝখানে। আর তাঁকে ঘিরে গোটা আষ্টেক ডপকী

ছুঁড়ী দাঁড়িয়ে। তাদের উত্তরাঙ্গে ব্লাউজ-চোলী নেই। ক্ষণে ক্ষণে শাড়ি খসে পড়ে গিয়ে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করে দিচ্ছে। কেউ তখন শাড়ি তোলে, কেউ তোলে না। আর গুরু বলছেন, 'এই দেখো, আমি চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না।

আমি ভেবেছিলুম, অতখানি না হলেও অনেকটা ঐ রকমেরই হবে। শহ্‌র্‌-ইয়ার নিশ্চয়ই কোনো বুজরুক শার্লাটেনের পাল্লায় পড়েছে।

বিরাট গৃহে বসে আছেন পীরসাহেব। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হতভম্ব।

পীরটি তো আমার প্রাচীন দিনের বন্ধু আমীনুর রশীদ মজুমদার!

ষোল

আমি স্তম্ভিত।

আমি বেকুবের মত বাক্যহারা। এমন কি পীরসাহেবকে সেলামটা পর্যন্ত করতে ভুলে গিয়েছি। পীর মানি আর নাই মানি, স্বেচ্ছায় পীরের আস্তানায় গিয়ে তাকে সেলামটা পর্যন্ত করলুম না, এতখানি বেয়াদব, বেতমীজ মস্তান আমি নই।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। পার্ক সার্কাস আমার চেনা পাড়া। পীরমুর্শিদরা সচরাচর এ-পাড়াতেই আস্তানা গাড়েন। আমার এক পুত্রবৎ সখা মুসলমান ছেলে, কচিবাবু আমাকে একদিন বলেছিল, সে নাকি তার এক 'কর্তাভজা' বন্ধুর পাল্লায় পড়ে জনৈক পীর দর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে, পীরসাহেবের চতুর্দিকে গোটা আষ্টেক খাপ্‌সুরত ডপকী হুরী তাঁর চতুর্দিকে তাঁকে ঘিরে বসে আছে। আর তিনি নাকি ক্ষণে ক্ষণে উদ্বাহু হয়ে বলছেন, 'এই দেখো, এই দেখো, আমার চতুর্দিকে আমি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না, আমার ঘি গলছে না।' কচিবাবু নাকি একেবারে বেবাক নির্বাক হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি কিন্তু সেভাবে হতভম্ব হই নি।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মনে হয়েছিল, একতলাতে বাড়ির মালিক সপরিবার বাস করেন, দোতলাতে পর্দা চিক ঝিলিমিলির প্রাচুর্য থেকে অনুমান করলুম, এখানে পীরসাহেবের শিষ্যারা আলাদা-ভাবে থাকেন, আসেন।

তেতলায় যে ঘরে পীরসাহেব বসে আছেন সেটি অনাড়ম্বর। খানচারেক তক্তপোশ মিলিয়ে একটি ফরাশ। পীরসাহেব ছোট্ট

একটি তাকিয়াতে হেলান দিয়ে ঐ তক্তপোশেই উপবিষ্ট কয়েকজন শিষ্যকে কি-একখানা চটি বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

তক্তপোশের এ-পারে কয়েকখানি চামড়ামোড়া আরাম-কেদারা।

এ-সবেতে হতভম্ব হবার মত কিছু নেই।

পীরসাহেবের চতুর্দিকে ঘি-গলানেউলী অষ্টরমণী নেই, এমন কি চিত্রে খৃষ্টান সেণ্টদের মস্তকের চতুর্দিকে যে 'হেলো' বা 'জ্যোতিঃচক্র' থাকে সেটি পর্যন্ত তাঁর মস্তক ঘিরে নেই।

লৌকিক, অলৌকিক, কুলৌকিক কোনো কিছুই নেই। অত্যন্ত সাদামাটা পরিস্থিতি।

আমি স্তম্ভিত হলুম পীরসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি আন্দেশা করেছিলুম, দেখতে পাবো এক বুজরুক, ভণ্ড, শার্লটন। আমারই ভুল, আমারই বোঝা উচিত ছিল, শহ্‌র্-ইয়ার এ-রকম কাঁচা মেয়ে নয় যে বুজরুকি দেখে বানচাল হবে।

আমি অবাক, এই পীর আমার সাতিশয় পরিচিত জন।

বছর পঁচিশেক পূর্বে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খ্যাতনামা পুত্র, পণ্ডিত বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—বরদায়; বিনয়তোষ ও আমি তখন বরদাতে সরকারী কর্ম করি। পীর খাঁটি বাঙালী মুসলমান।

শহ্‌র্-ইয়ারকে মনে মনে পুনরায় সানন্দ নমস্কার জানালুম। বাঙালী মাত্রই—কী হিন্দু, কী মুসলমান—হরবকত তাকিয়ে থাকে পাচ্ছিমবাগে। কন্নৌজের ব্রাহ্মণগুরু, দিল্লীর মুসলমানপীর এঁরা যেন এই 'পাপ' বঙ্গদেশে আসেন পশ্চিমের কোনো-এক 'পুণ্য'লোক থেকে। একমাত্র কাবুলে দেখেছি, সেখানকার হাজার ষাটেক হিন্দু পুববাগে তাকায়, কারণ পশ্চিমবাগে তো আর কোনো হিন্দু নেই। তাই প্রতি দু'তিন বৎসর অন্তর তাদের এক গুরু আসেন বৃন্দাবন থেকে। তাদের মন্ত্র নেওয়া প্রাচ্চিত্তির-ফিত্তির করা বছর দুয়েকের জন্য বন্ধ থাকে।

শহর্-ইয়ারের হৃদয় মন গড়ে দিয়েছেন বাঙালী রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মক্ষেত্রে সে যখন অবতরণ করলো তখন সে বরণ করেছে, বাঙালী
ার। বাঙালী পীরই তো বাঙালী রমণীর অভাব-পরিপূর্ণতা বুঝতে
ারবে সব চাইতে বেশী। শহর্-ইয়ার পশ্চিমবাগে তাকায় নি।

এই পীরটির নাম—অবশ্য তখনো তিনি পীর হন নি—আমীনুর
ীদ মজুমদার। তিনি গুজরাতে এসেছিলেন মধ্যযুগের পীরদের
াস্তানার সন্ধানে। কবীর, দাদূ, জমাল কামাল, বুড্ঢন্ এঁদের
নেকেই তাঁদের হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিমূলক মতবাদ প্রচার করেন
জরাতে। তদুপরি বরদার অতি কাছেই নর্মদা নদী বয়ে যাচ্ছেন।
হিমালয়ে প্রধানত থাকেন সাধুসন্ন্যাসী। নর্মদার পারে পারে
াকেন পীর-ফকীর সাধু-সন্ন্যাসী দুই সম্প্রদায়ই। স্বর্গত অরবিন্দ
ঘোষ বরদায় অধ্যাপনা করার সময় প্রতি শনি-সোম কাটাতেন নর্মদার
ারে পারে উভয়ের সন্ধানে।

এই আমীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে তখনই বুঝে গিয়েছিলুম
য়, বিনয়তোষ সত্যই একটি সত্যান্বেষীকে বাড়িতে এনেছেন তাঁর
চিন্তাধারা তাঁর অভিজ্ঞতা জানবার জন্য।

বিনয়তোষের ধর্মপত্নী ছিলেন ভূদেববাবুর আদর্শ ছাড়িয়েও
াচীনতরা হিন্দু-গৃহিণী। এদিকে পূজাআচ্চা ব্রত-উপবাসে পান
কে চুন খসতো না, ওদিকে দরিদ্রনারায়ণ অতিথি সেবার বেলা
নি বিলকুল নিষ্পরোয়া 'মুচিমোচরমান' ডোমচাঁড়ালের সেবা
র যেতেন। বিরাট কাঁসার থালায় তিনি আমীনুর রশীদ মিঞার
বা করলেন।

বিনয়তোষের অনুরোধে তাঁর ওপেল গাড়িতে করে মিঞাকে
র বাসস্থানে নিয়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি একটি
মবস্তী অশান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন।

আমি একটু আবছা আবছা ভাবে যেন ক্ষীণস্ফুট আত্মচিন্তা
লুম, 'এখানে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না?'

আমীন সাহেবের স্মিতহাস্যটি বড় মধুর এবং কিঞ্চিৎ রহস্যময় বললেন, 'তেমন কি আর অসুবিধে। এদের অধিকাংশই মুসলমান কাপড়ের মিলে কাজ করে। মদ খায়, জুয়ো খেলে আর বউ ঠ্যাঙায়। কিন্তু আমার মত বেকারের প্রতি তাদের স্নেহ আ প্রচুর। তবে মাঝে মাঝে বড্ড বেশী চিৎকার হৈহুল্লোড়ের দর আমার কাজের একটু-আধটু অসুবিধে হয় বৈ কি!'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধিয়েছিলুম, 'আপনার কাজটা কি?

রশীদ সাহেব কোনো উত্তর দেন নি। আমি অনুমান করলু তিনি যে শুধু নর্মদার পারে পারে তত্ত্বানুসন্ধান করছেন তাই নয়, স সম্ভব ধ্যানধারণা, জিক্‌র্-তস্‌বী, যোগাভ্যাস, সূফী-চিত্তবৃত্তি নিরো করে থাকেন।

অতিশয় সবিনয় কিন্তু কিন্তু করে নিবেদন করলুম, 'আপনার য কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন না।"

'কী দরকার! এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। আপনাদের অসুবি হবে হয়তো।'

আমি বললুম, 'আমি তো একা থাকি। মাত্র একটি পাচ আছে। তবে সে মাছ-মাংস ছোঁয় না। ফলে আমিও বাড়ি নিরামিষাশী। আপনার একটু কষ্ট হবে। আর আমার দিন কা কলেজে। অপরাহ্ণ আর রাত্রির এক যাম কাটাই আমার পা সহকর্মী অধ্যাপক ওয়াডিয়ার বাড়িতে।'

জানিনে, হয়তো এই নিরামিষের চ্যালেঞ্জ মৎস্যভুক বঙ্গসন্তান আমার বাড়িতে নিয়ে আসে।

কিন্তু আমীন মিঞা যদিও মাঝে মাঝে আমাকে নর্মদার পী ফকীর সাধুসন্ন্যাসীদের কাহিনী শোনাতেন তবু তিনি ছিলেন ঘোর সংসারী। প্রতি ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে পাচক ইন্দ্ররায় নিয়ে বেরুতেন বাজারে। কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরে কুটে কুটতেন, কয়লা ভাঙতেন, উনুন ধরাতেন আর ইন্দ্ররায়কে হা

লমে বাতলাতেন কি প্রকারে ছানার ডালনা, ধোঁকার ঝোল, ড়ির চচ্চড়ি তৈরি করতে হয়।

আমি অত বোকা নই। আমি বুঝে গিয়েছি, তিনি কারো দ্ধারোহণ করে মুক্ষতে থাকতে চান না। বরং যদ্যপি আমি সংসার লানো বাবদে একটা আস্ত অগা, তথাপি লক্ষ্য করলুম, চিরকুমারকে বাহ বাবদে উৎসাহিত করে লোকে যে বলে, 'টু ক্যান লিভ্ অ্যাজ পলি অ্যাজ ওয়ান'—স্বামীস্ত্রীর যা খরচা অবিবাহিত পুরুষেরও ই খরচা—সেটা কিছু মিথ্যে প্রলোভনকারী স্তোকবাক্য নয়। জনার খরচাতে তিনজনেরও চলে। তদুপরি তখন ছিল সস্তাকড়ির জার।

বড় আনন্দে বড় শান্তিতে কেটেছিল ঐ ছ'টি মাস। কখনো ামীন মিঞার ঘরে, কখনো ৺বিনয়তোষের বারান্দায়, কখনো য়াডিয়ার রকে আমাদের চারজনাতে নানাপ্রকারের আলোচনা তো। সবচেয়ে মজার লাগত, বিনয়তোষ তন্ত্রঘেঁষা, আমীন মিঞা ক্তিমার্গের সূফী, আর বরদা-আহমদাবাদ, সুরাট বোম্বাইয়ের াবজ্জন জানতো, চার্বাকের পর সোহরাব ওয়াডিয়ার মত পাঁড় াস্তিক কস্মিনকালেও ইহভুবনে অবতীর্ণ হন নি।

তারপর একদিন আমাদের কাউকে, এমন কি তাঁর জান দিলের াস্তো ইন্দ্ররায়কে ছায়ামাত্র আভাস-ইঙ্গিত না দিয়ে আমীন মিঞা এক গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রে নিরুদ্দেশ। জানতুম, অনুসন্ধান থা, তবু আমরা তিনজনাই মাঝে মধ্যে সেটা করেছিলুম। কোনো ল হয় নি।

তার পরিপূর্ণ ত্রিশ বৎসর পর আবার আমাদের চারি চক্ষে মলন।

পীরও কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন ; তবে পীর, পুলিশ, ব্যারিস্টার, াক্তার সংসারের এত শত বিচিত্র জিনিস দেখবার সুবিধে-কুবিধে

পান যে তাঁদের অভিজ্ঞতার কেলাইডেস্‌কোপ যত বিচিত্র প্যাটার্নই তৈরি করুক না কেন এঁরা সংবিৎ হারান না। 'কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে, কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে?' এই অপ্রত্যাশিতের আশা কবিদের—পীর পুলিশের নয়।

ততক্ষণে আমি সংবিতে ফিরেছি। আদব মাফিক মাথা ঝুঁকিয়ে ওঁকে একটা সালাম জানিয়েছি। তিনি প্রত্যভিবাদন জানালেন। যদিও আমার শোনা ছিল, বহু পীর বহু গুরু প্রতিনমস্কার করেন না।

কারণ এত রবাহূত, অনাহূত এমন কি অবাঞ্ছিত জনও পীরের ঘরে সুবো-শাম্ আনাগোনা করে যে এক পলিটিশিয়ান ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণীর সাধ্য নেই যে, প্রত্যেককে ব্যক্তিগত 'সালামালিক' জানায়, বা 'শতংজীব' বলে।

আস্তানায় গিয়েছিলুম বেলা প্রায় চারটার সময়। ঐ সময় 'আসরের নামাজ' বা অপরাহ্ণকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। পীর-সাহেব আসন ত্যাগ করে অন্য ঘরে চলে গেলেন—অনুমান করলুম, নামাজ পড়তে। মুরীদান (শিষ্য সম্প্রদায়) পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে রওয়ানা হলেন। আমি 'কি করবো, কি করবো' ভাবছি এমন সময় একজন গেরেমভারী চেলা এসে আমাকে কানে কানে বললেন, 'হুজুর আপনাকে তসলিমাৎ জানিয়েছেন। হুজুরের নামাজ-ঘরে একটুখানি আসবেন কি?' যে সসম্ভ্রম-কণ্ঠে চেলাটি আমাকে দাওয়াৎ-সন্দেশটি জানালেন, তার থেকে অনায়াসে বুঝে গেলুম যে পীরের নামাজ-ঘর হোলি অব্ হোলিজ, সান্‌থটুম সান্‌কটরুম, হিন্দু-মন্দিরের গর্ভগৃহপ্রায়। সেখানে প্রবেশাধিকার অল্পজনেরই। আর আমি প্রথম ধাক্কাতেই!

নামাজ-ঘরে ঢুকতেই পীর আমাকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর ঘরের এককোণে পাতা একখানি সিলেটি শেতলপাটিতে আমাকে বসালেন, নিজেও বসলেন। দু' একটি কুশলপ্রশ্ন শুধিয়ে বললেন, 'আপনি একটু নাশ্‌তা করুন। ততক্ষণে আমি নামাজটি সেরে নি।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি করে হয়? আপনি নামাজ সারুন। তারপর একসঙ্গে খাব।'

অভিমানভরা কণ্ঠে পীর আমীন বললেন, 'এই তো আপনার সখার প্রতি ভালোবাসা, আর এই তো আপনার স্মৃতিশক্তি! আমি যে দিনে একবার খাই সেও ভুলে গেছেন?'

আমি বেহদ্ শরম পেলুম। এটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। তাই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আমার মত মূর্খের মাথায়ও একটি মিথ্যা সদুত্তর জুটে গেল—নিছক আল্লার মেহেরবানীতেই বলতে হবে। কারণ আসমান-জমীনে কে না জানে, মা সরস্বতী মূর্খকেই (যথা কালিদাস) হরহামেশা দয়া করেন; নইলে চালাকরা নিশ্চয়ই এতদিনে আমার মত কুল্লে বেওয়ারিশ বেকুবের সর্বস্ব গ্রাস করে, আমাদের 'সত্য নাশ' করে আমাদের পিতামহাশয়দের নির্বংশ করতো।

সেই কিস্মৎ-প্রসাদাৎ প্রাপ্ত কদুত্তরটি দিতে গিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললুম, 'তা-তা-তা, সে-সে, সে তখন আপনি—আপনি ছিলেন আমার গরীবখানায়—'

পীরের কপালে যেন হাল্কা মেঘের সামান্য আবছা পড়েছে। তাই দেখে আমি থেমে গেলুম। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আর এখন আমি পীর—না? এখন আমি যত খুশী গাণ্ডেপিণ্ডে গোগ্রাসে যত চাই তত গোস্ত গিলতে পারি—না?'

থেমে গেলেন। আমি আশঙ্কা করেছিলুম, এর পর তিনি আমাকে খোঁটা দিয়ে বলবেন, 'তাই আমি পীর হয়েছি—না? চেলাদের ঘাড় ভেঙে তাদের মগজ দিয়ে মুড়ি-ঘণ্ট খাবো বলে—না?'

না। এ লোকটি যে অতিশয় ভদ্র।

আমি চুপ করে গিয়েছি দেখে বললেন, 'ভাই সৈয়দ সাহেব, আমি জানি, আপনি খাঁটি পীরের নাতি। আপনি কথার মুখে কথায় কথায় ওটা বলে ফেলেছেন।'

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'আমি যে পীরের নাতি সেটা মেহেরবানী করে আর তুলবেন না, সেটা দয়া করে ভুলে যান। আপনি তো নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, ধর্মবাবদে আমি একটা আস্ত চিনির বলদ। ওটা দেখেছি, শুঁকেছি, ওর দরদাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি, কিন্তু ওটা কক্‌খনো চাখি নি—খেয়ে দেখা তো দূরে।'

তিনি বললেন, 'এসব কথা পরে হবে; কেন আমি এখানে আছি, কেন আমি 'পীর' রূপে এখানে 'দর্শন' দিচ্ছি—'

ইতিমধ্যে সেই গেরেমভারী চেলা একটা বিরাট ট্রে নিয়ে এসে আমার পাশে রেখেছেন। তার উপর অতিশয় সযত্নে সাজানো দু'খানি মুড়মুড়ে চেহারা তেকোনা পরোটা, গ্রেট ঈস্টারনের পাঁউরুটির মত ফোলানো টেবো-টোবো বিরাট একটি মম্‌লেট, ডুমো-ডুমো আলু-ভাজা, এবং কাঁচা-লঙ্কার আচার।

আমি আবার পেলুম দারুণ শক্। এ-সব যা এসেছে এ তো আমার জন্য তৈরি করা শহ্‌র্-ইয়ারের ফেভারেট মেনু!

এ তো আমাদের উভয়ের প্রিয় মেনু!

কি করে শহ্‌র্-ইয়ার জানলো, আমি এখানে এসেছি?

কিন্তু এ-শক্‌টা সামলাতে না সামলাতে পেলুম এর চেয়ে মোক্ষমতর দুসরা শক্।

পীরসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, শহ্‌র্-ইয়ার বানু।' আর কিছু না বলে খাটে উঠে নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন।

সতরো

আমি মিরাক্‌ল্‌ বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাস করিনে। যে ইরান কর্তাভজাগিরিতে ভারতের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে তারই এক গুণীজন হাফ-মস্করা করে বলেছেন :

'পীরেরা ওড়েন না, ওঁদের চেলারা ওঁদেরকে ওড়ায়।'

'পীরহা নমীপরন্‌দ্‌, শাগিরদান উনহারা মীপরান্‌দ্‌।'

বিশেষতঃ, এই পীর আমিন সাহেবকে আমি অন্তরঙ্গভাবে একদা চিনেছিলুম। তিনি যে এ-রকম একটা বাজে স্টান্‌ট্‌ মারবেন—খাস করে আমার উপর—যে, তিনি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ধরে ফেলেছেন, আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের সন্ধানে এসেছি সেটা আমি বিশ্বাস করতে নারাজ। কাজেই সে-কথা পরে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার জানলো কি করে যে আমি এখানে এসেছি?

সে নিজে পর্দা মানে না, কিন্তু পীরসাহেব যে তাঁর শিষ্যাদের সম্পর্কে কিছুটা মানেন সেটা দোতলার চিক্‌ পর্দা থেকে খানিকটে অনুমান করেছিলুম। কিন্তু সেই চিকের আড়াল থেকে শহ্‌র্‌-ইয়ার যে উঁকিঝুঁকি মারবে সে-রকম মেয়ে তো সে নয়। বরঞ্চ আজকের মত মেনে নিলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ার অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়েছে। আজ বাড়ি ফিরে যদি কথা ওঠে, তবে সেই ইরানী গুণীর হাফ-মস্করাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে তাকে বলবো—

'পীরেরা ওড়েন না, কিন্তু ওঁদের চেলাদের, বিশেষ করে 'চেলী'দের কেউ কেউ ওড়েন।'

'পীরহা নমীপরন্‌দ্‌, ওয়া লাকিল বা'জী শাগিরদান খসুসান জনানা মীপরন্‌দ্‌।'

এতে তাজ্জব বনবার মত কী-ই বা আছে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বজয় করেন নি কিন্তু তাঁর শিষ্য বাগ্মীরাজ বিবেকানন্দ করেছিলেন!

একজন নমাজ পড়ছেন, তার অনতিদূরে আরেকজন খাচ্ছে—এটা দৃষ্টিমধুর না হলেও ইসলামে বারণ নয়। হুঁঃ! বারণ হবে কেন? দূর সম্পর্কের আমার ফুফুকে দেখেছি, বাচ্চার মুখে মাই তুলে দিয়ে তসবী-মালা জপ করতে।

আমি কোনো প্রকারের শব্দ না করে মিনিমামতম পরোটা খাচ্ছি—যদ্যপি শহর্-ইয়ারের আপন হাতে সযত্নে তৈরি (এটা ভুল বললুম, তাকে আমি অযত্নে কখনো কোনো কাজ করতে দেখি নি) খাস্তা, ক্রিস্প্, মুড়মুড়ে পরোটা মর্মরধ্বনিবিবর্জিত কায়দায় খেতে পারাটা একটি মিনি-মিরাক্‌ল্—এমন সময় আমার চিন্তাম্বরের এক প্রান্তে একটি বিদ্যুল্লেখা খেলে গেল।

ওঃ! তোমার আপন বাড়িতে আমি কি খাই না-খাই সে-বাবদে তুমি আমার যত না দেখ-ভাল করো তার চেয়ে এখানে তোমার হুঁশিয়ারি ঢের বেশী টনটনে! গুরুর বাড়ির ইজ্জৎ? না?

অভিমানভরে হাত-চলা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবেকাম্বরে আরেকটি সৎ বুদ্ধির বিদ্যুল্লতা শাখা-প্রশাখা মেলে দিল:

আমি কী নেমকহারাম! মাত্র অর্ধদিবস, তার চেয়েও কম, হয়তো সম্পূর্ণ অজানায়, সে বাড়িতে ছিল না বলে আমি আমার পরিচিত পরিচর্যা পাই নি। আর সঙ্গে সঙ্গে বেবাক ভুলে গেলুম তার এত দিনের দিল্-ঢালা খেদমৎ, প্রাণ-ভরা সেবা? ছিঃ! এ তো সেই প্রাচীন কাহিনীর নিত্যদিনের পুনরাবৃত্তি! যে-লোক একদা আমাকে হাতি দিয়েছে, ঘোড়া দিয়েছে, সে আজ বেরালটা দিল না বলে তন্মুহূর্তেই নির্লাজ নেমকহারামের মত তাবৎ অতীতের অকৃপণ

ান ভুলে গিয়ে 'মার মার, কাট কাট' হুহুঙ্কার ছেড়ে তার পশ্চাতে াওয়ার নিয়ে তাড়া করা!

তদুপরি আরেকটা রীতি-রেওয়াজ মনে পড়ল। যদিও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তবু বিশ্বস্তজনের কাছে শুনেছি, যে পীরের কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে সেখানেই মহিলা-শিষ্যারা আপন হাতে রান্না-ান্না করে, নাশ্‌তা বানিয়ে সমাগত জনের সেবা করেন। এ-রীতি তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যে কাজ যারা উত্তমরূপে করতে পারে বিধাতা তাদেরই স্কন্ধে স কাজ চাপান।

নইলে তিনি শেয়ালের কাঁধে দিতেন সিংহের কেশর, বেরালকে দিতেন হাতির শুঁড়।

শহ্‌র্-ইয়ার যে বস্তু সব-চেয়ে ভালো তৈরি করতে পারে সেইটেই করেছে।

মনে শান্তি পেলুম। পীর মিরাক্‌ল্ করতে পারুন আর না-ই পারুন, বহু তৃষিত নরনারী শুষ্ক হৃদয় নিয়ে যেখানে ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে সেখানে আল্লাতালা কিছু-না-কিছু শান্তির সুধাবারি বর্ষণ করবেনই করবেন।

এর সঙ্গে অবশ্য আরেকটি কথা যোগ দিতে হয়। শহ্‌র্-ইয়ারকে আমি দিনে দিনে, এতদিনে যে-ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তারপর তার যে-কোনো আচরণ—সে আপাতদৃষ্টিতে যতই অপ্রিয় হোক্—গ্রহণ করতে গোপনে গোপনে সে-হৃদয় সব সময়ই তৈরি। চোরাবাজারীর চোরাই মাল নেবার জন্য কালোবাজারী যে-রকম তৈরি থাকে।

প্রসন্ন মনে আবার হাত চালালুম। পরোটার অন্যপ্রান্ত চুরমুড়ুলুম।

অপরাহ্নের যে-আস্‌রের নমাজ পীর পড়ছিলেন শাস্ত্রাদেশে সেটি হ্রস্ব।

পীরসাহেব পনরো মিনিটের ভিতর নামাজ শেষ করে উঠলেন আমিও উঠে দাঁড়ালুম। তিনি ঘরের এক কোণ থেকে একট ভাঁজকরা ডেক চেয়ার টেনে এনে আমার সামনে সেটি পেতে বসলেন।

আমি চুপ করে আছি। যদিও একদা তিনি আমার সখা ছিলেন তবু তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বাক্যালাপ তিনিই আরম্ভ করবেন।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না; তিনিই বললেন, 'শহর্ ইয়ারের কথা ভাবছি।'

আমার মনে সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরোদয় হলো, তিনি জানলেন কি করে, আমি শহর্-ইয়ারের সন্ধানে এখানে এসেছি? তবু চুপ করে রইলুম।

বললেন, 'আমার কাছে অনেক লোক আসে। মনে আছে আপনার;-আমরা যখন একসঙ্গে বরদাতে বাস করতুম তখন একদিন আপনি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমাকে পড়ে শুনাচ্ছিলেন?—

'ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে, 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে'।"

রবীন্দ্রনাথ মহান কবি। তিনি মানুষের কামনা-বাসনার সংক্ষিপ্ত একটি ফিরিস্তির ব্যঞ্জনা দিয়ে বাকিটা বিদগ্ধ পাঠকের কল্পনাশক্তির উপর বরাৎ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে তো কল্পনা করতে হয় না। মানুষের সম্ভব অসম্ভব সব অভিলাষই আমাকে শুনতে হয়। বিশ্বাস করবেন কি, সৈয়দ সাহেব, জাল দলীলপত্র তৈরি করে, ভেজাল মোকদ্দমা রুজু করে আমার কাছে স্বেচ্ছায় অকপটে সেই কপটত

কবুল করে অনুরোধ জানায় আমি যদি তার জন্য সামান্য একটু দোওয়া করি তবে সে মোকদ্দমাটা জিতে যায়!'

আমি বিস্ময় মেনে বললুম, 'সে কি?'

ম্লান হাসির ইঙ্গিত দিয়ে পীর বললেন, 'উকীল, বৈদ্য আর পীরের কাছে কোনো কিছু লুকোতে নেই, এই হলো এদের বিশ্বাস। বিশেষ করে পীরের কাছে তো নয়ই। কারণ তিনি নাকি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে মনের গোপন কথা দেখতে পান! এক পীরসাহেব তো কোনো মেয়েছেলেকে সামনে আসতে দিতেন না, কারণ তাঁর "আধ্যাত্মিক" শ্যেনদৃষ্টি নাকি কাপড় জামা ভেদ করে সব-কিছু দেখতে পায়!'

আমি বললুম, 'থাক!'

'আপনি তো জানেন, আমি পারতপক্ষে ভালোমন্দের যাচাই করতে যাইনে। তবু শুনুন, সেদিন এক মারওয়াড়ি জৈন এসে উপস্থিত। ওদিকে জৈন কিন্তু এদিকে করুণাময়ের করুণাতে তার অশেষ বিশ্বাস। লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ হলো। বড় সরল, অকপট, সজ্জন। ইতিমধ্যে শহ্‌র্-ইয়ার তাঁর জন্যে এক জাম-বাটি লস্‌সী পাঠিয়েছে। আমাদের কথাবার্তা সে বারান্দায় আড়ালে বসে শুনছিল। তার থেকে অনুমান করেছে, ইনি ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না, নইলে হিন্দু অভ্যাগতদের অনুমতি ভিন্ন সে কোনো খাবারের জিনিস ওঁদের সামনে পেশ করে না। আর আপনি তো জানেন, মেয়েটির দেহমনহৃদয় কতখানি সরলতা দিয়ে গড়া। সে মোহমুক্ত বলে প্রায়ই ভুল করে ভাবে ইহসংসারের সবাই বুঝি তারই মত সংস্কারমুক্ত।—শহ্‌র্-ইয়ারের কথা কিন্তু পরে হবে। এবারে সেই মারওয়াড়ি সজ্জনের কথা শুনুন।···লস্‌সী সামনে আসতেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। আমি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললুম, "না, না, আপনাকে খেতে হবে না। আপনি হয়তো যত্রতত্র পানাহার করেন না। সেটা তো কিছু মন্দ আচরণ নয়। আমিও তো বাড়ির বাইরে কোথাও খাইনে।" তখন তিনি কি বললেন জানেন? তিনি

নিরামিষাশী। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, লস্‌সী আবার আমিষ হয় কি প্রকারে? তিনি যা বললেন তার অর্থ একটা পশুর রক্তমাংস নিংড়ে যে নির্যাস বেরয় সেটা সব চেয়ে কড়া আমিষ। তিনি খান—না, পান করেন সুদ্ধুমাত্র ডাবের জল। অন্য কোনো-কিছু খান না সুদ্ধুমাত্র ডাবের জল খেয়ে লোকটি গত পঁচিশ বৎসর ধরে বেঁচে আছে!'

আমি বললুম, 'এ-ধরনের ডায়েটিং হয়, সে তো জানতুম না।'

পীর বললেন, 'আপনি ভাবছেন, আমি পীর ব'নে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি বলে আমার আর-কিছু জানবার নেই, শেখবার নেই! হাজার দফা ভুল! নিত্যনিত্য শিখছি। তার পর শুনুন, বাকিটা। হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া নেই, ভদ্রলোক দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে যা বললেন তার অর্থ, তাঁর ছেলেটা জাহান্নমে গেছে। মদমাংস মেয়েমানুষ নিয়ে অষ্টপ্রহর মেতে আছে। বুঝুন ব্যাপারটা, সৈয়দ সাহেব। যে-লোক মাছমাংস, এমনকি দুধ পর্যন্ত না খেয়ে অজাতশত্রু হয়ে জীবনধারণ করতে চায়, তারই একমাত্র পুত্র হয়ে উঠেছে তার সব চেয়ে বড় শত্রু! তার পরিবারের শত্রু, তার বংশপরম্পরার ঐতিহ্যের শত্রু, পিতৃপিতামহের আচরিত ধর্মের শত্রু।

সর্বশেষে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোনো পাপ করেছিলুম, তার জন্য আজ আমি এই শাস্তি পাচ্ছি। আপনি আমার ছেলের জন্য দোওয়া করুন।"

বলুন তো, তার সঙ্গে তখন পূর্বজন্ম পরজন্ম আলোচনা করে কী লাভ! আর দোওয়া তো আমি সকলের জন্যই করি, আপনিও করেন, কিন্তু, আমি কি মিরাক্‌ল্ করতে পারি?'

তার পর পীর বেদনাপীড়িত কণ্ঠে বললেন, 'কেন লোকে বিশ্বাস করে, আমি অলৌকিক কর্ম করতে সক্ষম!'

পীরসাহেব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন বলে আমাকে বাধ্য হয়ে সে-নীরবতা ভঙ্গ করতে হলো। বললুম, 'আপনাকে এ-সব

ব্যাপারে আমার কিছু বলতে যাওয়া গোস্তাকি হবে। অপরাধ নেবেন না। তবু বলি, এ-সব লোক আসে আপনার কাছে ভক্তি-বিশ্বাসসহ। আপনি তাদের জন্য দোওয়া-আশীর্বাদ করলেই তারা পরিতৃপ্ত হয়।'

পীর বললেন, 'ঠিক। আমি তাই মারওয়াড়িকে বললুম, "আপনি শান্ত হোন।" তারপর তাঁকে এই নামাজের ঘরে এনে দু'জনাতে একাসনে বসে আল্লার কাছে দোওয়া মাঙ্‌লুম।'

এর পর পীর একদম চুপ মেরে গেলেন বলে আমাকে বাধ্য হয়ে শুধোতে হলো, 'তার পর কি হলো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তার পর দীর্ঘ তিন মাস ধরে সে ভদ্রলোকের আর দর্শন নেই।'

তারপর আমি শহ্‌র্-ইয়ারের মুখে খবর পেলুম, ছেলেটি নাকি সৎপথে ফিরে এসেছে, এবং সে-ভদ্রলোক আমাদের পাড়ার জরাজীর্ণ মসজিদটি নিজের ত্রিশ হাজার টাকা খর্চা করে মেরামত করে দিয়েছেন। ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, হয়তো আমি মুসলমান বলেই।

আচ্ছা, এবারে বলুন তো, এর মধ্যে আমার কেরামতি—মিরাক্‌ল্ কি?'

আমি আর কি বলি! কাকতালীয় হতে পারে, আল্লার অযাচিত অনুগ্রহ হতে পারে। কে জানে কি? আমি চুপ করে নিরুত্তর রইলুম।

পীরসাহেব তখন স্মিতহাস্য করে বললেন, 'শহ্‌র্-ইয়ার কিন্তু তখন কি মন্তব্য করেছিল জানেন?

কিন্তু আমি অতশত নানাবিধ জিনিস আপনাকে বলছি কেন বলুন তো? ঐ সব শত শত হরেক রকমের লোকের মাঝখানে এখানে এল শহ্‌র্-ইয়ার।

কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করবেন তো, শহ্‌র্-ইয়ার তখন কি মন্তব্য করেছিল?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে পীরসাহেব বললেন,

ভক্ত কবীরের কাছে কে কি চেয়েছিল, সে তো জানেন। আমি কবীর সাহেবের পদধূলি হবার মত যোগ্যতাও ধরিনে, তবু আমারই কাছে কারা কি চায়, তার দুই প্রান্তের দু'টি এক্‌স্‌ট্রীম উদাহরণ আপনাকে দিলুম।

আজ পর্যন্ত আমি যে-সব পীরদের আস্তানায় ঘুরেছি, এবং আমার এই ডেরাতে যারা আসে, এদের ভিতর এমন একজনও দেখি নি, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দিল্ নিয়ে এসেছে। অবশ্য বেশ-কিছু লোক আসেন তথাকথিত 'শাস্ত্রালোচনা' করতে। সেও এক বিলাস, ফ্যাশান। তা হোক্। আল্লা পাক্ কার জন্য কোন্ পথ স্থির করে দিয়েছেন, তার কী জানি আমি!

এরই মাঝখানে এল শহ্‌র্-ইয়ার। এক মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সে কোনো কামনা নিয়ে আসে নি। বিশ্বাস করবেন না, সে আজ পর্যন্ত এক বারের মতও আমার সঙ্গে 'শাস্ত্রালোচনা' পর্যন্ত করে নি। এ যাবৎ একটি প্রশ্নমাত্রও শুধোয় নি।'

আমি হতভম্ব হয়ে শুধোলুম, 'সে কি?'

'হ্যাঁ। এটা আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হতে পারে। সেটার সমাধান হলো, একদিন যখন শুনতে পেলুম, শহ্‌র্-ইয়ার কার যেন প্রশ্নের উত্তরে জনান্তিকে বলছে, সে এমন কিছু জিনিয়াস নয় যে উদ্ভট নতুন কোনো প্রশ্ন শুধোবে। সে নাকি অতিশয় সাধারণ মেয়ে। তার মনে অতিশয় সাধারণ প্রশ্নই জাগে। সেগুলো কেউ না কেউ আমাকে শুধোবেই। আমি উত্তর দেব। ব্যস্, হয়ে গেল। কী দরকার ওঁকে—অর্থাৎ আমাকে—বিরক্ত করে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা হলে সে আপনার শিষ্যা হলো কেন?'

পীরসাহেব একটু চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে বললেন,

আমার কোনো শিষ্য শিষ্যা নেই। আমি কখনো মুর্শিদরূপে মন্ত্র দিয়ে কাউকে শিষ্য বা শিষ্যারূপে গ্রহণ করি নি!'

আমি হতভম্ব।

ইতিমধ্যে বিস্তর লোক পাশের ঘরে জমায়েৎ হয়েছে।

এবং সান্ধ্য নামাজের আজান শোনা গেল।

পীর এবার এদের সঙ্গে নামাজ পড়বেন। তারপর শাস্ত্রালোচনা তত্ত্বালোচনা হবে হয়তো।

আমি হতভম্ব অবস্থাতেই বিদায় নিলুম।

আঠারো

যা জানতে চেয়েছিলুম তার কিছুই জানা হলো না ; কল্পনায় যে ছবি এঁকেছিলুম তার সঙ্গে বাস্তবের ফিঙ্গার প্রিণ্ট একদম মিলল না। উল্টে রহস্যটা আরো ঘনীভূত হলো। কোনো-কিছুর সঙ্গে কোনো কিছুই খাপ খাচ্ছে না।

আমি কলকাতা থেকে আকছারই ট্রেনে করে বোলপুর যাই। একবার বোলপুর স্টেশনে ঢোকার পূর্বে সব-কিছু কেমন যেন গোবলেট্ পাকিয়ে গেল। কই, এতক্ষণে তো অজয় ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়িটা গমগম করে পেরবে, তার পরে বাঁ দিকে পুকুর, ডানদিকে জরাজীর্ণ একটা দোতলা—কই সে-সব গেল কোথায় ? উল্টে মাথার উপর দিয়ে হুশ করে একটা ওভারব্রিজ চলে গেল ! এটা আবার রাতারাতি কবে তৈরি হলো ! তখন হঠাৎ আমার হুঁশ হলো, এবারে আমি কলকাতা থেকে বোলপুর আসছি না, আসছি ভাগলপুর থেকে। অর্থাৎ আমি স্টেশনে ঢুকছি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে নয়, উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কিবাজি। উত্তর হয়ে গেল দক্ষিণ, পূব হয়ে গেল পশ্চিম। বাইরের দুদিকের দৃশ্য ফটাফট্ ফিট করে গেল।

তবে কি আমি শহ্‌র্-ইয়ার রহস্যের দিকে এগুচ্ছিলাম উল্টো দিক দিয়ে ? তবে কি আমার অবচেতন মন প্রতীক্ষা করছিল, পীর আমার দিক্-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেবেন আর সঙ্গে সঙ্গে শহ্‌র্-ইয়ার রহস্য অর্থাৎ তার আকস্মিক গুরু ধর্মের কাছে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ, সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঔদাস্য, ত্রিযামা যামিনী-ব্যাপী জপ-জিক্‌র্—এসব তার পূর্ববর্তী জীবনের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে ফিট করে যাবে, সর্ব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে ?

বরঞ্চ পীর যে সব ছুটি একটি তথ্য পরিবেশন করলেন সেগুলো যেন চকিতে চকিতে বিজলী আলো হয়ে চোখেতে আরো বেশী ধাঁধা লাগালো।

সিঁড়ি দিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে নামছি এমন সময় জানা-অজানায় লক্ষ্য করলুম, কালো নক্সনপেড়ে শাড়ি-পরা একটি বৃদ্ধা মহিলা নেমে যাচ্ছেন। মনে হলো হিন্দু বিধবা। আকণ্ঠ রহস্যনিমজ্জিত অবস্থায়ও আমার মনে রক্তিভর কৌতুক সঞ্চারিত হয়ে মানসিক মৃদুহাস্য বিকশিত হলো।···কে বলে, এদেশে হিন্দু মুসলমান সুদ্ধু ঝগড়া-ফসাদই করে! যান্ না, যে কোনো পীর-মুর্শিদ গুরু-গোঁসাইয়ের আস্তানায়। হিন্দু-মুসলমান তো পাবেনই, তদুপরি পাবেন গণ্ডাখানেক দিশী সাহেব, দু'চারটি খাস বিলিতি গোরা। তবে হ্যাঁ, কবিরাজ ওমর খৈয়াম বলেছেন, সর্ব ধর্মের সর্বোত্তম সম্মেলন পাবে শুঁড়িখানায়। সেখানে সব জাত, সব জাতি, সব ধর্ম সম্মিলিত হয়ে নির্বিচারে একাসনে বসে পরমানন্দে মদিরাপাত্রে চুম্বন দেয়।*

কিন্তু ভুললে চলবে না, সুফী-ফকীর সাধুসন্তরা সাবধান করে দিয়েছেন, এ-স্থলে মদিরা প্রতীক মাত্র, সিম্‌বল্। মদিরা বলতে এ-স্থলে ভগবদ্‌প্রেম বোঝায়। তাইতো পীর গুরুর আস্তানায় এত শত ছাপ্পান্ন দেশের ইউনাইটেড নেশন, এবং তারো বাড়া, ইউনাইটেড রিলিজিয়ন ইউনাইটেড জাতবেজাতের সম্মেলন। এরা এখানে এসে জন্মগত পার্থিব সর্বপার্থক্য অগ্রাহ্য করে গুরুমুর্শিদ—যিনি সাকী—

* ইরানের এক গণ্যমান্য সভাকবি নাকি নিকৃষ্টতম শুঁড়িখানায় চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মদ্যপান করছিলেন। নগরপাল মারফত খবরটা জানতে পেরে বাদশা নাকি অনুযোগ করাতে কবি একটি দোহা রচনা করেন.

"হাজার যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ঐ তারা
গোষ্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত; তাই হ'ল মানহারা!"

শবনম্, পৃ ১০।

তাঁর হাত থেকে ভগবদ্‌প্রেমের পেয়ালা-ভরা শরাব তুলে নেয়।··· থাক্‌গে এসব আত্মচিন্তা।

ততক্ষণে পেভমেণ্টে নেমে গিয়েছি।

সামনে দেখি একটা বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান মর্দ—কেমন যেন ঈষৎ চেনা-চেনা—একটা কালো মটর গাড়ির স্প্রিং-ভাঙা দরজাটা নারকোলের সরু দড়ি দিয়ে বাঁধছে।

আমার পাশে ততক্ষণে সেই বৃদ্ধা হিন্দু বিধবাটি এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে সেই জোয়ান (মিলিটারি অর্থে নয়, রূঢ়ার্থে) তাঁর দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার চোখের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই একে অন্যকে চিনে ফেললুম।···বেশ কয়েক বছর পর পুনর্মিলন।

এ তো আমার শ্বশুরবাড়ির ছ্যাশের লোক। নাম, ভূতনাথ খান। 'খান' পদবী মুসলমানের হলেও ওটা ওদের সম্পূর্ণ একচেটে নয়। খান হিন্দুসন্তান।

'তুমি এখানে?' অবাক হয়েই শুধোলুম। খানকে আমি চিনি। মহা পাষণ্ড। দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, পীর মুর্শিদের তো কথাই ওঠে না।

'আপনি এখানে?' সেও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। কারণ সে বিলক্ষণ জানতো আমি পীরটীরের সন্ধানে কখনো বেরুই না। খান ঝাণ্ডু ছোকরা। তাই পুরো পাক্কা 'তরুণ', 'মডার্ন' হয়েও প্রাচীন প্রবাদে বিশ্বাস করে, কাগে কাগের মাংস খায় না।

বৃদ্ধাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে সে তাঁকে মোটরের পিছনের সীটে বসালো, কোনো প্রকারের প্রতিবাদ না শুনে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সামনে বসালে। স্টার্ট দিতে দিতে পিছনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'ঠাকুমা, এঁকে তুমি কখনো দেখ নি, কিন্তু চিনবে। তোমার ঐ শাজাদপুরের প্রতিবেশী মৌলবী বশীরুদ্দীনের মেয়েকে বিয়ে করেছেন—'

বাকিটা কি বলেছিল আমার কানে আসে নি। বৃদ্ধা তাকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'চুপ কর্—' বলে তাঁর কম্পিত শীর্ণ হস্ত আমার মস্তকে রেখে বার বার আশীর্বাদ করতে লাগলেন। খানের সেই ভিণ্টেজকারের নানাবিধ কর্কশ কানফাটা কোলাহল ভেদ করে যে ক'টি শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছল তার একটি বাক্য শুধু বুঝতে পারলুম, "আঃ! তুমি আমার বশীর ভাইসাহেবের মাইয়ারে বিয়া করছো।" বুড়ি একই কথা বার বার আউড়ে যেতে লাগলেন।

আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হলো, বুড়ির কাপড়ের খুঁটে আকব্বরী মোহর বাঁধা ছিল না বলে তিনি সাড়ম্বর জামাইয়ের মুখদর্শন কর্ম সমাধান করতে পারলেন না। বুড়ি পিছনের সীটে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লেন। হায় দিদিমা, তুমি হয়তো এখন মনে মনে চিন্তা করছো, জামাইরে কি খাওয়াইমু!

আমি খানকে শুধালুম, 'তুমি ঐ পীরের আস্তানায় জুটলে কি করে?'

খান তার সেলফ-মেড্ একটা সিগরেট আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, না. আমার কোনো ইনট্রেস্ট্ নেই। ঠাকুরমাকে আপসে যাওয়ার সময় ড্রপ্ করে যাই, ফেরার সময় দুই এক পেগ স্যাঁট স্যাঁট করে নামিয়ে, ঠিক মগরীবের নমাজের ওক্তে তাঁকে ফের পিক্ অপ্ করে নি—'

ঠাকুরমা যাতে শুনতে না পান তাই ফিসফিস করে শুধালুম, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমি তো জানতুম, তোমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। তিনি আবার এই মুসলমান পীরের কাছে এলেন কি করে?'

খান বললে, 'অতি সহজ এর উত্তর। তাঁর নাতনীর মারফত। সেই নাতনীর এক ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঠাকুরমার পরিচয় হয়। মেয়েটা মুসলমান।'

'ওরে বাব্বা!'

শিউরে উঠে ভূতনাথ খান বললে, 'অগ্নিশিখা, মশাই, অগ্নিশিখা। অগ্নিকুণ্ডও বলতে পারেন। জহরব্রতের অগ্নিকুণ্ড। যেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় লেডি-কিলার ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিতে পারে! কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো নটবরই সে-অগ্নিকুণ্ডের কাছে যাবারও ইজাজৎ পান নি —ঝাঁপ দেওয়া দূরের কথা। লেডি-কিলার হিসেবে আম্মো কম যাই নে, হেঁহেঁ হেঁহেঁ, কিন্তু ঐ মুসলমানীর দিকে এক নজর বুলোতেই— সে তখন পীরসাহেবের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছিল—হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলুম এ-রমণী ফাঁসুড়ে। তার একটিমাত্র চাউনি যেন অদৃশ্য একখানা রুমালে পরিবর্তিত হয়ে সাঁ করে উড়ে এসে লটবর-বাবুর গলাটিতে ফাঁস লাগিয়ে, জস্‌ট্ স্ট্রেঙ্‌ল্‌স্ হিম্ টু ডেথ, কিংবা বলতে পারেন, তার হী-ম্যান হবার প্ল্যানটি নস্যাৎ করে দেয়! বাপ্‌স্।'

রগ্‌রগে বর্ণনাটা শুনে আমার মনে কেমন যেন একটু কৌতূহল হলো। শুধালুম, 'নামটা জানো?'

'দাঁড়ান, বলছি, স্যর। আরব্য উপন্যাসের কোন্ এক নায়িকা না নায়কের নাম। শহর-জাদী? শহর-বানু? হ্যাঁ, হ্যাঁ শহ্‌র্-ইয়ার—'

আজ আমার বার বার স্তম্ভিত হবার অর্থাৎ নিশ্চল নির্বাক স্তম্ভে পরিণত হওয়ার পালা।

শুনেছি, একদা নগরের একাংশ সহস্র স্তম্ভের (খাম্বা'র) উপর নির্মিত হয়েছিল বলে অদ্যকার ক্যাম্বে বন্দরকে গুজরাতিতে 'খাম্বাৎ' বলা হয়, প্রাচীন যুগে 'স্তম্ভপুরী' বলা হতো। দিল্লীবাসীর কাছে এ-শব্দতত্ত্ব ফজুল। সেখাকার চৌষট্টিটি স্তম্ভের উপর খাড়া বলে আকবর বাদশার দুধবাপ আজীজ কোকলতাসের কবরকে 'চৌসট্ খাম্বা' বলা হয়।

আজ আমি এতবার হেথাহোথা স্তম্ভে পরিণত হয়েছি যে আমার উপর দিয়ে অনায়াসে কলকাতার ওভার-হেড্ রেলওয়ে নির্মাণ করা যায়!

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ফের বকর বকর আরম্ভ করেছে। আমি ফের ফিসফিস করে বললুম, 'চুপ, চুপ। ঠাকুরমা শুনতে পাবেন। তুমি নিতান্ত অর্বাচীন ; তাই জানো না, প্রাচীনারা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-একটি মহৎ সদ্‌গুণ রপ্ত করে নেন সেটি হচ্ছে, যে-কথা তাঁরা শুনতে চান না, সেটা তাঁদের কানের কাছে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে শোনালেও শোনেন না, আর যেটি তাঁরা শুনতে চান সেটি তুমি বাঁশবনের কলমর্মরের ভিতর 'রাজার মাথায় শিং' গোছ গোপনে গোপনে বললেও তাঁরা দিব্য শুনতে পান। তাই তো তাঁরা দীর্ঘজীবী হন! আফ্‌টার্ অল্, কানের ভিতর দিয়ে যে-সব কথা মরমে পৌঁছে তার চোদ্দ আনাই তো দু সংবাদ। অন্তত এ-যুগে।'

ভূতনাথ নিশ্চয়ই ভূতকালটা সম্বন্ধে ওয়াকিফ্-হাল। তদুপরি সে 'বৃথা-মাংস' খায় না, বৃথা তর্ক করে না। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'সর্ব যুগেই, সত্যযুগেও।' পূর্বেই বলেছি, সে একটা আস্ত চার্বাক। আর আমার যদ্দূর জানা, প্রথম চার্বাক এই পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হন সত্য ও ত্রেতাযুগের মধ্যিখানে। ভূতনাথ জাতিস্মর।

ঠাকুমা গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে রওয়ানা হলেন।

খাইছে!

ঠাকুমা নিশ্চয়ই তাঁর ভাইয়া বশীরুদ্দীনের জন্য যে ভাবে লুচি ভাজতেন সেইভাবে ভাজবার জন্য ভূতনাথের বউকে ফরমান ঝাড়বেন। তার বয়স ত্রিশ হয় কি না হয়। আমাদের পাড়ার চ্যাংড়া হীরু রায় বাজাবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সামনে বাজনা! তওবা, তওবা!

তা সে যাক্‌গে।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ আমাকে তার হাফ-প্রাচীনপন্থী বৈঠকখানায় বসিয়ে ব্যাপারটি সংক্ষেপে সারলো :

'আপনি ঠিক বলেছেন, আমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী এখনো স্বপাকে খান। আমাকে তাঁর হেঁশেলে ঢুকতে দেন না। ইংরিজিতে একটা শব্দ আছে—এমরাল। মরাল নয়, ইমরালও নয়। আমার ঠাকুরমা এলিবারেল। তিনি ধর্মবাবদে লিবারেল নন্, ইলিবিরেলও নন—তিনি এলিবারেল। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে হয়, কারণ ঐ শহ্‌র্-ইয়ার বীবীর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে—অবশ্য সেটা অনেক অনেক পরের কথা।

উত্তরবঙ্গের কোন্ হিন্দু সর্ব মুসলমানের সংস্পর্শ বর্জন করে বাস করেছে কবে? তাই তিনিও মুসলমানদের কিছুটা চেনেন। যেমন আপনার মরহুম শ্বশুর সাহেবকে খুব ভালো ভাবেই চিনতেন।

কিন্তু আপন ধর্মাচার তিনি করতেন—এখনো করেন—তাঁর মা শাশুড়ী যে-ভাবে করেছেন হুবহু সেইরূপ। অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনো কৌতূহল কখনো ছিল না—এখনো নেই এবং সেখানে পুনরায় আসেন ঐ শহ্‌র্-ইয়ার বীবী। এমন কি এই হিন্দুধর্মেই যে—পূজা-আচ্চার নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে সে সম্বন্ধে ঠাকুমা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই বলছিলুম তিনি ধর্মবাবদে ছিলেন এলিবারেল। তিনি তো, আর-পাঁচটা ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফ্-হাল হয়ে সেগুলো রিজেক্ট্ করেন নি। সে হলে না হয় বলতুম, তিনি ইলিবিরেল, কট্টর, কনজারভেটিভ। হাওয়ার ধাক্কায় যখন তেতলার আলসে থেকে ফুলের টব্ নিরীহ পদাতিকের কাঁধে পড়ে তাকে জখম করে তখন কি সে-টব্ চিন্তা করে এই কর্মটি করেছে? সে কি চিন্তা করে জানতে পেরেছে, উক্ত পদাতিক অতিশয় পাপিষ্ঠ ব্যক্তি? অতএব ফুলের টব্-এর এ-কর্মটি এমরাল। ঠিক ঐ ভাবেই আমার ঠাকুরমার যাবতীয় চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি পূজা-আচ্চা সব, সব-কিছু ছিল এলিবারেল। ফুলের টব্-এর মতই তিনি ছিলেন অন্য পাঁচটা ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আন্‌কন্‌শাস,—'

আমি বাধা দিয়ে কললুম, 'থাক্, তোমার এসব কচকচানি।

আমি জানতে চেয়েছিলুম, তোমার নিষ্ঠাবতী হিন্দু ঠাকুমা ঐ মস্‌লা পীরের মোকামে পৌঁছলেন কি করে?'

খান বড় সহিষ্ণু ব্যক্তি। বললে, 'স্যর, ঐ সময়ই নাট্যমঞ্চে শহর্‌-ইয়ার বানুর অবতরণ। তাই আমি তার পটভূমি নির্মাণ করছিলুম মাত্র। এইবারে আসল মোদ্দা কথায় পৌঁছে গিয়েছি। শুনুন।

দেশ-বিভাগের পর ঠাকুমাকে প্রায় দৈহিক বল প্রয়োগ করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ছাড়তে চান নি। এ-রকম বিস্তর কেস্‌ আপনি রেফুজি কলোনিগুলোতে পাবেন।

ঠাকুমার সঙ্গে দেশত্যাগ করে এসেছিল তাঁরই পিতৃকুলের সুদূর সম্পর্কের একটি অরক্ষণীয়া। রান্নাবান্না ধোয়ামোছার পরও আর-কিছু করবার নেই বলে সে কলেজ যেত। ঠাকুমা ব্রাহ্মণী, ন্যাচ্‌রলি আত্মীয় পালিতা কন্যাও ব্রাহ্মণী। কিন্তু, মোশয়, সে যে ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে প্রেমে পড়লো সে এক বদ্যি সন্তান। তাকে বিয়ে করতে চায়!

ঠাকুমা তো শুনে রেগে কাঁই! কী! বদ্যির সঙ্গে বামুন মেয়ের বিয়ে! বরঞ্চ গোহত্যা করা যায়, গোমাংস ভক্ষণ করা যায়, কিন্তুক বামুনের সঙ্গে বদ্যি! বরঞ্চ ছুঁড়িটা ডোমচাঁড়াল, মুচিমোচরমান বিয়ে করুক! কারণ ঠাকুরমার মনঃসিন্দুকে একটি আপ্তবাক্য প্রায় গোপন তত্ত্বরূপে লুক্কায়িত আছে:

"একশ' গোখরোর বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বদ্যি তৈরি করেন।"

কিন্তু ঠাকুরমা জানতেন না যে, "একশ' বদ্যির বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তৈরি করেন।" আমরা বারেন্দ্র।' ভূতনাথ তার হোম্‌মেড্‌ সিগরেটে আগুন ধরাবার জন্য ক্ষণতরে চুপ করে গেল।

আমি গুনগুন করে বললুম, 'এবং একশ'টি বারেন্দ্রের বিষ দিয়ে আল্লাতা'লা তৈরি করেন একটি সৈয়দ।'

খান আস্ত একটা চাণক্য। কিন্তু এ-নীতিটি জানতো না। খানিকক্ষণ এই নবীন তত্ত্বটির গভীর জলে খাবি খেয়ে খেয়ে বললে,

'তাই বুঝি সৈয়দরা এত বিরল ?'

আমি বললুম, 'চোপ্, তুমি যা বলছিলে, তাই বলো।'

খান তাবৎ বাক্য হজম করে নিয়ে বললে, 'এ-হেন সময়ে, যে-নাট্যে ছিলেন সুদ্দুমাত্র দুটি প্রাণী, ঠাকুমা এবং অরক্ষণীয়া, সেখানে প্রবেশ করলেন বীরপদভরে পৃথিবী প্রকম্পিতা করে একটি তৃতীয়া প্রাণী।

ভুল বললুম, স্যর, আমার মনে হলো যেন আমাদের সরু গলি দিয়ে ঢুকলো একটি জ্বলন্ত মশাল। অথচ অলিম্পিকের টর্চ-বেয়ারার নেই। সুদ্দুমাত্র মশালটাই যেন স্বাবলম্ব হয়ে, গলি পেরিয়ে, আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে, ঠাকুরমার ঘরে ঢুকলো।

সেই মশাল শহ্র্-ইয়ার। আপনাকে বলি নি, অগ্নিশিখা ?'

আমি শুধালুম, 'কেন এসেছিল ?'

'আজ্ঞে—'

এমন সময় ঠাকুমা আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে পাথরের থালা। খান ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিত দিলে, এখন আর ও-কাহিনী বলা চলবে না।

উনিশ

এত দিনে বুঝতে পারলুম, শহ্‌র্-ইয়ারকে আমি চিনি নি, চেনবার চেষ্টাও করি নি। কোনো মানুষকে দিনের পর দিন দেখলে, তার সঙ্গে কথা কইলেও তার একটা মাত্র দিক চেনা হয়। কারণ যার যে-রকম প্রবৃত্তি, সে সেই রকম ভাবেই অন্য জনকে গ্রহণ করে। শহ্‌র্-ইয়ার মদ্য আমার মনের পাত্র যখন পূর্ণ করলো তখন সে শেপ্ নিল আমার মনের গেলাসেরই শেপ্। কিন্তু সেইটেই যে তার একমাত্র শেপ্ নয় সেটা আমি আনমনে ভুলে গিয়েছিলুম। এমন কি তার স্বামী, ডাক্তার তাকে কি শেপ্-এ নিয়েছে সেটাও আমি ভেবে দেখি নি। এবং সে-ই বা তার গড়া—অবশ্যই তার মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়া শহ্‌র্-ইয়ারকে যে শেপ্ দিয়েছে সে নিয়ে আমার সঙ্গে 'ডিপ্লোমেটিক ডিস্‌প্যাচ এক্‌শ্‌চেঞ্জ' করতে যাবে কেন?

এইবারে একটি 'তৃতীয় পক্ষ' পেলুম যে শহ্‌র্-ইয়ারকে দেখেছে, একটুখানি দূরের থেকে—এবং তাতে করেই পেয়েছিল বেস্‌ট্ পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্—এবং তারই ভাষায়, সেই 'অগ্নিশিখাকে' সাইজ অপ্ করতে গিয়ে একদম বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। আমিও মনে মনে বললুম অগ্নিশিখা তো তরল দ্রব্য নয় যে তাকে তোমার মনের পেয়ালায় ঢেলে নিয়ে আপন শেপ্ দেবে!

ঠাকুমা চলে যেতেই ভূতনাথ দরজাতে ডবল খিল দিলে।

ছেঁড়া কথার খেই তুলে নিয়ে বললে, 'দ্রৌপদী, মশাই, সাক্ষাৎ দ্রৌপদী!'

আমি শুধালুম, 'দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করছো কেন?'

এক গাল হেসে বললে, 'কেন, স্যর, আপনিই তো হালে একখানা গবেষণাপূর্ণ রসরচনা ছেড়েছেন যাতে দেখিয়েছেন, এ-সংসারে একটি

প্রাণী, তাও-রমণী, কি করে পাঁচ পাঁচশ'টা মদ্দাকে তর্কযুদ্ধে চাটনি বানাতে পারে। সেই নারীই তো দ্রৌপদী। দুঃশাসন যখন তাঁকে জোর করে কুরুসভাস্থলে টেনে এনে হাজির করলো তখন তিনি যে স্বাধীনা, তাঁকে যে তাঁর অনিচ্ছায় প্রকাশ্য-সভাস্থলে টেনে আনা সম্পূর্ণ বে-আইনী, আজকের আদালতী ভাষায় যাকে বলে 'আলট্রা ভাইরীস,' তাঁর সেই বক্তব্য যখন তিনি অকাট্য যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে পেশ করতে লাগলেন, ভুল বললুম, পুশ্ করতে লাগলেন, সজোরে কড়া কড়া যুক্তিসহ—তখন কী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব, কী দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠাচারী দ্রোণাচার্য কেউ কি কোনো উত্তর দিতে পেরেছিলেন?···তার এক হাজার বছর পরে সোক্রাতেস—না? তারপর এ তাবৎ ব্লাঙ্কো! না—?'

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, 'থাক! তোমার কচকচানি থামাও। শহ্‌র্-ইয়ারের কথা কও!'

পূর্বেই বলেছি শ্রীমান ভূতনাথ বৃথা তর্ক করে না। ঘাড় নেড়ে বললে, 'শহ্‌র্-ইয়ারের কথাই তাবৎ শহরের ইয়ার—অথবা হওয়া উচিত।

ভেবে দেখুন, ঠাকুমা একা। শহর্-ইয়ার একাই একশ' দ্রৌপদী। ঠাকুমা পারবেন কেন? শহ্‌র্-ইয়ার কি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন সে আমার জানা নেই, কারণ আমার কলিজাতে পুরো খোঁড়ার ভয় দেখালেও তখন আমি সে-সভাঙ্গনে যেতে রাজী হতুম না। ঠাকুমা একে মেয়েছেলে তদুপরি বৃদ্ধা। তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু আমি মদ্দা। আমাকে ঐ দ্রৌপদী চিবিয়ে গিলে ফেলত না—যদিস্যাৎ তার মনে ক্ষণতরেও সন্দেহ হতো, আমি ঠাকুমার পক্ষ সমর্থন করতে এসেছি!'

আমি সত্যিই তাজ্জব মানলুম। শহর্-ইয়ারকে তো আমি চিনি, শান্তা, স্নিগ্ধা কল্যাণীয়া রূপে। সে যে তর্কাঙ্গনে রণরঙ্গিণী হয়ে তার রুদ্রাণী রূপ দেখাতে পারে সে কল্পনা তো আমি কখনো

করতে পারি নি।···তাই তো বলছিলুম, 'তৃতীয় পক্ষের' মতামত অবর্জনীয়।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ঘাড় চুলকে চুলকে বললে, 'পরে আমার কানে কি একটা ঐতিহাসিক যুক্তিও এসেছিল। বেগম্ শহ্‌র্-ইয়ার যা বলেছিলেন তার মোদ্দা নির্যাস ছিল :

বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ শ্রমণকে একাসনে বসিয়ে বার বার বলতেন, "ব্রাহ্মণ-শ্রমণ, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ।"

তার বহু শত বৎসর পর, বৌদ্ধধর্ম যখন এদেশ থেকে লোপ পেল তখন সর্বশেষে, এই শ্রমণরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন। এবং হিন্দু ধর্মানুযায়ী বিবাহাদি করলেন। তাঁদেরই বর্তমান বংশধর বৈদ্যসম্প্রদায়। অতএব তাঁরা ব্রাহ্মণদেরই মত কুলসম্মান ধারণ করেন। একদা তাঁরা শ্রমণরূপে লোকসেবার জন্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করতেন, হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁরা সেই বৈদ্য-বিদ্যাই জীবিকারূপে গ্রহণ করলেন। তারপর—'

আমার কান তারপর ভূতনাথের আর কোনো কথাই গ্রহণ করে নি। কারণ আমার মন তখন বিস্ময়বিমূঢ়। আমি ভালো করেই জানতুম, শহ্‌র্-ইয়ার ইহজন্মে কখনো কোনো প্রকারের গবেষণা করে নি।···এমন কি তার স্বামী যে মেডিকাল রিসার্চে আচৈতন্য নিমজ্জিত সেটাও সে বোধহয় হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। অবশ্য সে এ যাবত ইতালির লেওনে কাএতানির স্ত্রীর মত বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি।

তবে কি তাবৎ সমস্যা এভাবে দেখতে হবে যে, কাএতানির স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, আর শহ্‌র্-ইয়ার স্বামীকে ত্যাগ না করে ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে!

ভূতনাথ বললে, 'সে বিয়ে তো নির্বিঘ্নে হলো। কিন্তু আমার মনে হয়, বীবী শহ্‌র্-ইয়ার ঠাকুমাকে কাবু করেছিলেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে। "ব্যক্তিত্ব" বা পার্সনলাটি বললে অল্পই

বলা হয়। বরঞ্চ ঐ যে আমি বললুম, "অগ্নিশিখা"—সেই অগ্নিশিখা যেন আগুনের পরশমণি হয়ে ঠাকুরমাকে—'

হঠাৎ ভূতনাথের ভাব পরিবর্তন হলো। আপন উৎসাহের আবেগ আতিশয্যের ভাটি গাঙে এতক্ষণ অবধি সে এমনই ভেসে চলেছিল যে শহ্‌র্-ইয়ার সম্বন্ধে আমার কৌতূহলটা কেন সে-সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন হয় নি। এখন যেন হঠাৎ তার কানে জল গেল।

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে ঈষৎ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে—অবশ্য পরিপূর্ণ লালবাজারী ডবল ব্যারেল বন্দুকের দু'নাল উঁচিয়ে নয়—জিজ্ঞেস করলে, 'স্যর, আপনি কি ওনাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

বেচারা ভূতনাথ! অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'মাফ করবেন, স্যর, প্লীজ। আপনার সামনে ওঁর সম্বন্ধে আমার এটা-ওটা বলাটা বড্ডই বেয়াদবী হয়ে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা! তুমি তো এখনো তার কোনো নিন্দে করো নি। এবং ভবিষ্যতে করবে বলেও তো মনে হয় না। এটাকে তো পরনিন্দা পরচর্চা বলা চলে না।···আর আমি জানতে চেয়েছিলুম বলেই তো তুমি আমাকে এ সব বললে। আর, এগুলো আমার কাজে লাগবে।'

যেন একটুখানি শঙ্কিত হয়ে খান শুধোলে, 'এনি ট্রবল্, স্যর?'

আমি বললুম 'ইয়েস্। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তুমি যা বলছিলে, বলে যাও।'

কথঞ্চিৎ শান্তি পেয়ে ভূতনাথ বললে, 'বলার মত তেমন আর বিশেষ কিছু নেই। পূর্বেই বলেছি, বিয়ে হয়ে গেল। চতুর্দিকে শান্তি। শহ্‌র্-ইয়ার ঠাকুমাকে দেখতে আসেন কি না তাও জানিনে।···ইতিমধ্যে ঠাকুমা যখন নিশ্চিন্দি মনে ওপারে যাবার জন্য যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করছেন তখন তাঁর জীবনসন্ধ্যায় এল একটা দুর্ঘটনা। তাঁর এক পিঠাপিঠো ছোট ভাই বহু বৎসর ধরে

হিমালয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, দু'তিন মাস অন্তর অন্তর দিদিকে পোস্টকার্ডও লিখতেন।

হঠাৎ একদিন এক চিঠি এল সেই ভাইয়ের এক বন্ধুর কাছ থেকে —তিনিও তাঁর সঙ্গে হিমালয় পর্যটন করতেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, মাস তিনেক ধরে সেই ভাইয়ের সন্ধান নেই।

ঠাকুমার আদেশে আমাকেই যেতে হলো হিমালয়ে তাঁর খোঁজে। সে দীর্ঘ নিষ্ফল কাহিনী আপনাকে আর শোনাবো না। তিন মাস পর ঠাকুমার আদেশে কলকাতায় ফিরে এলুম।

এসে দেখি, যা ভেবেছিলুম ঠিক তার উল্টো।

ঠাকুমা শান্ত প্রশান্ত।

আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারলুম, ইতিমধ্যে ঐ শহ্‌র্-ইয়ার বীবী নাকি ঠাকুমাকে কোন্ এক পীরের আস্তানায় নিয়ে গিয়েছেন এবং সেখানে তিনি মনের শান্তি পেয়েছেন। সে তো খুব ভালো কথা। দেহ মনের শান্তিই তো সর্বপ্রধান কাম্য। কিন্তু আপনি জানেন, আমি এ সব গুরুপীর কর্তাভজাদের একদম পছন্দ করিনে।'

আমি বললুম, 'আমিও করি না।'

ভূতনাথ বললে, 'কিন্তু অনুসন্ধান করে জানলুম, শহ্‌র্-ইয়ার নাকি ঠাকুমাকে পীরের আস্তানায় নিয়ে যাবার পূর্বে পাকাপাকিভাবে বলেছে, "পীর সাহেব আপনার ভাইকে হিমালয় থেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে আসবেন না। কিন্তু আমি আশা রাখি, তিনি আপনাকে কিছুটা মনের শান্তি এনে দিতে পারবেন—আল্লার কৃপায়"।'

ভূতনাথ খান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তাই তো এই মহিলার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা।'

কুড়ি

কলকাতা মহানগরীর কোনো কোনো অঞ্চলে মধ্যরাত্রে যে নৈস্তব্ধ্য উপভোগ করা যায় গ্রামাঞ্চলে সেটা অতখানি সহজলভ্য নয়। যদ্যপি কবিরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। জনপদবাসী দুপুর রাত্রে কেমন যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে জানে না। এ বাড়ি থেকে নিদ্রাহীন বৃদ্ধের কাশির শব্দ, ও বাড়ি থেকে চোর সম্বন্ধে মাত্রাধিক সচেতন মরাই-ভরা ধানের গেরেমভারী মালিকের গলাখাঁকরি, চিকিৎসাভাবে কাতর জ্বরাতুর শিশুর নির্জীব গোঙরানো এসব তো আছেই, তার উপর পশুপক্ষীর নানা রকমের শব্দ। তারা যেন মধ্য রাত্রে একাধিক শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত। অথচ বেশ লক্ষ্য করা যায়, এদের ভিতর তখন এক রকমের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা দেখা দেয়। হঠাৎ মোরগটা ভয় পেয়ে ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, ছাগলটা ম্যাঁ ম্যাঁ করলো, সর্বশেষে পাশের গোয়ালের গাইটা একটুখানি ঘড়ঘড় করলো,—খুব সম্ভব চেক্ অপ্ করে নিলো, অধুনা প্রসবিত তার বাছুরটি পাশ ছেড়ে কোথাও চলে যায় নি তো!

একমাত্র ব্যত্যয় আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার'। সে ঐ ঐকতানে কস্মিনকালেও যোগ দেয় না, যদিও তার কণ্ঠই এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা গ্রাম্ভারী। সোজা বাঙলায়, গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী! তার কারণে সে তার আচার আচরণে অনুকরণ করে আমাকে। আমি নীরব থাকলে সেও নিশ্চুপ। আমিও তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি—সর্বোপরি তারি ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। কিন্তু এ-শীলে সে আমাকে রোজই হার মানায়।

হুঁ। ঠিক। শহ্‌র্-ইয়ারকে আমি একটি আলসেশিয়ান-ছানা দওগাৎ দেব।

হঠাৎ একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'হুজুর, মাফ করবেন। এই তো আমাদের বাড়ি।'

ওঃ হো! তাইতো। আমি এ-বাড়ি ছাড়িয়ে বেখেয়ালে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, কে জানে।

অর্থাৎ এই লোকটিকে মোতায়েন করা হয়েছে, আমি যদি রাত সাড়ে তেরটার সময় বাড়ির সামনে চক্কর খাই তখন সে যেন আমাকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এই লোকটাকে মোতায়েন করল কে? ডাক্তার? তার তো অতখানি কম্‌ন্ সেন্‌স্ নেই। শহ্‌র্-ইয়ার? সে তো পীরের আস্তান থেকে ফেরে অনেক রাতে।

দীর্ঘ চত্বর পেরিয়ে যখন বাড়িতে ঢুকলুম, তখন দেখি আরো দুটি লোক জেগে বসে আছে। স্পষ্টতঃ আমার-ই জন্য। আমি লজ্জা পেলুম। তিন তিনটে লোককে এ-রকম গভীর রাত অবধি জাগিয়ে রাখা সত্যই অন্যায়।

এ-পাপ আর বাড়ানো নয়। চুপিসারে আপন ঘরে ঢুকে অতিশয় মোলায়েমসে খাটে শুয়ে পড়বো। আলোটি পর্যন্ত জ্বালবো না। সুইচের ক্লিক্-এ যদি ডাক্তার, শহ্‌র্-ইয়ারের ঘুম ভেঙে যায়, আর আমার ঘরে হামলা করে!

এক কথায়, মাতাল যে-রকম গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরে।

অতিশয় সন্তর্পণে দরজার হাণ্ডিলটি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকে আমি অবাক! ঘর আলোয় আলোময়। আমার খাটের পৈথানের কাছে যে কেদারা তার উপর বসে আছে শহ্‌র্-ইয়ার!

কিছু বলার পূর্বেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি আমাকে আর কত সাজা দেবেন?'

আমার মুখে কোনো উত্তর জোগালো না। কিসের সাজা? ওকে দেব আমি সাজা! ওর মত আমার আপন জন এ-দেশে আর কে আছে?

এ-স্থলে সাধারণজন যা বলে, তাই বললুম, 'বসো!'

কিন্তু শহ্‌র্-ইয়ার যেন লড়াইয়ে নেমেছে।

তার চেহারা দেখে কেচ্ছা-সাহিত্যের দুটি লাইন আমার মনে পড়ল:

রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পরান।
নাকের শোওয়াস যেন বৈশাখী তুফান॥'

কিন্তু আমি কোনো মতামত প্রকাশ করার পূর্বেই সে বললে 'আমি খুব ভালো করেই জানি, কলকাতার রাস্তাঘাট আপনি একদম চেনেন না। ওদিকে গাড়ি-ড্রাইভার দিলেন ছেড়ে। এদিকে রাত একটা। তখন কার মনে দুশ্চিন্তা হয় না, বলুন তো।'

এ-সব অভিযোগ সত্ত্বেও আমার হৃদয় বড় প্রসন্ন হয়ে উঠেছে কারণ, এতক্ষণে আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কাল রাত্রে, আজ সকালে তার চোখে অর্ধসুপ্ত, আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন যে-ভাবটি ছিল সেটা প্রায় অন্তর্ধান করেছে। সেই প্রাচীন দিনের শহ্‌র্-ইয়ারের অনেকখানি—সবখানি না—যেন ফিরে এসেছে। এর কারণটা কি তখনো বুঝতে পারি নি। পরে পেরেছিলুম। সে-কথা আরো পরে হবে। কিন্তু উপস্থিত তার এই অবস্থা পরিবর্তনের পুরোপুরি ফায়দাটা ওঠাতে হবে।

আমি গোবেচারী সেজে বললুম, 'তা তো বটেই। আমি তো কলকাতার রাস্তাঘাট চিনিনে সে তো ন'সিকে সত্য কথা। এই তো, আজ সন্ধ্যায়ই, আমি ট্যাক্‌সি ধরে গেলুম ধর্মতলা আর চৌরঙ্গীর ক্রসিং-এ। আমি জানতুম, সেখানে ঠন্‌ঠনের কিংবা কালীঘাটে মা-কালীর মন্দির। ও মা! কোথায় কি! সেখানে দেখি টিপ্‌ সুলতানের মসজিদ। কি আর করি। ওজু করে দু'রেকাৎ নফল নমাজ পড়ে নিলুম। তারপর বেরুলুম দক্ষিণেশ্বর বাগে। সেখানে তো জানতুম, মৌলা আলীর দরগা—'

এতক্ষণে শহ্‌র্-ইয়ারের ধৈর্যচ্যুতি হলো।

তবু, প্রাচীন দিনের শান্ত কণ্ঠে বললো,'দেখুন, আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আপনাদের কল্পনাশক্তি সাধারণজনের চেয়ে অনেক বেশী, ভাষা আপনাদের আয়ত্তে, স্টাইল আপনাদের দখলে। সেই ক্ষমতা নিয়ে আপনারা অনেক-কিছু করতে পারেন—লোকে ধন্য ধন্য করে। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনে আপনি সে-সব শস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? সেটা কি উচিত? আমরা কি তার উত্তর দিতে পারি? আমরা—'

প্রাচীন দিনের শহ্‌র্-ইয়ার যেন নবীন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আমি তারই সুযোগ নিয়ে মন্তব্য করলুম, 'বড় খাঁটি কথা বলেছ, শহ্‌র্-ইয়ার। এ-কর্ম বড়ই অনুচিত।···আমি তোমারই পক্ষে একটি উদাহরণ দি :—

আমাদের শান্তিনিকেতনে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। তার জন্যে কে দায়ী আমি সঠিক জানিনে। হয় জনৈক অধ্যাপক, নয় ছাত্ররা। তখন শান্তিনিকেতনবাসী জনৈক প্রখ্যাত লেখক ছাত্রদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর কঠিন মন্তব্যপূর্ণ পত্র খবরের কাগজে প্রকাশ করেন।···তুমি এখ্‌খুনি যা বললে, তারই স্বপক্ষে আমি এ-ঘটনাটার উল্লেখ করছি।···তখন ছাত্ররা করে কি? সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের শাণিত তরবারীর বিরুদ্ধে লড়তে যাবে কে? তারা ফোর্থ-ইয়ার ফিফথ-ইয়ারের ছাত্র। তাদের ভিতর তো কেউ সাহিত্যিক নয়।···সিংহ লড়বে সিংহের সঙ্গে, বাঁদর—'

আমি থেমে গেলুম। কিন্তু শহ্‌র্-ইয়ার চুপ করে রইল।

ইতিমধ্যে আমি আস্তে আস্তে আপন মনে বুঝে গিয়েছি, শহ্‌র্-ইয়ার কেন আপন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে।

অবশ্য নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব কোনো-কিছু বলা কঠিন।

সে ভয় করেছিল, তার পীরেতে আমাতে লাগবে লড়াই।

ফলে সে হারাবে পীরকে, নয় আমাকে।

এই দ্বন্দ্বের সামনে পড়ে কাল সন্ধ্যায় সে ডুব মেরেছিল ধ্যানের

গভীরে। সেই ধ্যানের পথ সুগম করার জন্য অনেকেই বহুক্ষণ ধরে জপ-জিক্‌র্ করেন। শহ্‌র্-ইয়ার তাই কাল রাত্রে 'লতীফ, 'সুন্দরের' নাম জপ করেছিল। শুনেছি, বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক জপ করতে করতে 'দশা' (আরবীতে 'হাল') প্রাপ্ত হন।

এ-নিয়ে তো দিনের পর দিন আলোচনা করা যায়, এবং আমি কিছুটা করেছিও, শহ্‌র্-ইয়ারের পীরের সঙ্গে বরদায়। কিন্তু এ-সব করে আমার কি লাভ? আমি চাই শহ্‌র্-ইয়ারের মঙ্গল, ডাক্তারের মঙ্গল এবং আমরা তিনজন এতদিন যে-পথ ধরে চলেছি—সুখেদুঃখে হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে—সে-পথ দিয়েই যেন চলতে পারি। এর মধ্যে একজন ছিটকে পড়ে যদি স্বয়ং পরব্রহ্মকেও পেয়ে যায় তাতে ডাক্তারের কি লাভ, আমারই বা কি লাভ? বুদ্ধদেব বৈরাগ্য আর সন্ন্যাস দিয়ে বিশ্বজয় করেছিলেন; কিন্তু সে ধন কি পিতা তথা রাজা শুদ্ধোদনকে আনন্দ দান করতে পেরেছিল? তিনি তো কামনা করেছিলেন, পুত্র যেন যুবরাজরূপে দিগ্বিজয় করে। এবং গোপা-যশোধরা? তিনিও তো চেয়েছিলেন, একদিন রাজমহিষী হবেন, তাঁর পুত্র যুবরাজ রাহুলের রাজমাতা হবেন।

কিন্তু যে কথা বলছিলুম:

পীরেতে আমাতে কোনো ঝগড়া-কাজিয়া তো হলোই না, বরঞ্চ প্রকাশ পেল, দুজনকার বহুদিনের হৃদ্যতা। শহ্‌র্-ইয়ারের যেন একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, তার যেন দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা।

* * *

হঠাৎ না ভেবে-চিন্তেই বলে ফেললুম, 'আচ্ছা, শহ্‌র্-ইয়ার, এখন রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত তোমাকে আনন্দ দেয়?' 'এখন' শব্দটাতে বেশ জোর দিলুম। 'আগে তো তুমি পছন্দ করতে না।'

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বললে, 'না।'

আমি বললুম, 'সে কি? এখন তুমি যে-পথে চলেছ সেখানে তো

তাঁর ধর্মসঙ্গীত তোমাকে অনেক-কিছু দিতে পারে, তোমার একটা অবলম্বন হতে পারে।'

মাথা নিচু করে বললে, 'হলো না। কাল দুপুরেই—আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না—আবার কিছু রেকর্ড বাজালুম। অস্বীকার করছিনে, খুব সুন্দর লাগল। ভাষা, ছন্দ, মিল সবই সুন্দর। এমন কি আল্লাকে নূতন নূতন রূপে দেখা, নূতন নূতন পন্থায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা সবই বড় সুন্দর। আমার মন যে কত বার নেচে উঠেছিল, সে আর কী বলবো!···কিন্তু, কিন্তু, আমার বুকের ভিতরে কোনো সাড়া জাগলো না।'

আমি বললুম, 'আমার কাছে কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকছে। বুঝিয়ে বলো।'

এবারে একটুখানি মধুরে উচ্চহাস্য করলো—'আপনাকেও বোঝাতে হবে?'

উঠে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের জানলা খুলে দিল।

আহ্। বাইরে কী নিরন্ধ্র নৈস্তব্ধ্য। গ্রামে নয়, কলকাতাতেই এটা সম্ভবে।

বন্ধ জানলা খুলে দিলে বাইরের বাতাস যে রকম কামরাটাকে ঠাণ্ডা করে দেয়, হুবহু সেই রকম বাইরের নিস্তব্ধতা যেন আমাদের তর্কালোচনাটাকে শীতল করে দিল।

শহ্‌র্-ইয়ার বললে, 'জানলার কাছে আসুন। আরাম পাবেন।'

আমি শয্যাত্যাগ করে সেই প্রশস্ত জানলার অন্য প্রান্তে দাঁড়ালুম।

শহ্‌র্-ইয়ার ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমার দু'হাত তখন জানলার আড়ের উপর। সে তার ডান হাত আমার বাঁ হাতে বুলোতে বুলোতে বলল, 'এই নিচের আঙিনার দিকে তাকান। এখানে ভোর-সাঁঝ ভিখিরি-আতুর আসে। তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে এ-বাড়ি পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু এ-আঙিনায়

সব চেয়ে বেশী আদরযত্ন কারা পায় জানেন? খঞ্জনি-হাতে বোষ্টমি, একতারা-হাতে বাউল, সারেঙ্গী-হাতে ফকীর। আপনি হয়তো ভাবছেন, এরা সদাই শুধু আধ্যাত্মিক পরলৌকিক, 'এ-সংসার নশ্বর', এই সব নিয়েই গীত গায়—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'মোটেই না, এরা বহু ধরনের গীত জানে।'

ভারী খুশী হয়ে বললে, 'ঠিক ধরেছেন। অবশ্য আমি ভালো করেই জানতুম, আপনার কাছে এ-তত্ত্ব অজানা নয়। তাই আপনাকে একটুখানি খুঁচিয়ে আমি সুখ পাই। কিন্তু সে-কথা থাক্।

আমার বিয়ের রাত্রে, গভীর রাত্রে, এই আঙিনাতেই তারা অনেক মধুর মধুর গান আমাকে ডাক্তারকে শুনিয়ে গিয়েছিল। তারই একটি ছত্র আমার কানে এখনো বাজে:

"শ্যামলীয়াকে দরশন লাগি পরহুঁ কুসুম্বী সাড়ী"

বুঝুন, কী অদ্ভুত কালার্-কনট্রাস্ট-সেন্স্। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামল। তাই শ্রীরাধা তাঁর শ্যামবর্ণের কন্ট্রাস্ট করার জন্য হলদে রঙের—কুসুম্বী রঙের শাড়ি পরে অভিসারে বেরিয়েছেন।

কিন্তু মোদ্দা কথাটা এইবারে আপনাকে বলি।

আমি সেই বিয়ের রাত্রির পর থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে শতসহস্র বার এদের গীত—বিশেষ করে ধর্মসংগীত শুনেছি। বরঞ্চ এদের এই সরল, অনাড়ম্বর, সর্ব অলঙ্কার বিবর্জিত ভক্তিগীতি মাঝে মাঝে আমার বুকে সাড়া জাগিয়েছে, এমন কি তুফান তুলেছে,—মনে হঠাৎ-চমক লাগায় নি শুধু। তার কারণ, অন্তত আমার মনে হয়, এদের অভাবের অন্ত নেই, এরা গরীব-দুঃখী অনাথ-আতুর। খুদাতালা ছাড়া এদের অন্য কোনো গতি নেই। তাই এদের গীতে থাকে আন্তরিকতা, ডীপেস্ট সিনসিয়ারিটি।

কিন্তু বিশ্বকবি, আবার বলছি, সর্ববিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ তো এই হতভাগাদের একজন নন। তিনি তো অনাথ আতুর নন। তাঁর

ভক্তিগীতিতে ওদের মর্মান্তিক ঐকান্তিকতা, সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণের সুর বাজবে কি করে? তিনি—'

আর আমি থাকতে পারলুম না। বাধা দিয়ে বললুম, 'এ তুমি কী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলে শহ্‌র্-ইয়ার! অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়াভাব—এইগুলোই বুঝি ইহজীবনের পরম দুর্দৈব, চরম বিনষ্টি? রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ হতে না হতেই তাঁর যুবতী স্ত্রীর মৃত্যু হলো, তার পাঁচ বছরের ভিতর গেল তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের বয়স তখন কত? এগারো, তেরো। অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় অকাল মৃত্যু। তাঁর বাল্য কৈশোরের কথা তুলতে চাইনে। সেই বা কিছু কম? ছেলেবেলায়ই ওপারে গেলেন তাঁর মা। সেই মায়ের আসন নিলেন তাঁর বৌদি। শুধু তাই নয়, সেই মহিয়সী নারীই কিশোর রবিকে হাতে ধরে নিয়ে এসে প্রবেশ করালেন জহান্-মুশায়েরায়, বিশ্বকবিসম্মেলনাঙ্গনে।···আজ যদি আমাকে কেউ শুধোয়, রবীন্দ্রনাথ কার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী, তবে নিশ্চয়ই বলবো, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলবো তার চেয়েও বেশী ঋণী তিনি তাঁর বৌদির কাছে।··· সেই বৌদি আত্মহত্যা করলেন একদিন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কত? বাইশ, তেইশ? এই নারীই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শিকা। তাঁর রুচি, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করেছেন তাঁর জীবনের প্রথম বারো বৎসর ধরে।

অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব সব মানি। কিন্তু আবার শুধোই, এগুলোই কি শেষ কথা? আত্মহত্যা, পর পর আত্মজনবিয়োগ এগুলো কিছুই নয়?

এই যে তুমি বার বার "অনাথ আতুর, অনাথ আতুর" বলছো, সেই সমাসটি তুমি কোত্থেকে নিয়েছ, জানো? তোমার জানা-অজান্তে?

সেও রবীন্দ্রনাথের!

"শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন—
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন॥"

এ-গীতে কি রবীন্দ্রনাথ বিধাতার প্রধান মন্ত্রী?—তিনি যে হুজুরকে বলছেন, "মহারাজ, এই অনাথ আতুর জনকে অবহেল করবেন না।" তিনি তখন স্বয়ং, নিজে, ঐ অনাথ আতুরদের একজন অবশ্য তাঁর অন্নবস্ত্র যথেষ্ট ছিল, কিন্তু প্রভু খৃষ্ট কি সর্বাপেক্ষা সার সত্য বলেন নি, মানুষ শুধু রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে না। ঈশ্বরের করুণা (ওয়ার্ড) তাঁর প্রধানতম আশ্রয়।

আর এও তুমি ভালো করে জানো, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অর্ধেক জীবন—১৯০১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। বিশ্বভিখারীদের তিনি ছিলেন ওয়ার্ল্ড চ্যামপিয়ন নম্বর ওয়ান। পৃথিবীর হেন প্রান্ত নেই যেখানে তিনি ভিক্ষা করতে যান নি। তাঁর পূর্বে স্বামীজী। এবং দুজনা ফিরেছিলেন, ঐ গানের "শূন্য ফেরে না যেন" প্রার্থনায় নিষ্ফল হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য। তিনি "বিশ্বপ্রেম" "বিশ্বভারতী"—"বিশ্ব" শব্দ দিয়ে একাধিক সমাস নির্মাণ করেছেন। আমি, অধম, তাঁরই সমাস নির্মাণের অনুকরণে তাঁকে খেতাব দিয়েছি "বিশ্বভিক্ষুক"। এ হক আমার কিছুটা আছে। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধি ঠাকুর। কিন্তু তাঁর বংশপরিচয় "পীরিলি" অর্থাৎ "পীর" + "আলী" দিয়ে। আম্মো "আলী"। আমারও "পীর" বংশ। কিন্তু থাক্, এসব হাল্কা কথা।

তুমি হয়তো বলবে—তুমি কেন, অনেকেই বলবে—এসব শব্দে ভিখিরিগিরি। আমি এ-নিয়ে তর্কাতর্কি করতে চাইনে। কারণ স্বয়ং কবিই গেয়েছেন,

"এরে ভিখারী সাজায়ে
কী রঙ্গ তুমি করিলে,
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥"

কিন্তু এহ বাহ্য।

আমি বার বার জোর দিতে চাই তাঁর মাথার উপর দিয়ে যে আত্মহত্যা, যে-সব অকালমৃত্যুর ঝড় বয়ে গেল, তারই উপর। সখানে তিনি অনাথের চেয়েও অনাথ, আতুরের চেয়ে আতুর।'

শহ্‌র্-ইয়ার বড় শান্ত মেয়ে। কোনো আপত্তি জানালো না দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। বললুম, 'আচ্ছা, রাশার সম্রাট দ্বার নিকলাসের নাম শুনেছ?'

'না তো।'

'কিচ্ছু এসে যায় না। এইটুকু যথেষ্ট যে তাঁর কোনো অভাব ছিল না। ইয়োরোপের রাজা-সম্রাটদের ভিতর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বিত্তশালী। দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরই রচিত একটি কবিতার শেষ দুটি লাইন আমার মনে পড়ছে, আবছা আবছা। ভুল করলে অপরাধ নিয়ো না। সত্যেন দত্তের অনুবাদ.

"কাতরে কাটাই
সারা দিনমান
কাঁদিয়া কাটাই নিশা।
সহি, দহি, ডাকি
ভগবানে আমি
শান্তির নাহি দিশা॥"

এর চেয়ে আন্তরিকতা ভরা, হৃদয়ের গভীরতম গুহা থেকে উচ্ছ্বসিত কাতরতা ভরা আর্তরব তুমি কি চাও?

না হয় রাশার জার-এর কথা থাক্।

কুরান শরীফ এবং এদিক ওদিক নানা কেতাবে রাজা দাউদের—King David-এর কাহিনী নিশ্চয়ই কিছু কিছু পড়েছ? ইনি শুধু প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহই ছিলেন না, তিনি বাইবেল কুরান উভয় কর্তৃক স্বীকৃত পয়গম্বর।

ভগবৎ-বিরহে কাতর এই রাজার Psalams বাইবেলে পড়েছ?

"কতদিন ধরে, এমন করিয়া
ভুলিয়া রহিবে প্রভু ?"

"Why standest thou afar off, O Lord ? why hidest thou thyself in times of trouble ?"

আরো শুনবে ?'

শহ্‌র্-ইয়ার মাথা না তুলেই বললে, 'আমার একটা কথা আছে—'

আমি বললুম, 'অনেক রাত হয়েছে। কাল সে-সব হবে।'

তারপর ছাড়লুম আমার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ অগ্নিবাণ :

'তোমারও তো ধনদৌলতের কোনো অভাব নেই। তবে তুমি কেন সকাল-সন্ধ্যা ছুটছো পীর সাহেবের বাড়িতে ? ভেবে চিন্তে কাল বুঝিয়ে বলো।'

একুশ

কি একটা স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম।

স্বপ্ন কি, তার অর্থ কি, সে ভবিষ্যদ্বাণী করে কি না, এসব বাবদে এখনো মানুষ কিছুই জানে না। অনেক গুণী-জ্ঞানী অবশ্য অনেক-কিছু বলেছেন। আঁরি বের্গসন্ থেকে ফ্রয়েট সাহেব পর্যন্ত। পড়ে বিশেষ কোনো লাভ হয় নি—অন্তত আমার।

তবে এ-বাবদে একটি সাত বছরের ছেলে যা বলেছিল সেটা সব পণ্ডিতকে হার মানায়। অন্তত, স্বপ্ন জিনিসটা কি, সে-সম্বন্ধে তার আপন বর্ণনা। ডাক্তার তাকে শুধিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন দেখে কি না? পুট্ করে উত্তর দিল, 'ও, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিনেমা দেখা? না?'

বেশ উত্তর। কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। আমি এর থেকে একটা তত্ত্বও আবিষ্কার করেছি—কারণ একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ বলেছেন, স্বর্গরাজ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার শিশুদের। সেই তত্ত্বটি সূত্ররূপে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়: আজকের দিনের বাঙলা ফিল্ম্ দেখে যেমন আসছে বছরে বাঙলার ভবিষ্যৎ কি হবে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, ঠিক তেমনি আজ রাত্রে আমি যা স্বপ্ন দেখলুম, তার থেকে তিন মাস পরে আমার কি হবে, সে-হদীস খোঁজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।···তার চেয়ে অনেক নিরাপদ, তাস ফেলে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী কার্য করা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, অচেনা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাপের সংখ্যা জোড় না বেজোড়, গুণে গুণে সেটা বের করে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করা। জোড় হলে মোলায়েম কায়দায় কাজ হাসিল করার চেষ্টা—বেজোড় হলে লোকটার মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম পেটানোর মত শ্মশান-চিকিৎসায়।

কিন্তু আমি স্বপ্নটা দেখেছিলুম একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে।

সেই বাচ্চাটার মত সিনেমা দেখি নি। আমার ফিল্‌ম্‌টা যেন 'যান্ত্রিক গোলযোগে' (অবশ্য তার জন্য 'প্রোগ্রাম' শেষ মরমিয়া ভগুস্বরে কেউ ক্ষমা চায় নি) কেটে যায়। কিন্তু সিনেমার বাক্‌যন্ত্রটি বিকল হয় নি। সে যেন সাথীহারা বিধবার মত একই রোদন বার বার কেঁদে যাচ্ছিল: 'সবই বৃথা, সবই মিথ্যা, সবই বৃথা, সবই মিথ্যা।'···বোধহয় ফিল্‌ম্‌টা বাইবেলের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে তার রূপ বাণী পেয়েছিল। কারণ, তারই সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজিতে ঠিক ঐ একই সন্তাপ কানে আসছিল, 'ভ্যানিটি অব্‌ ভ্যানিটিজ; অল্‌ ইজ্‌ ভ্যানিটি।' যেন বৌদ্ধদের সেই 'সর্বং শূন্যং, সর্বং ক্ষণিকম্‌।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য! বহু, বহু বৎসর পূর্বে দক্ষিণভারতের 'অরুণাচলে' শোনা একটি সংস্কৃত মন্ত্র কানে আসছিল:

'কর্তুরাজ্ঞয়া
প্রাপ্যতে ফলম্‌
কর্ম কিং পরং
কর্ম তজ্জড়ম্‌॥'

এর বাঙলা অনুবাদ আমার এমনই সুপরিচিত যে, স্বপ্নশেষে সেটিও আমার স্মৃতিপটে ধরা দিল:

'ঈশ্বরাজ্ঞাধীন কর্ম ফলপ্রসূ হয়।
জড় কর্ম সেই হেতু ঈশ বাচ্য নয়॥'

অর্থাৎ কর্ম জিনিসটাই জড়।···ঐ একই কথা—তুমি যে ভাবছো, তোমার যে 'অহংকার', তুমি কর্ম করছো এবং সেই কর্ম থেকে ফল প্রসবিত হচ্ছে সেটা সর্বৈব মিথ্যা, সেটা ভ্যানিটি ('অহংকার')।

বলতে পারবো না, কটা ভাষাতে, গদ্যে পদ্যে, গদ্যে পদ্যে মেশানো ভাষায়, কত সুরে এই ফিলারমনিক্‌ অর্কেস্ট্রা চলেছিল।

কিন্তু তখনো স্বপ্ন শেষ হয় নি।

শেষ হলো সেই অরুণাচলমের আরেকটি শ্লোক দিয়ে:

'ঈশ্বরার্পিতং
নেচ্ছয়া কৃতম্।
চিত্তশোধকং
মুক্তিসাধকম্॥'

পাঁজরে যেন গুত্তা খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম।

স্বপ্নলব্ধ প্রত্যাদেশে আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু এবারে আমার ঘাড়ে হুড়মুড়িয়ে আস্ত একটা ট্রাকের চল্লিশ মণ ইট যে-ভাবে পড়লো তাতে অত্যন্ত বিমূঢ় অবস্থায়ও আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, আমার কর্ম দ্বারা কোনো-কিছুরই সমাধান হবে না, শহ্‌র্-ইয়ার, ডাক্তার, পীর সাহেব—এদের জট ছাড়ানো আমার 'কর্ম' নয়, আমার 'কর্ম' 'ঈশ্বর-অর্পিত' নয়।

অতএব এ-পুরী থেকে পলায়নই প্রশস্ততম পন্থা।

* * *

তখনো ফজরের নামাজের আজান পড়ে নি। চন্দ্র অস্তে নেমেছে, কিন্তু তখনো রাত রয়েছে। পূর্ব দিকের অলস নয়নে তখনো রক্তভাতি ফুটে ওঠে নি।

প্রথম একটা চিরকুট লিখলুম। তার পর হাতের কাছে যা পড়ে, নুন ময়লা ধুতি কুর্তা পরে, গরীবের যা রেস্ত তাই পকেটে পুরে চোর এবং অভিসারিকার সম্মিলিত নিঃশব্দ চরণক্ষেপে নিচের তলার সদর দরজার কাছে এসে দেখি, দরজা খোলা। আল্লা মেহেরবান্। তখন দেখি, বৃদ্ধ দারওয়ান শূন্য বদনা দোলাতে দোলাতে দরজা দিয়ে ঢুকছে। পরিষ্কার বোঝা গেল, বৃদ্ধ ফজরের নামাজের পূর্বেকার তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ে।

মনে পড়ল, বহু বহু বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের অতি কাছে, 'নূতন বাড়িতে' কয়েক মাসের জন্য আমার আশ্রয় জুটেছিল। তখন অনিদ্রাকাতরতাবশত অনিচ্ছায় শয্যাত্যাগ

করে আমলকী গাছের তলায় পায়চারি করতে করতে দেখেছি, শুভ্রতম বস্ত্রে আচ্ছাদিত গুরুদেব পূর্বাস্য হয়ে উপাসনা করছেন। পরে তাঁর তৎকালীন ভৃত্য সাধু'র কাছে শুনেছি, তিনি আগের সন্ধ্যায় তোলা বাসি জলে কী শীত কী গ্রীষ্মে স্নানাদি সমাপন করে উপাসনায় বসতেন। তাঁর সর্বাগ্রজ, তাঁর চেয়ে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথকেও আমি শান্তিনিকেতনের অন্য প্রান্তে ঐ একই আচার-নিষ্ঠা করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট; বড়বাবুর একাশি।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। কিন্তু এসব প্রাচীন দিনের কাহিনী বলার লোভ সংবরণ করা বড় কঠিন। অনেকে আবার শুনতেও চায় যে।

*　　*　　*

ঘটিদের একটা মহৎ গুণ, তারা অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। যদিও আড়ালে আবডালে বসে তক্কে তক্কে থেকে আপনার হাঁড়ির খবর, পেটের খবর, যে সাদামাটা পোটফোলিও নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন, বেরুলেন তার ভিতরকার খবর সব জেনে নেয়। আর বাঙালরা এ-বাবদে বুদ্ধু। বেমক্কা প্রশ্ন করে অন্য পক্ষকে সন্দিহান করে তোলে। ঘটি তখ্‌খুনি জিভে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে, ঠোঁট দুটো স্টিকিং প্ল্যাস্টার দিয়ে সেঁটে নিয়ে চড়চড় করে কেটে পড়ে।

তদুপরি এ-বৃদ্ধ দারওয়ান এ-বাড়ির অনেক-কিছুই দেখেছে। বেশীর ভাগই দুঃখের। যে-বাড়ি একদা গমগম করতো, সে এখন কোথায় এসে ঠেকেছে! ভুতুড়ে বাড়ি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সে জানে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে যে-সব উত্তর শুনতে হয়, তার অধিকাংশই অপ্রিয়।

আমি তার দিকে চিরকুটটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'সাহব, বেগম-সাহবকো দেনা।' 'খুদা-হাফিজ' 'অভী আয়া' (সেটা হবে মিথ্যে)

এ-সব তো বললুমই না ; বখশিশ্ দিলে তো এক মুহূর্তেই সর্ব কামুফ্লাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

চিরকুটে লেখা ছিল, 'আমি বোলপুর চললুম ; সময়মত আবার আসবো।'

'যঃ পলায়তি স জীবতি।' আমি ম্লেচ্ছ, দেব-ভাষা জানিনে। স জীবতি' না হয়ে 'যুবতী'ও হতে পারে। সতীত্ব রক্ষা করতে হলে যুবতীকে পলায়ন করতে হয় বই কি!

*　　*　　*

প্রথম হাওড়াগামী ট্রামের জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করতে করতে কদম কদম বাড়িয়ে হাওড়াবাগে এগিয়ে চললাম।

ট্রাম এল। উঠলুম। পাঁচ কদম যেতে না যেতেই বুঝলুম, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' আমাদের ছেলেবেলায় ট্রাম গাড়ির কি-সব যেন থাকতো স্প্রিঙিং, শক্-এব্জরবার আরো কত কী। গাড়ি এমনই মোলায়েমে যেত যে, মনে হতো ওয়াই এম সি এ'র বিলিয়ার্ড টেবিল পেতে এখানে ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ানশিপ দিব্য খেলা যেতে পারে। বস্তুত তখনকার দিনে এরকম আরামদায়ক নিরাপদ বাহন কলকাতায় আর দ্বিতীয়টি ছিল না। আর আজ! প্রতি আচমকা ধাক্কাতে মনে ভয় হলো, কাল রাত্রিতে যা খেয়েছি তারা বুঝি সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল, এই বুঝি সবাই একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে মোকামে ফেরৎ এসে কণ্ডাকটরের কাছে 'গুহ কমিশনের রিপোর্ট' পেশ করবেন, আমি ভোরবেলাকার বেহেড মাতাল।

০৬'৫০-এ বারাউনি প্যাসেঞ্জার ধরে নির্বিঘ্নে বোলপুর ফিরলুম।

কিন্তু বর্ধমানে চা জুটলো না। বর্ধমানে চা যোগাড় করার ভানুমতী খেল গুণীন্ একমাত্র শহর্-ইয়ারই নব নব ইন্দ্রজালে নির্মাণ করে দেখাতে পারেন। সে তো ছিল না।

ট্রেনে মাত্র একটি চিন্তা আমার মনের ভিতর ঘোরপাক খাচ্ছিল।

এই যে আমি কাউকে কিছু না বলে কয়ে সরে পড়লুম, এটাকে ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন 'পলায়ন-মনোবৃত্তি' না কি যেন—বোধহয় 'এস্‌কেপিজম'—রাজভাষায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সংস্কৃত 'পাণ্ডিত্যের' দ্বিরদরদস্তম্ভের উচ্চাসনে বসে যে তত্ত্ব প্রচার করেন—ইংরেজ 'পণ্ডিতরা' তো বটেনই, এবং তাদেরই নুন-নেমক-খেকোহনুকরণকারী জর্মন ফরাসি 'পণ্ডিতের'ও একাধিক জন—সে তত্ত্বের নির্যাস: 'ভারতীয় সাধুসন্ত, গুণীজ্ঞানী, দার্শনিক-পণ্ডিত সবাই, সক্কলেই অত্যন্ত স্বার্থপর, সেল্‌ফিশ্‌। তারা শুধু আপন আপন মোক্ষ, আপন আপন নির্বাণ-কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত। বিশ্বসংসারের আতুরকাতরজনের জন্য তাদের কণামাত্র শিরঃপীড়া নেই, নো হিউমেন সিম্‌পেথি, নো পরোপকার প্রবৃত্তি। এই ভারতীয়দের দর্শন—কি সাংখ্য, কী বেদান্ত, কী যোগ—সর্বত্রই পাবে এক অনুশাসন, "আত্মচিন্তা করো, আপন মোক্ষচিন্তা করো।" মোস্‌ট্‌ সেল্‌ফিশ্‌ এগোইস্টিক ফিলসফি।'

এসব অর্ধভুক্ত বমননিঃসৃত 'আপ্তবাক্য' যুক্তিতর্কদ্বারা খণ্ডন করা যায় না। ভূতকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে ঘায়েল করা যায় না। সেখানে দরকার—জৈসন কে তৈসন—তেজী সরষে ঝাজালো লঙ্কা পোড়ানো।

সে মুষ্টিযোগ রপ্ত ছিল একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের। এ-স্থলে তিনি প্রয়োগ করলেন ঝাঁজালো লঙ্কা-পোড়া। অর্থাৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অতিশয় সিদ্ধহস্তে। অথচ সে পুণ্যশ্লোক রচনা এমনই সুনিপুণ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তথা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-ভরা যে, আজো, অর্ধশতাব্দাধিক কাল পরও এখনো কোনো কোনো 'ভারতপ্রেমী' 'হিন্দু সভ্যতা তথা মর্যাদা রক্ষণ করনেওয়ালা বামনাবতার মন্‌ড্‌লী' বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ বুঝতে না পেরে 'বঙ্কিম মুর্দাবাদ, বঙ্কিম মুর্দাবাদ' জিগির তুলে গগনচুম্বী লম্ফপ্রদানে উদ্যত হন।

বঙ্কিমের সেই 'রামায়ণ সমালোচনার' কথা ভাবছি।

অবশ্য এ-সব ব্যঙ্গ ছাড়াও এদেশের পণ্ডিতগণ দার্শনিক পদ্ধতিতেও ইয়োরোপীয় 'পণ্ডিতদের' মুখ-তোড় উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু হায়, দর্শনশাস্ত্রে আমার আলিফের নামে ঠ্যাঙা। আমি অন্য দৃষ্টি অন্য দর্শনের আশ্রয় নি।

অপবাদটা ছিল কি? আমরা নাকি বড্ডই স্বার্থপর, নিজের মোক্ষচিন্তা ভিন্ন অন্য কারো কোনো উপকার বা সেবার কথা আদৌ ভাবিনে।

এস্থলে আমার বক্তব্যটি—তার মূল্য অসাধারণ কিছু একটা হবে না জানি—সামান্য একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে আরম্ভ করি। এই বাঙলা দেশে সবচেয়ে বেশী কোন্ গ্রন্থখানা পড়া হয়? অতি অবশ্যই মহাভারত। মূল সংস্কৃত, মহাত্মা কালীপ্রসন্নের অনুবাদ, বা রাজশেখরীয়, কিংবা কাশীরামের বাঙলায় রূপান্তরিত মহাভারত কিছু-না-কিছু-একটা পড়ে নি এমন বাঙালী পাওয়া অসম্ভব। এই হিসেবের ভিতর বাঙালী মুসলমানও আসে। প্রমাণস্বরূপ একটি তথ্য নিবেদন করি। দেশ-বিভাগের প্রায় পনেরো বৎসর পর আমি একটি পাকিস্তানবাসিনী মুসলিম ইন্‌স্‌পেকট্রেস্ অব্ স্কুলস্‌কে শুধোই, 'আপনাদের দেশে কাচ্চাবাচ্চাদের ভিতর এখন কোন্ কোন্ বই সবচেয়ে বেশী পড়া হয়?' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'রামায়ণ-মহাভারত—বরঞ্চ বলা উচিত মহাভারত-রামায়ণ—কারণ মহাভারতই কাচ্চাবাচ্চারা পছন্দ করে বেশী। তবে তারা প্রামাণিক বিরাট মহাভারত পড়ে না। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু পরিবারে এখনো কাশীরাম, কিন্তু বাচ্চারা পড়ে "মহাভারতের গল্প" এই ধরনের সাদা-সোজা চটি বই।' তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, 'অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। আমার বারো বছরের ছেলেটা ইতিমধ্যেই তার মামার মত "পুস্তক-কীট" হয়ে গিয়েছে। তাকে কালীপ্রসন্ন আর রাজশেখর দুইই দিয়েছিলুম। মাস দুই পরে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, "রাজশেখর-বাবুর ভাষাটি বড় সহজ আর সুন্দর। কিন্তু সব-কিছুর বড় ঠাসাঠাসি।

কালীপ্রসন্নবাবুরটা বেশ ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে লেখা। আরাম করে ধীরে ধীরে পড়া যায়"।' এরপর মহিলাটি একটু হেসে বললেন, 'জানেন, —বয়স্ক মুসলমানদের কথা বাদ দিন, তাঁরা তো দেশ-বিভাগের পূর্বেই কারিকুলাম মাফিক রামায়ণ-মহাভারত অন্নদামঙ্গল মনসামঙ্গল এ-সবেরই কিছু কিছু পড়েছিলেন—কিন্তু পার্টিশনের এই পনেরো বৎসর পরও আমাদের মুসলমান বাচ্চারা "দাতাকর্ণ"-কে চেনে বেশী, কর্ণের অপজিট নাম্বার আরব দেশের দাতাকর্ণ হাতিম তাঈ-কে চেনে কম।'

এই মহাভারতটি যখন বালবৃদ্ধবনিতার এতই সুপ্রিয় সুখপাঠ্য, তখন দেখা যাক্, এ-মহাগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শেষ উপদেশ কি—ভুল বললুম, 'উপদেশ' নয়, আপন আত্মবিসর্জনকর্মদ্বারা দৃষ্টান্ত-নির্মাণ, আদর্শ নির্দেশ—সেটি কি ?

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণাধিক প্রিয় চারি ভ্রাতা, মাতা কুন্তীর পরই যে নারী তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা সমাদৃতা, যাঁর শপথ রক্ষার্থে এই শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির নৃশংস কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন, সেই নারী, এবং পরস্পর তাঁর চার ভ্রাতা মহাপ্রস্থানিকপর্বে বর্ণিত হিমালয় অতিক্রম করার সময় একে একে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন পরম স্নেহশীল যুধিষ্ঠির তাঁদের জন্য ক্ষণতরেও শোক করেন নি, কারো প্রতি মুহূর্তেক দৃষ্টিপাত না করে সমাহিতচিত্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ-সময় সে-ই কুক্কুর, যে হস্তিনাপুর থেকে এঁদের অনুগামী হয়েছিল, সে-ই শুধু যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে।

এমন সময় ভূমণ্ডল নভোমণ্ডল রথশব্দে নিনাদিত করে দেবরাজ স্বর্গরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে সমুপস্থিত হয়ে বললেন, 'মহারাজ, তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হয়ে স্বর্গারোহণ করো।'

এর পর উভয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। আমার ভাষায় বলি, বিস্তর দর কষাকষি হলো। শেষটায় সমঝাওতা ভী হলো। ঐ যে-রকম দেশ-বিভাগের পূর্বে কংগ্রেস লীগে হয়েছিল। কিন্তু সে তুলনায়

এখানেই সমাপ্তি। ইতিমধ্যে চতুর্পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছেন।

এর পর, পুনরায় আমার নগণ্য ভাষাতেই বলি, বখেড়া লাগল সেই নেড়ি কুত্তাটাকে নিয়ে। যুধিষ্ঠির ফরিয়াদ করে বলছেন, 'এ কুত্তাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে এত দীর্ঘদিন ধরে এসেছে। একে এখানে ছেড়ে গেলে আমার পক্ষে বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ হবে।'

সরল ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, এ তো মহা ফ্যাসাদ। এই যুধিষ্ঠিরটা তো আপন স্বার্থ কখনো বোঝে নি, এখনও কি আপন কল্যাণ বোঝে না? প্রকাশ্যে বললেন, 'ধর্মরাজ, আজ তুমি অতুল সম্পদ্, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করবে। এই 'স্বরূপত্ব লাভ'টা আমি আজো বুঝতে পারি নি; মরলোকের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তো স্বর্গলোকে তাঁর স্বরূপত্ব লাভ করবেন স্বর্গের ধর্মরাজ যমরাজার অস্তিত্বে বিলীন হয়ে—ইন্দ্রের স্বরূপত্ব লাভ করবেন তো তাঁর পুত্র অর্জুন!)। এসব বিদকুটে বয়নাক্কা করো না। আমার এই অতি পূত, হেভেনলি বেহেশ্‌তের রথে ঐ নেড়ি, ঘেয়ো অতিশয় অপবিত্র কুকুর—আর হাইড্রফবিয়া থাকাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়—কি করে ঢুকতে পারে?'

* * *

এ-সব তাবৎ কাহিনী সক্কলেরই জানা। আমি শুধু আমার আপন ভাষাতে কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। কেউ যেন অপরাধ না নেন। যুগ যুগ ধরে আসমুদ্র-হিমাচল সবাই আপন আপন ভাষাতে মহাভারত নয়া নয়া করে লিখেছে। আমি যবন। আপ্তবাক্য বেদে আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। কিন্তু মহাভারতে অতি অবশ্যই আছে। সাবধান! বাধা দেবেন না। কমুনাল রায়োট লাগিয়ে আপন হক্ক কেড়ে নেব।

কিন্তু এহ বাহ্য।

ইয়োরোপীয়রা বলে আমরা স্বার্থপর। তবে আমাদের এই যে

সর্বপরিচিত সর্বজনসম্মানিত গ্রন্থে যুধিষ্ঠির বলছেন, তাঁর স্বর্গসুখের তরে কোনো লোভ নেই, তিনি মোক্ষলুব্ধ নন, এমন কি স্বর্গে না যেতে পারলে তিনি যে তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, কুন্তী, পাঞ্চালীর সঙ্গসুখও পাবেন না, তাতেও তাঁর ক্ষোভ নেই—কিন্তু, কিন্তু, তিনি

এই 'ভক্ত শরণাগত' কুকুরটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

*　　*　　*　　*

ট্রেনে কলকাতা থেকে আসতে আসতে এই সব কথা ভাবছিলম। স্বপ্নে যে শুনেছিলুম, যার মোদ্দা ছিল,

'ওরে ভীরু, তোমার উপর নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার॥'

'তুই কলকাতা ছেড়ে পালা'। না, যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে সেই পন্থা অবলম্বন করবো?—অবশ্য আমি যুধিষ্ঠির নই বলে, আমার যেটুকু সঙ্গতি আছে সেইটুকু সম্বল করে নিয়ে।

হজরৎ নবী প্রায়ই বলতেন, 'আল্লার উপর নির্ভর (তওয়াক্কল) রেখো।' একদা এক বেদুইন শুধোলো, 'তবে কি, হুজুর, দিনান্তে উটগুলোকে দড়ি দিয়ে না বেঁধে মরুভূমিতে ছেড়ে দেব—আল্লার উপর নির্ভর করে?' পয়গম্বর মৃদুহাস্য করে বলেছিলেন, 'না। দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে আল্লার উপর নির্ভর রাখবে।' অর্থাৎ বাঁধার পরও ঝড়ঝঞ্ঝা আসতে পারে, দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে, চোর এসে দড়ি কেটে উট চুরি করে নিয়ে যেতে পারে—ঐ সব অবোধ্য দৈব দুর্বিপাকের জন্য আল্লার উপর নির্ভর করতে হয়।

তবে কি আমার কলকাতাতে রয়ে গিয়ে যেটুকু করার সেইটুকু করাই উচিত ছিল—আল্লার উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ 'মা ফলেষু কদাচন' করে?

*　　*　　*　　*

শুতে যাবার সময় হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আপন মনে একটু হাসলুম।

সেই পাকিস্তানী মহিলাকে শুধিয়েছিলুম, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই নাপাক কুকুরটা মহাভারতে ঢুকলো কেন?

তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভেবে দেখেছি কথাটা।···আসলে কি জানেন, মহাভারত সব বয়সের লোকের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে—বাচ্চাদের জন্যও।

তারা কুকুর বেরাল ভালোবাসে। তাই তারা কুকুরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়। ঐটেই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগ।'

বাইশ

কলকাতা,

হাজার হাজার আদাব তসলিমাৎ পর পাক জনাবে আরজ এই,

সৈয়দ সাহেব,

আমি ভেবেছিলাম, দু'একদিনের ভিতর আপনাকে সব-কথা খুলে বলার সুযোগ পাব, কিন্তু আপনি হঠাৎ চলে গেলেন। আপনার ডাক্তার বিস্মিত ও ঈষৎ নিরাশ হয়েছেন। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলুম, এই ভালো। আপনার সামনে আমার বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন সব আপত্তি, প্রতিসমস্যা তুলতেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার কোনো-কিছুই বলা হয়ে উঠতো না। তাই চিঠিই ভালো। কে যেন আপন ডায়েরি লেখার প্রারম্ভেই বলেছেন, মানুষের চেয়ে কাগজ ঢের বেশী সহিষ্ণু।

অবশ্য এ-কথা আবার অতিশয় সত্য যে পত্র লেখার অভ্যাস আমার নেই। ভাষার উপর আমার যেটুকু দখল সেও নগণ্য। তাই যা লিখব তা হবে অগোছালো। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটিও বলি; আমার ভাবনা চিন্তা সবই এমনই অগোছালো যে অগোছালো ভাষাই আমার অগোছালো মনোভাবকে তার উপযুক্ত প্রকাশ দেবে। তদুপরি আমি জানি, আপনি গোছালো অগোছালো সব বাবিশ সব সারবস্তু মেশানো যে ঘ্যাট, তার থেকে সত্য নির্যাসটি বের করতে পারেন।

আপনি হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আমি মোদ্দা কথায় আসছি না কেন? সেটাতে আসবার উপায় জানা থাকলে তো অনেক গণ্ডগোলই কেটে যেত।

আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত আমার বুকে তুফান

তোলে না, সে কথা আপনাকে আমি বলেছি। এখনও ফের বলছি —আপনার সে-রাত্রের দীর্ঘ ডিফেন্‌সের পরও। অথচ এ-স্থলে আমাকে তাঁরই শরণ নিতে হলো।

গানটি আপনি নিশ্চয়ই জানেন :

'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।'

এ-স্থলে আমি এটা স্বীকার করে নিচ্ছি, যে, কবিগুরুর তুলনায় আমি শোকদুঃখ পেয়েছি অনেক অনেক কম। আপনি সে-রাত্রে তাঁর একটার পর একটা দুর্দৈবের কাহিনী বলার পূর্বে আমি সেদিকে ও-ভাবে কখনো খেয়াল করি নি। আপনার এই সুদ্দুমাত্র তথ্যোল্লেখ আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। আমি ভাবছিলুম, রবীন্দ্রনাথ পর পর এতগুলো শোক পাওয়ার পরও কি জানতে পারলেন না, তাঁর 'কিসের ব্যথা', তাঁর শোকটা কোন্ দিক থেকে আসছে?

তাই অসঙ্কোচে স্বীকার করছি, আমি এখনো ঠিক ঠিক জানিনে, 'আমার কিসের ব্যথা', আমার অভাব কোন্ খানে, যার ফলে বিলাসবৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন আমাকে অশান্ত করে তুলেছিল।

কিন্তু এখানে এসেই আমার বিপত্তি—যে-বিপত্তি এতদিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে। এবং সত্য বলতে কি, তার অনেক আগের থেকেই। কিশোরী অবস্থায় যখন প্রথম পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ হয় তখন থেকেই। পুরুষ কথাটার উপর আমি এখানে জোর দিচ্ছি।

আমার বিপত্তি, আমার সমস্যা—পুরুষ মানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে? সাহিত্যজ্ঞ সমালোচক পণ্ডিতরা বলেন, সার্থক সাহিত্যিকের ঐ তো কর্ম, ঐ তো তার সত্যকার সাধনার্জিত সিদ্ধি। জমিদার রবীন্দ্রনাথ গরীব পোস্টমাস্টার, ভিন্‌দেশী কাবুলীওলার বুকের ভিতর প্রবেশ

করে তাদের হৃদয়ানুভূতি স্পন্দনে স্পন্দনে আপন স্পন্দন দিয়ে অনুভব করে তাঁর সৃজনীকলায় সেই অনুভূতিটি প্রকাশ করেন। যে কবি, যে সাহিত্যিক আপন নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মরণ করে, অপরের সত্তায় বিলীন হয়ে যত বেশী গ্রহণ করে আপন সৃজনে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই তত বেশী সার্থক কবি, সাহিত্যিক।

এ-তত্ত্বটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস, পুরুষ কবি, পুরুষ সাহিত্যিক কখনো, কস্মিনকালেও নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নি, পারবেও না ; তার কারণ কি, কেন পারে না, সে নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু কোনো সদুত্তর পাই নি।

যদিও কিঞ্চিৎ অবান্তর তবু এই প্রসঙ্গে একটি কথা তুলি। নারী-হৃদয়ের স্পন্দন এবং পুরুষ-হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনের আলোচনা নয় ; নারী পুরুষের একে অন্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার যে চিন্ময় প্রেম সেটাও নয়। আমি নিতান্ত মৃন্ময়, শারীরিক যৌন সম্পর্কের কথা তুলছি। আজকাল সাহিত্যিক, তাঁদের পাঠকসম্প্রদায়, খবরের কাগজে পত্র-লেখকের দল সবাই নির্ভয়ে এ-সব আলোচনা সর্বজন-সমক্ষে করে থাকেন। আমার কিন্তু এখনো বাধো বাধো ঠেকে। কত হাজার বৎসরের 'না, না'-র taboo আজ অকস্মাৎ পেরিয়ে যাই কি প্রকারে ?

তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা, যাঁর আপ্তবাক্যের শরণ আমি নিচ্ছি, তিনি আপনার গুরুর গুরু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে 'দেশ'-পত্রিকার সঙ্গে আপনি বহু বৎসর ধরে বিজড়িত সেই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল তাঁর একখানা চিঠি। আমার শব্দে শব্দে মনে নেই। তবে মূল তত্ত্বটি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

কে যেন তাঁকে শুধিয়েছিল, পুরুষ যখন কখনো কোনো রমণীকে দেখে কামাতুর হয় (এখানে দেহাতীত স্বর্গীয় প্লাতনিক প্রেমের কথা হচ্ছে না), তার কামকে উত্তেজিত করে রমণীর কোন্ কোন্ জিনিস ?

তার মুখমণ্ডল, তার ওষ্ঠাধর, তার নয়নাগ্নি, তার কুচদ্বয়, তার নিতম্ব, তার উরু।

এই বারে প্রশ্ন, কোনো পুরুষকে দেখে যখন কোনো রমণী কামাতুরা হয় তখন কি দেখে তার কামবহ্নি প্রজ্বলিত হয়?

যে-ভদ্রলোক দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে এ-প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন তাঁর পত্র 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু 'দেশে' প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রোত্তর থেকে সে-প্রশ্নের মোটামুটি স্বরূপ অনুমান করা যায়।

আবার বলছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ কি উত্তর দিয়েছিলেন সেটি আক্ষরিক, হুবহু আমার মনে নেই। তিনি যা লিখেছিলেন তার মোদ্দা তাৎপর্য ছিল; তিনি যে এ-সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করেন নি, তা নয়। কিন্তু কোনো সদুত্তর খুঁজে পান নি।

তারপর ছিল ইংরিজি একটি সেন্টেন্স। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি লিখলেন, But why ask me? Ask Rabi. He deals in them. অর্থাৎ বলতে চেয়েছিলেন, তিনি দার্শনিক, এ-সব ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ নন; তবে লাকিলি তাঁর ছোট ভাইটি এ-বাবদে স্পেশালিস্ট; তিনি প্রেম, কাম, নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিতে পারেন।

কিন্তু সৈয়দ সাহেব, পীর সাহেব, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিও এ-বিষয়ে খুব বেশী ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন না। প্রথম যৌবনে তিনি এ-সব নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি--যাকে বলে হট্‌-স্টাফ্‌—সেটাকে তাঁর গানের বিষয়বস্তু করেন নি। বোধহয় ভেবেছিলেন, তাঁর রচিত হট্‌-স্টাফ্‌ গান আশ্রমের ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীরা দিনের পর দিন শুনবে, এটা কেমন যেন বাঞ্ছনীয় নয়। এবং এগুলো তো আর ওয়াটার-টাইট কমপার্টমেণ্টে বন্ধ করে খাস কলকাতার বয়স্কদের কন্‌জাম্‌প্‌শনের জন্য চালান দেওয়া যায় না। এগুলোর

বেশ কিছু ভাগ বুমরাঙের মত ফিরে আসবে সেই বোলপুরেই—প্রথম যুগে গ্রামোফোন রেকর্ডের "কল্যাণে", পরবর্তী যুগে বেতার তো ঘরে ঘরে।

অযথা বিনয় আমার সয় না। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশ ভালো করেই চিনি, অবশ্য বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের মত তাঁর গানের "ফুলস্টপ-কমা স্পেশালিস্ট্" নই। তাই অফ্ হ্যান্ড্ বলছি তাঁর শেষের দিকের গানের একটিতে হট্-স্টাফের কিঞ্চিৎ পরশ আছে—

"বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।"

আর বার বার বলছেন, "পিয়ো হে পিয়ো।" সর্বশেষে বলছেন, আমার এই তুলে-ধরা পান-পাত্র চুম্বনের সময় তোমার নিশ্বাস যেন (আমার) নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায়।

এই যে প্রিয়ার "নবীন উষার পুষ্পসুবাসের" মত নিশ্বাস, একে নিঃশেষে শোষণ করার মত সাব্‌লাইম্ কাম আর কী হতে পারে?

কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি, রবীন্দ্রভক্তদের ভিতর এ-গানটি খুব একটা চালু নয়। অথচ দেখুন, সিনেমা এটা নিয়েছে, গ্রামোফোন এটা রেকর্ড করেছে। মাফ করবেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এইসব তথা-কথিত রবীন্দ্রভক্তদের চেয়ে ব্যবসায়ী সিনেমা, গ্রামোফোন কোম্পানি রবীন্দ্রনাথকে বহু বহু বার অধিকতর সম্মান দেখিয়েছে, নিজেদের সুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

হ্যাঁ, আগে ভাবি নি, এখন হঠাৎ মনে পড়ল আরেকটি গানের কথা। এটি অবশ্য হট্-স্টাফ্ নয়, কিন্তু আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে।

"ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।

ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি ॥
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা-
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয়-মাঝে আজি
আমায় এমন মরণ হানি ॥"

আচ্ছা, চিন্তা করুন তো এ-গানটি কোন্ সময়ের রচনা? ভাষার পারিপাট্য, স্বতঃস্ফূর্ত মিলের বাহার, আরো কত না কারুকার্য—যেগুলো চোখে পড়ে না, কারণ প্রকৃত সার্থক কলার ভিতরে তারা নিজেদের এফার্টলেসলি বিলীন করে দিয়েছে- এগুলো তো ঐ গানের পরবর্তী শ্লোকের ভাষায় "আকাশ উজলি" লাগিয়ে বিজুলি আমাকে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে, গানটি কবির পরিপক্ক বয়সের অত্যুৎকৃষ্ট সৃজন। নিশ্চয়ই এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে।

কিন্তু যে গুণী আমাকে এ-গানটি শুনিয়েছিলেন এবং শেখাবারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি "গীতবিতানে" যে মুদ্রিত পাঠ আছে তার থেকে মাত্র একটি শব্দ পরিবর্তন করে গানটি গেয়েছিলেন। ছাপাতে আছে, ঝড়ের দুর্দান্ত বাতাসে কে যেন আর্তরব করছে, তার 'মুখের আঁচলখানি উড়ে যাচ্ছে।'

গুণী বলেছিলেন, '১৯২০-১৯৩০-এ মুখের আঁচল উড়ে যাওয়াতে কোন্ মেয়ে এরকম চিল-চ্যাঁচানো চেল্লাচেল্লি পাড়া-জাগানো হৈ হুল্লোড় আরম্ভ করবে? তার নাকি "সাজসজ্জা লাজলজ্জা" বেবাক কপ্‌পুর হয়ে গেল। (এস্থলে বলি, ঐ গুণীটি আপনার ভাষার অনুকরণ করেন।) আর শুধ্ কি তাই? তাকে "প্রলয় মাঝে আনি / এমন মরণ হানি"—"তুমি দেখলে আমারে!"—'

গুণী বললেন, 'এটা হতেই পারে না। আসলে গানটি কি ছিল

জানেন? সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় সে ছিল তখন উলঙ্গ। সে গান ছিল,

"ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার বু কে র
ব স ন খানি"

অর্থাৎ ঝড়ে মুখের "আঁচলখানি" যায় নি, গেছে "বুকের বসনখানি।"

কিন্তু গানটি প্রথমবার গাওয়া মাত্রই যাঁরা সে নিতান্ত ঘরোয়া জলসাতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেমন যেন অস্বস্তি অস্বস্তি ভাব প্রকাশ করে কেউ বা জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, কেউ বা পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ নূতন গান প্রথমবার সর্বজনসমক্ষে গাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই আপন প্যাঁসনে চশমাটি পরে নিয়ে সকলের মুখের দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিতেন এবং বুঝে যেতেন, নূতন গানটি শ্রোতাদের হৃদয়মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এবারে তিনি বুঝে গেলেন, কোনো কিছুতে একটা খটকা বেধেছে—যেটা অবশ্য ছিল বড় বিরল। তাই কাকে যেন শুধোলেন—আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—ব্যাপারটা কি? কারণ আজ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গানটি অপূর্ব।

তখন কে যেন একজন সভয়ে বললেন, "ঐ বুকের বসন" কেউ কেউ মিসআণ্ডারস্টেণ্ড করতে পারে হয়তো।"

রবীন্দ্রনাথ এ-সব রসের আসরে তর্কাতর্কি করতেন না। চুপ করে একটুখানি ভেবে বললেন, "আচ্ছা দেখছি।"

আশ্রমে রাত্রের খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল। সভা ভঙ্গ হলো।

তার পর দিনই টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হলো। তার কিছুদিন পরে ছাপাতে দেখি,—গানটি কোথায় যেন বেরিয়েছিল —"বুকের বসনের" বদলে "মুখের আচল" এই বিকল্প নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

গুণী কিছুটা সহানুভূতিমাখা সুরে আপন বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে, "অর্থাৎ সেই নগ্ন নবজাত শিশু গানটির উপর রবীন্দ্রনাথ পরিয়ে দিলেন চোগা-চাপকান—পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে।···এ-সম্বন্ধে আমার মতামত তো বললুম, কিন্তু কবি, সুরকার, নব নব রাগরাগিণীর সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করার—নিন্দাবাদ দূরে থাক—আমার কী অধিকার! আমার অতি নগণ্য রসবোধ যা বলে, সেইটেই প্রকাশ করলুম মাত্র।'

কিন্তু প্রিয় সৈয়দ সাহেব, এই যে মুখের আঁচল, বুকের বসন নিয়ে কাহিনীটি ঐ গুণী কীর্তন করেছিলেন সেটা ন'সিকে লিজেণ্ডারি বা—আপনাদের রকের ভাষায় গুলও হতে পারে, কিংবা এর ভিতর সিকি পরিমাণ সত্যও থাকতে পারে। কারণ ঐ গুণী প্রধানত গাইতেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সেখানে তাঁকে ক্রমাগত ইম্‌প্রভাইজ করতে হয়, নব নব রস সৃষ্টি করার জন্য নব নব কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। সেটা পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তাই তো সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদদের নিয়ে এত গণ্ডায় গণ্ডায় লিজেণ্ড। হয়তো তিনি সেটা নিছক কল্পনা দিয়ে রঙে রসে জাল বুনেছেন, এবং বার বার একে ওকে সেটা বলে বলে, সেই "রেওয়াজের" ফল স্বরূপ নিজেই এখন সে-কাহিনী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন।

আপনিই না এক দিন বলেছিলেন, "পরিপূর্ণ পাক্কা মিথ্যেবাদী হওয়ার পথে যেতে যেতে যারা উত্তম সুযোগ না পেয়ে দড়কচ্চা মেরে গেল, অর্থাৎ যাদের গ্রোথ্ স্টান্‌টেড্ হয়ে গেল, তারাই আর্টিস্ট, সাহিত্যিক, কবি, আরো কত কী!

তবে ঐ যে-লিজেণ্ডটির কাহিনী এই মাত্র বললুম, সেটা সত্য না হলেও হওয়া উচিত ছিল,—এবং যাই হোক্, যাই থাক্—কাহিনীটি ক্যারেক্‌টারিস্টিক এবং টিপিকাল।

কিন্তু আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন—আবার ভাবছেন, আপনাকে আমার এ-চিঠি লেখার উদ্দেশ্যটা কি? এখখুনি বলছি।

আমার বক্তব্য, কী রবীন্দ্রনাথ, কী কালিদাস, কী বুদ্ধদেব—কেউই রমণীরহস্য এ যাবত আদৌ বুঝে উঠতে পারেন নি। সহস্র বৎসরের এই সাধনার ধন পুরুষ মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শুধু খুঁজেছে কিন্তু সন্ধান পায় নি।

প্রশ্নটা তো অতি সরল। যা দিয়ে আমি এ-চিঠি আরম্ভ করেছি। উপস্থিত কঠিনতর সমস্যা, রহস্যগুলো বাদ দিন। সেই যে অতিশয় সাদামাটা প্রশ্ন: পুরুষের কি দেখে রমণী কামাতুর হয়? এবং সেটা শুধু নারী পুরুষেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গেও সেটা সমানভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ অবজেক্‌টিভ্‌ স্টাডি করারও পূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

অথচ কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌। হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করেও পুরুষজাত যখন এর সমাধান বের করতে পারে নি, তখন এই ভেড়ার পাল, এই পুরুষজাত—অপরাধ নেবেন না—বের করবে স্ত্রীচরিত্রের রহস্য, তাদের প্রেমের প্রহেলিকা—যেটা শারীরিক সম্পর্কের বহু বহু ঊর্ধ্বে—তাদের হৃদয়ের আধা-আলো-অন্ধকারের কুহেলিকা!

তাই নিবেদন, এই পুরুষজাতকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ডাক্তার না, পীর না, আপনিও না।

পুরুষজাতটা যে মেয়েদের তুলনায় মূর্খ এবং আপন মঙ্গল কোন্‌ দিকে সেটা না বুঝে বাঁদরের মত যে-ডালে বসে আছে সেই ডালটাই কাটে কুড়িয়ে-পাওয়া করাত দিয়ে। নইলে এই সাত হাজার বছর ধরে এত যুদ্ধ, এত রক্তপাত! আমার নিজের বিশ্বাস, স্ত্রীজাতি যদি এ-সংসারের সর্ব গবর্নমেন্ট চালাতো, কিংবা এখনো চালায় তবে ও-রকম ধারা হবে না। আজো যদি ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ থেকে সব কটা পুরুষকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়ে নারীসমাজকে প্রতিষ্ঠিত

করা হয়, তবে তারা ন'মাস দশদিনের ভিতর মার্কিন-রুশ-মৈত্রী প্রসব করবে! আমি আপনার মত দেশবিদেশ ঘুরি নি; যেটুকু দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, শিলঙের খাসিয়া সমাজে বাস করে—কারণ সে-সমাজ চালায় মেয়েরা। শুনেছি বর্মার সমাজব্যবস্থাও বড়ই সহজ সরল পদ্ধতিতে গড়া।

আরেকটা কথা: হজরৎ মুহম্মদ নবী ইসলাম স্থাপনা করেন। এবং সে শুভকর্মের প্রারম্ভিক মঙ্গলশঙ্খ কাকে দিয়ে বাজালেন? কাকে তিনি সর্বপ্রথম এই নবীন ধর্মে দীক্ষিত করলেন? তিনি তো বীবী খাদিজা—নারী। তার পর আসেন পুরুষ সম্প্রদায়, হজরৎ আলী, আবু বকর, ওমর ইত্যাদি। তা হলে দেখুন, আপনি মুসলমান, আমি মুসলমান, অন্ততঃ আমাদের স্বীকার করতে হবে, যে সর্বজ্ঞ আল্লাতালা—যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং—তিনিই তাঁর শেষ-ধর্ম প্রচারের সময় একটি নারীকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। ফাতিমা জিন্নাহ্ যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য আইয়ুব সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন কলকাতার কোনো কোনো মুসলমান আপত্তি জানিয়ে বলেন, তিনি নারী। আমি তখন বলেছিলুম, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার চেয়ে মুসলিম জাহানে সর্বপ্রথম মুসলমানরূপে দীক্ষিত হওয়ার শ্লাঘাগৌরব অনেক অনেক বেশী—কোনো তুলনাই হয় না। সেই সম্মান যখন একটি নারী তেরশ' বছর পূর্বে পেয়েছে তখন আরেকটি আজ প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না কেন?

তখন তাঁরা তর্ক তোলেন, কিন্তু হজরৎ নবী তো পুরুষ।

আমি বলি, তিনি তো আল্লার বাণী—যার নাম ইসলাম—আল্লার কাছে মিশন রূপে পেয়ে বীবী খাদিজাকে সেইটে দিলেন। স্বয়ং নবী তো এ-হিসেবের মধ্যে পড়েন না। (এ-স্থলে আমার মনের একটি ধোঁকা জানাই। উত্তর চাইনে। কারণ পূর্বেই বলেছি, আপনাদের কাউকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এ-চিঠির উত্তর আপনাকে লিখতে হবে না, কারণ সেটি আমি পাবো

না।···ব্রাহ্মধর্মের সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম কে? প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন? তবে তাঁকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করল কে?···কিংবা নিন্ বুদ্ধদেব। তিনি স্বয়ং কি বৌদ্ধ? তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলো কে? অন্যদের বেলা, যেমন খৃষ্ট, রামমোহনের বেলা অনুমান করতে পারি, স্বয়ং গড্ (য়াহ্ভে) বা পরব্রহ্ম খৃষ্টকে খৃষ্টধর্মে, রামমোহনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু বুদ্ধের বেলা? তিনি তো ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং বলেছেন তিনি, তাঁরা (দেবতারা থাকলেও তাঁরা মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারে অশক্ত। তা হলে?··· এবং আজকের দিনের ভাষায় মার্ক্স্ কি মার্কসিস্ট? লেনিন অবশ্যই মার্কসিস্ট, কিন্তু লেনিন কি লেনিনিস্ট?

কিন্তু একটা কথা পুরুষমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে।

আল্লার হুকুমেই দৃশ্য অদৃশ্য সব-লোকই চলে, কিন্তু মানুষের কৃতিত্বও তো মাঝে মাঝে স্বীকার করতে হয়।

"অদ্যাপিও মধ্যে মধ্যে পুণ্যবান হয়।
নারীরে স্বীকার করি জয় জয় কয়।"

হজরৎ নবী এঁদেরই একজন। বড় বিরল, বড় বিরল, হেন জন যে নারীকে চিনে নিয়ে তার প্রকৃত ন্যায্য স্বীকৃতি দেয়। তাই হজরৎ বলেছিলেন,

"বেহেশ্ৎ মাতার চরণপ্রান্তে।"

এবং নিশ্চয়ই তখন একাধিক দীক্ষিত মুসলমানের অমুসলমান মাতা ছিল। হজরৎ এ-স্থলে কোনো ব্যত্যয় করেছেন বলে তো জানিনে। এবং এ-কথাও জানি হজরৎ শিশুকালেই তার মা'কে হারান।

আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করছি, আপনার উদ্দেশে লেখা এই চিঠিই আমার শেষ চিঠি।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। পূর্বেই বলেছি, এ-চিঠির উত্তরও আপনাকে লিখতে হবে না।

আপনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন, যখন আপনার কোনো পাঠক বহুসমস্যাবিজড়িত, নানাবিধ প্রশ্নসংবলিত দীর্ঘ পত্র লিখে, দফে দফে তার প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তরসহ দীর্ঘতর উত্তরের প্রত্যাশা করে তখন আপনি মনে মনে স্মিতহাস্য করে বলেন ভদ্রলোক যা জানতে চেয়েছেন, সেগুলো একটু গুছিয়ে রম্যরচনাকারে "দেশ" বা "আনন্দবাজারে" পাঠিয়ে দিলে তো আমার দিব্য দু'পয়সা হয়। আর লেখা জিনিসটা নাকি আপনার পে শা। ওটা আপনার নেশা নয়। এবং পেশার জিনিস তো কেউ ফ্রী বিলিয়ে বেড়ায় না। আমি তাই আপনার কাছে কোনো-কিছু মুফতে চাইনে।

(শহ্‌র্-ইয়ারের চিঠি এতখানি পড়ার পর অকস্মাৎ "শংখচূড়ের ডংশনের" মত আমাকে সে-চিঠি স্মরণে এনে দিল, আমি এমনই পাষণ্ড যে, যবে থেকে, পোড়া পেটের দায়ে লেখা জিনিসটাকে পেশা রূপে স্বীকার করে নিয়েছি, সেই থেকেই শহ্‌র্-বর্ণিত ঐ কারণ বশতই আপন বউকে পর্যন্ত দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখি নি। স্তম্ভিত হয়ে ভাবলুম, সেই যে স্যাকরা যে তার মায়ের গয়নায় ভেজাল দিয়েছিল আমি তার চেয়েও অধম। স্যাকরা তবু ভালো মন্দ যাহোক মা'কে এক-জোড়া কাঁকন তো দিয়েছিল, আমি সেটিও প্রকাশক সম্পাদককে পাঠাচ্ছি! এই অনুশোচনার মাঝখানে আমার মনে যে শেষ চিন্তাটির উদয় হলো সেটি এই : এ-হেন নির্মম আচরণে হয়তো আমিই একা নই। নেই-বনে হয়তো আমি একাই খাটাশ হয়েও বাঘের সম্মান পাচ্ছিনে। আরো দু'চারটে খাটাশ আছেন। কিন্তু হায়, তাঁরা তো আমাকে পত্র লিখে তাঁদের হাঁড়ির খবর জানাবেন না!)

*　　*　　*

আত্মচিন্তা স্বদেহ-'ডংশন' স্থগিত রেখে আবার শহ্‌র্-ইয়ারের

চিঠিতে ফিরে গেলুম। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করছি, নির্লজ্জের মত স্বীকার করছি, অকস্মাৎ পুরুষবিদ্বেষে রূপান্তরিত এ-রমণীর জাতক্রোধে পরিপূর্ণ এই পত্রখানা আমার খুব একটা মন্দ লাগছিল না।

এর পর ইয়ার লিখছে,—

আদিখেত্তা, না, আদিখ্যেতা ? কিন্তু আপনি এই মেয়েলি শব্দটি বুঝবেন। আপনি ভাবছেন, আমি আদিখেত্তা, বা আপনাদের ভাষায় "আধিক্যতা" করছি। কিন্তু আপনি তো অন্তত এইটুকু জানেন—যদিও, অপরাধ নেবেন না, স্ত্রী-চরিত্রে আপনার জ্ঞান এবং অনুভূতি ঠিক ততটুকু, যতটুকু একটা অন্ধ এস্কিমোর আছে, হুগলি নদীর অগভীর বিপদসঙ্কুল ধারায় পাইলট জাহাজ চালাবার—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ-হাহাকারদৈন্যের মরুভূমিতে আমি একা নই, আমার মত বিস্তর রমণী রয়েছে যাদের জীবন শূন্য। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। কিন্তু তাদের অধিকাংশর—বিশেষ করে হিন্দু রমণী—সেটা জীবনভর এমনই আশ্চর্য সঙ্গোপনে রাখে যে তাদের নিকটতম আত্মজনও তার আভাসমাত্র পায় না। গুরুর গানে আছে তাঁর বেদনার

"ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে।"

আর এই রমণীদের বেলা তাদের বেদনার

"ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা আ য়ু ধরে।"

ঐ যে আপনার 'ভক্ত' খানের ঠাকুরমা। তিনি যে তাঁর সমস্ত জীবন শূন্যে শূন্যে কাটিয়েছেন তার আভাস কি তার জাদু ভূতনাথ (হোয়াট এ নেম ! আমার বিশ্বাস ওর বাপমা তার নাম রেখেছিলেন 'অনিন্দ্যসুন্দর খান' এবং বড় হয়ে, অ্যাজ এ প্রটেস্ট্, সে অন্য একসট্রিমে গিয়ে এফিডেভিট দিয়ে 'ভূতনাথ' নাম নেয়) পর্যন্ত পেয়েছে ?

ঐ ঠাকুরমার শূন্যতা এবং আমার শূন্যতা যেন হংসমিথুনের মত আমাদের একে অন্যকে কাছে টেনে নিয়ে আসে। ওদিকে উনি নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী এবং আমিও গরবিনী মুসলমানী। শুনেছি, প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময় একই গাছের গুঁড়ির উপর ঠাসাঠাসি করে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, নকুল, গোসাপ নিরাপদ তীরের আশায় ভেসে ভেসে যায়। কেউ তখন কারো শত্রুতা করে না, এমন কি আপন অসহায় ভক্ষ্য প্রাণীকেও তখন আক্রমণ করে না। আর আমাতে ঠাকুমাতে তো পান্নাসোনায় মিল্‌টি মানানসই। আমরা দুজনা বসে আছি একই নৌকায়! একমাত্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা বলে, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা অহিনকুলের—আজকের দিনের ভাষায় বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ার)। আর আমাদের উভয়ের সামনে,

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার
পার আছে কোন্ দেশে॥···
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে॥
পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়
কী আছে শেষে!"

ঐ তো আমার 'দোষ'! কোনো-কিছু বলতে গেলেই আমার রসনায় এসে আসন নেয় রবিঠাকুর, কালিদাসের রসনায় যে-রকম বীণাপাণি আসন জমিয়ে মধুচক্র গড়তেন। আর লোকে ভাবে—হয়তো ঠিকই ভাবে—আমার নিজস্ব কোনো ভাব-ভাষা নেই, আমি "চিত্রিতা গর্দভী"—রবিকাব্যের গামলার নীল রঙে আমার ধবলকুষ্ঠের মত সাদা চামড়াটি ছুপিয়ে নিয়ে নবজলধরশ্যাম কলির মেকি কেষ্ট হয়ে গিয়েছি!

কিন্তু আপনি জানেন, আপনাকে অসংখ্য বার বলেছি, আমি রাজা পিগমালিয়োন—এস্থলে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত মর্মরমূর্তি। বরঞ্চ তারো বাড়া। পিগ্‌মালিয়োন তাঁর গড়া প্রস্তরমূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করতে

অক্ষম ছিলেন বলে দেবী আফ্রোদিতে'কে প্রার্থনা করেন, তাঁর সেই মূর্তিটিকে জীবন্ত করে দিতে। দেবীরা—পূর্বের কথা স্মরণ করে দিয়ে আবার বলছি, পুরুষের তুলনায় তাঁরা চিরন্তনী কারুণাময়ী। "ধন্য মা মেরি, তুমি, মা, পূর্ণা করুণাময়ী" সর্বদেবীর সর্বশেষ সর্বাঙ্গসুন্দরী মা-জননী—দেবী আফ্রোদিতে রাজার বর পূর্ণ করে দিলেন। এ-স্থলে দেবীর এমন কী কেরামতি, কী কেরদানি! পক্ষান্তরে দেখুন, আমার এই মূর্তদেহ নির্মাণের জন্য, প্রশংসা হোক, নিন্দা হোক, সেটা পাবেন আমার জনকজননী। কিন্তু সে-দেহটাকে চিন্ময় করলো কে? গানে গানে রসে রসে, রামধনুর সপ্তবর্ণের সঙ্গে মিশিয়ে তার ভিতর দিয়ে উড়ে-যাওয়া নন্দনকানন-পারিজাত রঙে রঞ্জিত প্রজাপতির কোমল-পেলব ডানা দুটির বিচিত্র বর্ণে, নবীন উষার পুষ্পসুবাসে, প্রেমে প্রেমে, বিরহে বিরহে, বেদনা বেদনায় কে নিরমিল আমার হৃদয়, আমার স্পর্শকাতরতা, কোণের প্রদীপ যে-রকম জ্যোতিঃসমুদ্রে মিলিয়ে যায় হুবহু সেই রকম সৌন্দর্যসাগরে ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আমার নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আকুলতা—এটি নির্মাণ করলো কে? মহাপ্রভুর বর্ণ দেখে কে যেন রচেছিলেন—শব্দে শব্দে মনে নেই—

"চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো,
কে মাজিল গোরার দেহখানি!

ভারী সুন্দর! আকাশের চাঁদ আর পৃথিবীর চন্দন—অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা চন্দ্র আর এই মাটির পৃথিবীর চন্দন দিয়ে, ক্রন্দসী দ্বারা স্বর্গমর্ত্যের সমন্বয়ে মাজা হল গৌরাঙ্গের দেহখানি! কিন্তু মহাপ্রভুর ভাষাতেই বলি এহ বাহ্য। 'দেহ' তো বাইরের বস্তু।

বার্নার্ড শ' রাজা পিগমালিয়োনকে অবশ্যই ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর মূর্তি এলাইজাকে দিলেন সুমিষ্ট ভাষা এবং সুভদ্র বিষয় নিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সমাজে আলোচনা করার অনবদ্য দক্ষতা।

শ'কে ছাড়িয়ে বহু বহু সম্মুখে এগিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। আমার চিৎময় হৃদ্‌ময় জগৎ নির্মাণ করে তিনি আমাকে যে বৈভব দিয়েছেন, শ'র সৃষ্টি তার শতাংশের একাংশও পায় নি।

আপনাদের ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে আপনার সম্মুখে শেষবারের মত আমার শেষ গুরুদক্ষিণা নিবেদন করে গেলুম।

* * *

কিন্তু মেয়েদের এই শূন্যতা, দীনতা, ফ্রাস্‌ট্রেশনের জন্য দায়ী কে?

নারী হয়েও বলবো, তার জন্য সর্বাগ্রে দায়ী রমণীকুল। প্রধানতঃ।

আপনারই গুরু স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের "দেশে" প্রকাশিত রচনাতে একটি সুভাষিত পড়েছিলুম,

"কুঠারমালিনং দৃষ্ট্বা
সর্বে কম্পান্বিতা দ্রুমাঃ।
বৃদ্ধ দ্রুমো বক্তি, "মা ভৈঃ
না সন্তি জ্ঞাতয়ো মম"॥

"কুঠারমালাধারীকে দেখে সমস্ত গাছ যখন কম্পান্বিত তখন বৃদ্ধ একটি গাছ বললে, 'এখনই কিসের ভয়? এখনো আমাদের (জ্ঞাতি) কোনো গাছ বা বৃক্ষাংশ ওর পিছনে এসে যোগ দেয় নি'।"

শহ্‌র্-ইয়ার লিখছে, বড় হক্ কথা। কামারের তৈরি কুড়োলের সুদ্দুমাত্র লোহার অংশটুকুন দিয়ে কাঠুরে আর কি করতে পারে, যতক্ষণ না কাঠের ঠুকরো দিয়ে ঐ লোহায় ঢুকিয়ে হ্যাণ্ডিল বানায়। পুরুষজাত ঐ লোহা; সাহায্য পেল মেয়েদের সহযোগিতার কাঠের হ্যাণ্ডিল। তাই দিয়ে যে-মেয়েরই একটু 'বাড়' হয় তাকে কাটে, আর যেগুলো নিতান্ত নিরীহ চাঁরা গাছ বা যে-সব বছর-বিয়ানীরা গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা বিইয়ে বিইয়ে জীবন্মৃত তাদের রেহাই দেয়।

এই সব অপকর্মে যুগ যুগ ধরে সাহায্য করেছে মেয়েরাই।

শুনেছি, সতীদাহের পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য বিধবাকে প্ররোচিত করেছে সমাজাগ্রগণ্যা নারীরাই।

এত দিন বলি নি, এইবারে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার বেলা বলি, এই কলকাতার মুসলমান মেয়েরা—দু'চারটি হিন্দুও আছেন—আপনার সঙ্গে আমার অবাধ মেলা-মেশা দেখে ঢিঢিট্টাকার দেয় নি? বেহায়া বেআব্রু বেপর্দা বেশরম, তওবা তওবা বলে নি? তবে কি না, আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, "চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া" হয়তো আমার দেহ এমন কি হৃদয়ও মাজা হয়েছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক, তজ্জনিত বুদ্ধি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবহেলা করার মত আমার গণ্ডারচর্মবিনিন্দিত দার্ঢ্য নির্মিত হয়েছে সুইডেনের প্যোর স্টেন্‌লেস্ স্টিল ও সাউথ আফ্রিকার আন্-কাট্ ডায়মণ্ড মিশিয়ে আর আছেন, ভূতনাথের ঠাকুমা। যাঁকে বলতে পারেন আমার টাওয়ার অব্ পাওয়ার।

তদুপরি আমার অভিজ্ঞা বলে এই সব "আজ-আছে-কাল-নেই" জিভের লিকলিকিনি অনেকখানি বিঘ্নসন্তোষমনা পরশ্রীকাতরতা বশতঃ। ইলিয়েট রোডের সায়েব মেমরা বড়দিনে যখন নানাবিধ ফূর্তির সঙ্গে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে নৃত্য করে তখন আমরা—হিন্দুমুসলমানরা—প্রাণভরে ছ্যা ছ্যা করি বটে, কিন্তু তখন কসম খেতে হলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির পার্ট প্লে করা বন্ধ করে স্বীকার করতে হবে, মনের গোপন কোণে হিংসেয় মরি, "হায়! আমাদের রদ্দী বুড্‌ঢা সমাজ এ-আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করলো কেন?" নয় কি? সত্য বলুন। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনি বিদেশে বিস্তর নেচেছেন, আর এখন, আমাদের মত নিরীহদের মৃদুমন্দ নাচাচ্ছেন। আহা! গোস্‌সা করলেন না তো? শুনেছি, সৈয়দরা বড্ড রাগী হন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা সান্ত্বনার বাণীও পেয়েছি; ওঁয়াদের রাগ নাকি খড়ের আগুনের মত—ধপ্ করে জ্বলে আর ঝপ্ করে যায় নিভে—সঙ্গে সঙ্গে!

অবশ্য একটা জিনিস আমাকে গোড়ার দিকে কিছুটা বেদনা দিয়েছিল—এই সব নগণ্য ক্ষুদে ক্ষুদে, কিন্তু বিষেভর্তি চেরা-জিভ যখন আমার স্বামী, আপনার বন্ধু ডাক্তারের বিরুদ্ধে হিস্ হিস্ করে বিষ বমন করতো। সেখানে আমি যে নাচার। আমি কি রকম জানেন? আপনার ডাক্তার যখন কোনো রুগীকে ইনজেকশন দেয় তখন আমি সেদিকে তাকাতে পারিনে। আমার বলতে ইচ্ছে করে, না হয় দাওনা, বাপু, ইনজেকশনটা আমাকেই।

অবশ্য আল্লার মেহেরবানী। ডাক্তারের কাছে এ-সব হাম্‌লা পৌঁছয় না। তাঁর রিসার্চ-ক্লরফরম্ দিয়ে তিনি তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় অবশ অসাড় করে রেখেছেন।

আপনাকে বলেছি কি সেই গল্পটা? এটি আমি শুনেছি বাচ্চা বয়সে আমাদের বাড়ির এক নিরক্ষরা দাসীর কাছ থেকে। তাই এটা হয়তো লোকমুখে প্রচলিত আঞ্চলিক কাহিনী মাত্র—কেতাব-পত্রে স্থান পায় নি বলে হয়তো আপনার অজানা।

এক বাদশা প্রায়ই রাজধানী থেকে দূরে বনের প্রান্তে একটি নির্জন উদ্যানভবনে চলে যেতেন শান্তির জন্য। সেখানে বালক যুবরাজের ক্রীড়াসঙ্গী নর্মসখারূপে জুটে যায় এক রাখাল ছেলে। তাদের সখ্যে রাজপুত্র কৃষক-পুত্রের ব্যবধান ছিল না।

বাদশা মারা গেলে পর যুবরাজ বাদশা হলেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে যুবরাজ আর সুযোগ পান নি সেই উদ্যানভবনে আসার। যখন এলেন তখন সন্ধান নিলেন তাঁর রাখাল বন্ধুর—স্বয়ং গেলেন তার পর্ণকুটিরে। রাখাল ছেলে পূর্বেরই মত মোড়ামুড়ি দিল। যুবরাজ শুধোলেন, "তোমার বাপকে দেখছি না যে?"

"তিনি তো কবে গত হয়েছেন! আল্লা তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।"

"গোর দিলে কোথায়?"

"ঐ তো হোথায়, খেজুর গাছটার তলায়। বাবা ঐ গাছের রস

আর তাড়ি খেতে ভালোবাসতো বলে আমাকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিল তাকে যেন ওরই পায়ের কাছে গোর দি।" (নাগরিক বিদগ্ধ ওমর খৈয়ামও দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাধি দিতে বলেছিলেন, না?)

রাখাল ছেলে জানতো, আগের বাদশা গত হয়েছেন। তাই শুধোলো, "আর হুজুর বাদশা'র গোর কোথায় দেওয়া হলো?"

ঈষৎ গর্বভরে নবীন রাজা বললেন, "জানো তো রাজা-বাদশারা বড় নিমকহারাম হয়, বাপের গোরের উপর কোনো এমারৎ বানায় না।···আমি, ভাই, সে-রকম নই। বাবার গোরের উপর বিরাট উঁচু সৌধ নির্মাণ করেছি, দেশবিদেশ থেকে সর্বোত্তম মার্বেল পাথর জোগাড় করে।···এই বনের বাইরে গেলেই তার চুড়োটা এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।"

রাখাল ছেলে বললে, "সে আর দেখি নি? কিন্তু তুমি, ভাই, করেছ কি? শেষবিচার কিয়ামতের দিন, আল্লার হুকুমে ফিরিশ্‌তা ইসরাফিল যখন শিঙে বাজাবেন তখন কত লক্ষ মণ পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে ভেঙে ভেঙে উঠতে হবে বেহেশ্‌ৎ বাগে। তাঁর জন্য এ মেহেন্নতী তৈরি করলে কেন?···আর আমার বাবা তার গোরের উপরকার আধ হাত মাটি এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে হুশ হুশ করে চলে যাবে আল্লার পায়ের কাছে।"

প্রিয় সৈয়দ সাহেব, আমাকে দিয়েছে জ্যান্ত গোর বিরাট ইট-সুরকির এই বাড়িতে। বধূ হয়ে যে-সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করি তখনই আমার শরীরটা কেমন যেন একটা শীতলতার পরশে সির্ সির্ করেছিল, যদিও আমার পরনে তখন অতি পুরু আড়ি-বেল বেনারসী শাড়ি, কিংখাপের জামা আর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আপনার ডাক্তারের ঠাকুমার কাশ্মীরী শাল—যার সাচ্চা জরির ওজনই হবে আধসের।

আপনি এ-বাড়ির অতি অল্প অংশই চেনেন। এ-বাড়ির পুরো পরিক্রমা দিতে হলে ঘণ্টাটাক লাগার কথা। আমাকে কয়েক দিন পর পরই এ-পরিক্রমা লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম খুব একটা মন্দ লাগতো না—প্রাচীন দিনের কতশত সম্পদ, টুকিটাকি, নবীন দিনের সঞ্চয়ও কিছু কম যায় না—এস্তেক কার যেন প্রেজেণ্ট দেওয়া একটা টেলিভিসন সেট্—যদিও কবে যে এটা কাজে লাগবে, সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে! যেন জাদুঘরে এটা-ওটা দেখছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু চিন্তা করুন, যদি আপনাকে জাদুঘরে আহারনিদ্রা দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে হয়, তবে কি রকম হাল হয়!

তবু বলি, এও কিছু নয়। সামান্য ইট-পাথর, প্রাচীন দিনের সঞ্চয়—এরা প্রাণহীন। এরা আমার মত সজীব প্রাণচঞ্চল জীবকে আর কতখানি সম্মোহিত করবে?

কিন্তু এরা যে সবাই সর্বক্ষণ চিৎকার করে করে আমাকে শোনাচ্ছে,

"ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! ঐতিহ্য! ঐতিহ্য!!"

সবাই বলছে, সাত পুরুষ ধরে এই খানদানী পরিবারে যা চলে আসছে, সেইটে তোমাকে মেনে চলতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং মরার সময়ও তার ভবিষ্যতের জন্য পরিপাটি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

আর যারা জ্যান্ত? নায়েব, তাঁর পরিবারবর্গ, এ-বাড়ির দারওয়ান ড্রাইভার বাবুর্চি চাকর হালালখোর, পাশের মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন সক্কলের চেহারাতেই ঐ একটি শব্দ নিঃশব্দে ফুটে উঠছে: ট্র্যাডিশন। বিগলিতার্থ: বেগমসাহেবা যদি খানদানী প্রাচীন পন্থা মেনে চলেন তবে আমরা তাঁর গোলামের গোলাম, আমরা নামাজের পর পাঁচ বেকৎ আল্লার পদপ্রান্তে লুটিয়ে বলবো, "ইয়া খুদা, এই শহর্-ইয়ার বানু 'জিল্লুল্লা', এই দুনিয়ায় 'আল্লার ছায়া'। তাঁরই সুশীতল ছায়াতে আমাদের জীবন, আমাদের

সংসার, আমাদের মৃত্যু, আমাদের মোক্ষ। তুমি তাঁকে শতায়ু করো, সহস্রায়ু করো! আমেন!"

আমি সিনিক্ নই। তাদের এ-প্রার্থনায়, তাদের ঐতিহ্যরক্ষার্থ-কামনায় প্রচুর আন্তরিকতা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই আদিম ইন্‌স্টিন্‌ক্ট্, জীবনসংগ্রামে কোনোগতিকে টিকে থাকবার, কোনোগতিকে বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা।···আজ যদি কালিঘাটের মন্দির নিশ্চিহ্ন করে পুরুৎ পুজোরীদের আদেশ দেন "চরে খাও গে!" তবে তারা যাবে কোথায়? বর্তমান যুগোপযোগী জীবনসংগ্রামে যুদ্ধ করার মত কোনো ট্রেনিং তো এদের দেওয়া হয় নি। এদের অবস্থা হবে, খাঁচার পাখিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে যা হয়। খাঁচার লৌহদুর্গে দীর্ঘকাল বাস করে সে আত্মরক্ষার কৌশল ভুলে গিয়েছে, দু'বেলা গেরস্তের তৈরি ছোলা-ফাড়ং খেয়ে খেয়ে ভুলে গিয়েছে আপন খাদ্য সংগ্রহ করার ছলা-কলা।

আবার আমার 'লোক-লস্করের' কথায় ফিরে আসি। এদের সবাইকে যদি আমি কাল ডিসমিস করে দি,—সে এক্তেয়ার ডাক্তার আমাকে দিয়েছেন—তবে কি হবে? অধিকাংশই না খেয়ে মরবে। তারা শুধু জানে ট্র্যাডিশন। তাদের জন্ম হয়েছে এ শতাব্দীতে, কিন্তু মৃত্যু হয়ে গিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই।

আমি একাধিকবার চেষ্টা দিয়েছিলুম এ-বাড়িতে ফ্রেশ্ ব্লাড আমদানি করতে। চালাক চতুর দু'একটি ছোকরাকে বয্ হিসেবে নিয়ে এসেছি। জানেন কি হলো? পক্ষাধিক কাল যেতে না যেতেই তারা ভিড়ে গেল প্রাচীনপন্থী দারওয়ান বাবুর্চির সঙ্গে। বুঝে গেল, রুটির ঐ-পিঠেই মাখন মাখানো রয়েছে। সিনেমা যাওয়া পর্যন্ত তারা বন্ধ করে দিল। অক্লেশে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেড়শ' কিংবা তারো বেশী ট্র্যাডিশনের মায়াজাল ছিন্ন করার মত মোহমুদ্গর আমি রাতারাতি—রাতারাতি দূরে থাক, বাকি জীবনভর চেষ্টা করলেও—নির্মাণ করতে পারবো না।

অবশ্য আমার দেবতুল্য স্বামী আমাকে বাসরঘরেই সর্বস্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সর্ব বাবদে—সে-কথা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিলেই তো সব মুশকিল আসান হয়ে যায় না। স্বাধীনতা পেয়ে খাঁচার পাখিটার কি হয়েছিল? অনাহারে যখন ভিরমি গিয়ে চৈত্রের ফাটাচেরা মাঠে পড়ে আছে, তখন শিকরে পাখি তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসে কুরে কুরে তার জিগর-কলিজা খেল।

সে-কথা জানে বলেই এ-বাড়ির লোক আমাকে প্রথম দিনই খাঁচাতে পুরতে চেয়েছিল। ওরা সবাই ট্র্যাডিশনের খাঁচাতে। খাঁচার ভিতরকার নিরাপত্তা, অন্নজল বাইরে কোথায় পাবে? আমাদের এক সমাজতত্ত্ববিদ্ নাকি বলেছেন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা না পেলেই নাকি আমাদের পক্ষে ভালো হতো। ওঁর বক্তব্য, ইংরেজ আমলে নাকি আমাদের ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনের দুশ্চিন্তা ছিল অনেক কম।

এই বারে মোদ্দা কথা বলি। সেই রাখাল ছেলের বন্ধুর পিতা বাদশা তাঁর সমাধিসৌধের প্রস্তর ভেঙে ভেঙে উঠতে যত না হিমসিম খাবেন, তার সঙ্গে আমার এই উৎকট সঙ্কটের কোনো তুলনাই হয় না। জ্যান্ত গোরের মানুষ আপন ছটফটানিতে নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস হয়ে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে।

তথাপি আমি ঐ খানদানী পাষাণদুর্গে থাকতে চাই নি। ঠিক মনে নেই, তবে গল্পটি খুব সম্ভব সার্থকা সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর; একটি বালিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি যুবকের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়। অহেতুক যোগাযোগের ফলে তার কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল এক অতি দুর্ধর্ষ কৃষাণরক্তশোষক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। আমার মনে নেই, মেয়েটি হয়তো বা অনিচ্ছায় বিয়ে করেছিল, কিংবা হয়তো বলদৃপ্ত

পদে স্বামীগৃহে প্রবেশ করেছিল, কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে এ-জমিদার পুরুষক্রমে যা করছেন, যেটা দু ছত্রে বলা যায়,

"পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।"

(আবার রবীন্দ্রনাথ! এই মুহম্মদী মামদোর উপর তিনি আর কত বৎসর ভর করে থাকবেন!) সেই পিচেশী রক্তশোষণ সে চিরতরে বন্ধ করবে—আপ্রাণ সংগ্রাম দিয়ে, প্রয়োজন হলে পরমারাধ্য স্বামীকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ দিয়ে, ডিফাই করে।

এবং দিয়েও ছিল সে মোক্ষম লড়াই তাঁর খাণ্ডারিণী শাশুড়ীর বিরুদ্ধে—তিনিই ছিলেন এই প্রজা-শোষণ-উচাটনের চক্রবর্তিনী।

সংক্ষেপে সারি। তার বহু বৎসর পরে কি পরিস্থিতি উদ্ভাসিত হলো? সেই পূর্বেরটাই। যথা পূর্বং তথা পরং! যদ্বৎ তদ্বৎ পূর্ববৎ। ইতিমধ্যে শাশুড়ী মারা গিয়েছেন এবং সেই "বিদ্রোহী" তনুদেহ-ধারিণী বধূটি দশাসই গাড়ুগুম্ কলেবর ধারণ করে হয়ে গেছেন সে-অঞ্চলের ডাকসাঁইটে রক্তশোষিণী!

ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! সেই দ' থেকে বাঁচে কটা ডিঙি?

কিংবা রবীন্দ্রনাথের সেই কথিকাটি স্মরণে আনুন:

"বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।'··দেবতা দয়া করে বললেন···'লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই!"

সেই ভূতই হলো ট্র্যাডিশন!

তারপর মনে আছে সেই ভূত-ট্র্যাডিশনের পায়ের কাছে "দেশসুদ্ধ সবাই-কে" কি খাজনা দিতে হলো?

"শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে [খাজনা দেবে] "আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।"

সৈয়দ সাহেব, আমি ট্র্যাডিশন ভূতের খর্পরে সে-'খাজনা' দিতে রাজী ছিলুম না। তার কারণ এ নয় যে আমি কৃপণ। কিন্তু এ-মূল্য দিলে যে আমার সর্বসত্তা লোপ পাবে, আমার ধর্ম আমার ইমান যাবে।

সুভদ্রা আশাপূর্ণার সেই বধূর মত দিনে দিনে আপন সত্তা হারিয়ে হারিয়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়ির অচলায়তনে বিলোপ হতে চাই নি। সেইটেই হতো আমার মহতী বিনষ্টি।···

কিন্তু তবু জানেন, সৈয়দ সাহেব, হাসিকান্না হীরাপান্না রান্নাবান্না নিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন কেটে যাচ্ছিল। আমাদের কচিকাঁচা বয়সে একটা মামুলি রসিকতার কথোপকথন ছিল "কি লো, কি রকম আছিস?" "কেটে যাচ্ছে, কিন্তু রক্ত পড়ছে না।" আমার বেলা কিন্তু "দিন কাটার" সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড কেটে কেটে রক্ত ঝরে ঝরে ফুসফুসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধনিঃশ্বাস করে তুলছিল। সর্বশেষে একদিন আমাকে ডুবে মরতে হতো, আমার আপন দিল-ঝরা খুনে। আমি কর্তার কাছে শুনেছি, যুদ্ধের সময় বুলেটের সামান্যতম এক অংশ যদি হৃৎপিণ্ডে ঢুকে সেটাকে জখম করতে পারে তবে তারই রক্তক্ষরণের ফলে সমস্ত ফুসফুস ফ্লাডেড্ হয়ে যায়, এবং বেচারা আপন রক্তে ড্রাউনড হয়ে মারা যায়।

অবশ্য আমার বেলা বুলেটের টুকরো নয়। ঐ ভুতুড়ে বাড়ির ট্র্যাডিশনের একখানা আস্ত চাঁই।···

আপনি অবশ্যই শুধোবেন, অকস্মাৎ তোমার এ-পরিবর্তন এল কি করে?

পরিবর্তন নয়। জাগরণ। নব জাগরণ।

"রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ···"

আমার 'নব জাগরণের' পর আমি এ-কবিতাটি নিয়ে অনেক ভেবেছি। স্পষ্টত এখানে রূপনারান রূপকার্থে। অবশ্য এর পিছনে কিছুটা বাস্তবতাও থাকতে পারে। শুধু পদ্মায় নয়, কবি গঙ্গাতেও নৌকোয় করে সফরে বেরুতেন। হয়তো বজবজ অঞ্চলে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; হঠাৎ ঘুম ভাঙল ডায়মণ্ডহারবারের একটু আগে যেখানে রূপনারায়ণ নদী গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে। জেগে উঠলেন রূপনারানের কূলে, 'কোলে'ও হতে পারত। 'স্বপ্ন' দেখছিলেন এতক্ষণ। অর্থাৎ তাঁর আশী বৎসরের জীবন স্বপ্নে স্বপ্নে, স্বপ্নের অবাস্তবতায় কাটাবার পর হঠাৎ রূপনারানের কূলে পরিপূর্ণ বাস্তবের অর্থাৎ 'রূপের' সম্মুখীন হলেন। এক আলঙ্কারিক রূপের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে বলেছেন, ভূষণ না থাকলেও যাকে ভূষিত বলে মনে হয় তাই 'রূপ'। অর্থাৎ পিওর, নেকেড রিয়ালিটি। তার কোনো ভূষণ নেই।

আর 'নারায়ণ' অর্থ তো জানি; নরনারী যাঁর কাছে আশ্রয় নেয়।

আমি অন্তত এই অর্থেই কবিতাটি নিয়েছি।

তাই আমি জপ করি সেই আল্লার (নারায়ণ) আশ্রয় নিয়ে তাঁর রূপস্বরূপকে স্মরণ করে, যার নাম "লতীফ্" (সুন্দর)। এবং তিনি শিব এবং সত্যও বটেন।

কারণ আমি যখন আমার রূপনারানের তীরে পৌঁছলুম, রূঢ়তম-রূপে আমার নিদ্রাভঙ্গের 'দ্বিজত্বের' সম্মুখীন হলুম তখন শুধু যে আমার পূর্ববর্ণিত

ট্র্যাডিশন ! ট্র্যাডিশন !!

ট্র্যাডিশনের পাষাণপ্রাচীর নির্মিত 'অচলায়তন' দেখতে পেলুম, তাই নয়।

আতঙ্ক, বিস্ময়, এমন কি নৈরাশ্যে প্রায় জীবন্মৃতাবস্থায় আমি আরো অনেক অন্ধপ্রাচীর, কনসেনটেশন ক্যাম্পের চতুর্দিকে যেরকম চার দফে ইলেকট্রিফাইড লোহার কাঁটা জাল থাকে, সেগুলোও দেখতে পেলুম।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক বিভীষিকাময়: ভুল আদর্শ, ভুল মরালিটি, বেকার 'পরোপকার', মহাশূন্যে দোদুল্যমান আলোক-লতার উপর স্তরে স্তরে ফুটে-ওঠা সঙ্গীতের ক্ষণস্থায়ী আকাশকুসুম, কবি বায়রনের ভাষায়

"এ যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘেরিয়া
শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি
দূর হতে মনোলোভা॥"

আর কি সব ভুল দেখেছিলুম তার ফিরিস্তি আপনাকে দিতে গেলে পুরো একখানা "মোহমুদ্গর পঞ্জিকা" লিখতে হবে। এককথায় দেহের ভুল, হৃদয়ের ভুল, মনের ভুল—পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভুল। অর্থাৎ কিশোরী অবস্থা থেকেই শুরু করেছি ভুল এবং চলেছি ভুল পথে।

আমি নিরাশবাদী নই, অতএব ঢেলে সাজাতে হবে নতুন করে। জীবনের সঙ্গে রিটার্নম্যাচের এখনো সময় আছে—প্রস্তুতি করবার।

* * *

কিন্তু পন্থা কি ?

শিশু যেমন মায়ের হাতে মার খেয়ে মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি তেমনি "রূপনারানের কূলে" নয় "রূপনারায়ণের কোলে" আছাড় খেয়ে পড়লুম।

"বিশ্বরূপের" অতিশয় রূঢ় প্রকাশ এই পৃথিবীতে আমরা যাকে "সৌন্দর্য" বলি। তার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় ছিল। অতি ক্ষুদ্র কীট ও তার জীবনস্পন্দনে অন্তহীন গ্রহসূর্য তারায় তারায় যে জীবনস্পন্দন আছে তার লক্ষাক্ষৌহিনী অংশ যতখানি অন্ধভাবে অনুভব করে, ঠিক ঐ অতি অল্পখানি। সে-ই প্রচুর! পর্যাপ্তেরও প্রচুরতর অপর্যাপ্ত! আরব্য রজনীর অন্-নশ্‌শার একঝুড়ি ডিম দিয়ে কারবার আরম্ভ করে উজিরবানুকে বিয়ে করবার প্ল্যান করেছিল। তার হিসেবে রত্তিভর ভুল ছিল না—ভুল ছিল তার হঠকারিতায়। আর আমার হাতে তো কুল্লে সর্বসাকুল্যে মাত্র একটি ডিম। কার্ডিনাল নিউম্যান কি গেয়েছিলেন—স্মৃতিদৌর্বল্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি—"আমি তো যাত্রাশেষের দূরদিগন্তের কাম্যভূমি দেখতে চাই নে; আমাকে, প্রভু, একটি পা ফেলার মত আলো দেখাও।" "আই ডু নট্ উয়োণ্ট টু সী দ্য ডিসটেণ্ট সীন / ওয়ান স্টেপ ইনাফ্ ফর মী।" তাই আমি "বিশ্বরূপ লতীফের" সন্ধানে বেরলুম।

এরপর আমার যে সব নব নব অভিজ্ঞতা হলো তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই, কখনো হবে না, কারণ আমি তাপসী রাবেয়া নই। আমি সব-কিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। তাই আপনি আমার চোখ কেমন যেন কুয়াশা-ভরা ফিল্‌মে-ঢাকা দেখেছিলেন।

অতএব অতি সংক্ষেপে সারছি।

প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু চিন্তা করে দেখলুম, আপনি স্বপ্নমগ্ন না হলেও রূপনারানের তীরে আপনি এখনো পৌঁছন নি। প্রার্থনা করি, কখনো যেন না পৌঁছতে হয়।

সবাইকে যে পৌঁছতে হবে এমন কার, কোন্ মাথার দিব্যি? যদি রূপনারানে পৌঁছতেই হয় তবে যেন পৌঁছেন আপনার গুরুরই মত আশী বছর বয়সে। আমার কপাল মন্দ (মুনিঋষিরা হয়তো বলবেন "ভাগ্যবন্ত" আমি "অথণ্ডসৌভাগ্যবতী"), আমি যৌবনেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছি। কোনো ইয়োরোপীয় বিলাসরভসে

নিমজ্জিত এক ধনীর সন্তান যৌবনে বলেছিলেন "স্যালভেশন, মুক্তি, মোক্ষ? নিশ্চয়ই চাই, প্রভু। কিন্তু not just yet—" অর্থাৎ একটু পরে হলে হয় না, প্রভু? আমার বিলাসবাসনা তেমন কিছু-একটা নেই, কিন্তু আমার যে ভয় করে। আপনার কাছে যাওয়া হলো না।

তখন পেলুম পীর সাহেবকে। আমার বড় আনন্দ, আপনি তাকে ভুল বুঝেন নি। তিনি কক্‌খনো আদৌ আমার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চান নি। বরঞ্চ তিনি যেন হলেন এমবারাসট—যেন একটা ধন্ধে পড়লেন। বুঝে গেলুম, তাঁর যেন মনে হয়, যৌবনের কাম বাসনা ইত্যাদি খানিকটে পুড়িয়ে নিয়ে তার পর ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নামা প্রশস্ততর।

* * *

আপনি জানেন, যদিও ধর্মকর্মে আমার আসক্তি ছিল সামান্যই, তবু আমি শ্রীঅরবিন্দের আধা-ধর্ম-আধা-কালচারাল লেখাগুলো সব সময়ই মন দিয়ে পড়েছি। বুঝেছি অবশ্য সিকি পরিমাণ। তাঁর কথা আমার মনে পড়ল সর্বশেষে। কৃপণ যে-রকম তার শেষ মোহরটির কথা স্মরণ করে সব খতম হয়ে যাওয়ার পর।

তাঁর সে-লেখাটির নাম বোধহয় উত্তরপাড়া ভাষণ।

আলীপুরের বোমার মামলা তখন সবে শেষ হয়েছে। সমস্ত বাঙলাদেশ উদ্‌গ্রীব, এবারে শ্রীঅরবিন্দ বাঙলাদেশকে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন। আর বাঙলাদেশের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ।

কী গুরুতর দায়িত্ব! মাত্র একটি লোকের স্কন্ধে!

তখন তিনি যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল কথা একটি বাক্যে বলা যেতে পারে,—তিনি আপন ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুদিনের জন্য নির্জনে চিন্তা করতে চান।

আর আমি তো সামান্য প্রাণী। আমার এ-ছাড়া অন্য কোনো গতি আর আছে কি ?

আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার স্বামীর অত্যন্ত কষ্ট হবে। এ-রকম ফেরেশ্‌তার মত স্বামী কটা মেয়ে পায়! তাই জানি, যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইব তিনি আমাকে বাধা দেবেন না। তিনি নিজে ধার্মিক—তাই বলে যে তিনি আমার ধর্মজীবনের অভিযানে বাধা দেবেন না, তা নয়। আমি যে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে বসে ঝুরে মরবো সেটা তিনি কিছুতেই সইতে পারবেন না।

হায় আল্লা তালা! আমাকে তুমি এ কী নির্দেশ দিলে যার জন্য আমার এই প্রাণপ্রিয় স্বামী, আমার মালিককে ছেড়ে যেতে হচ্ছে! সৈয়দ সাহেব, আমি জানি আর আমার স্বামী জানেন, আমাদের আজও মনে হয়, আমাদের বিয়ে যেন সবেমাত্র কয়েক দিন আগে হয়েছে। আমরা যেন এই মাত্র বাজ্‌গশ্‌তী (বাঙলায় কি বলে ? দ্বিরাগমন ?) সেরে ষ্টীমারের কেবিনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একে অন্যকে চিনে নিচ্ছি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "আমি কী ভাগ্যবান!" লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। মাথায় ঘোমটা টেনে তাঁর পদস্পর্শ করে বললুম, "আপনি এ কী করলেন ? আমি যে এখনই এই কথাটিই বলতে যাচ্ছিলুম।"

তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলেন "পাগলী!"

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আজ প্রমাণ হতে চললো, আমি পাগলিনী। নইলে আমি আমার এমন মনীব ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি কেন ?

কত বলবো ? এর যে শেষ নেই।

আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার নিজের জন্য কষ্ট হয়,—আপনি

কতখানি বেদনা পাবেন, সে-কথা আমি ভাবছিনে। যাবার বেলা শেষ একটি কথা বলি। যবে থেকে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় (আল্লা সে-দিনটিকে রোশ্‌নীময় করুন !) তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি, আপনার ভক্ত চেলার সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। হয়তো আপনার চেয়ে কাঁচা লেখকের ভক্তের সংখ্যা আরো বেশী। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম এবং অতিশয় পুলকিত হয়েছিলুম। আপনার "ভক্তা" নেই, আপনার কোনো রমণী উপাসিকা নেই। আমিই তখন হলুম আপনার অদ্বিতীয়া সখী, নর্মসহচরী—যে নামে ডাকতে চান, ডাকুন। এ-হেন গৌরবের আসন ত্যাগ করে যেতে যায় কোন্ মূর্খ ! তবু যেতে হবে।

সর্বশেষে আপনাকে, নিতান্ত আপনাকে একটি কথা বলি :

ঐ যে কবিতা—কবিতা বলা ভুল, এ যেন আপ্তবাক্য—"রূপনারানের কোলে / জেগে উঠিলাম" এর শেষ দুটি লাইনকে আমি অকুণ্ঠ স্বীকার দিতে পারছিনে। লাইন দুটি ;

"সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যু তে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

এখানে আমি কুষ্টিয়ার লালনফকীরের আপ্তবাক্য মেনে নিয়েছি। তিনি বলেছেন, "এখন আমার দেহ সুস্থ, মন সবল, পঞ্চেন্দ্রিয় সচেতন। এ-অবস্থায় যদি আল্লাকে না পাই তবে কি আমি পাব মৃত্যুর পর ?—যখন আমার দেহমন প্রাণহীন, অচল অসাড় ?" আমি "সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে" মৃত্যু দিয়ে "সকল দেনা শোধ" করবো না।

আমার যা পাবার সে আমি এই জীবনেই, জীবন্ত অবস্থাতেই পাব।

খুদা হাফিজ্‌ ! ফী আমানিল্লা !!

আপনার স্নেহধন্য কনীজ্‌
শহ্‌র-ইয়ার

হাত থেকে ঝরঝর করে সব কটি পাতা বারান্দার মেঝেতে পড়ে গেল।

এতক্ষণ আমার (এবং শহ্‌র্-ইয়ারেরও) আদরের আলসেশীয়ান কুকুর "মাস্টার" আমার পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

এখন হঠাৎ বারান্দার পূর্ব প্রান্তে গিয়ে নিচের দু'পায়ের উপর বসে উপরের দু'পা আকাশের দিকে তুলে দিয়ে চিৎকার করে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়তে আরম্ভ করলো। সম্পূর্ণ অহেতুক, অকারণ।

তবে কি মাস্টার বুঝতে পেরেছে, তার আমার প্রিয়বিচ্ছেদ! আল্লাই জানেন সে গোপন রহস্য।

*　　*　　*

অবসন্ন মনে মৃত দেহে শয্যা নিলুম। ঘুম আসছে না।

দুপুর রাত্রে হঠাৎ দেখি মাস্টার বিদ্যুৎবেগে নালার দিকে ছুটে চলেছে। হয়তো শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে।

তার খানিকক্ষণ পরে ঐ দুপুর রাত্রে কে যেন বারান্দায় উঠল। উঠুক। আমার এমন কিছু নাই যা চুরি যেতে পারে।

হঠাৎ শুনি ডাক্তারের গলা। আমার কামরার ভিতরেই।

এক লম্ফে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলুম। বাতি জ্বাললুম।

এ কী! আমি ভেবেছিলুম ওকে পাবো অর্ধ উন্মত্ত অবস্থায়। দেখি, লোকটার মুখে তিন পোঁচ আনন্দের পলস্তরা।

কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বললে,

"নাম্বার ওয়ান : আমাদের বসতবাড়ি পরশুদিন পুড়ে ছাই।

নাম্বার টু : আমরা আগামী কাল যাচ্ছি সুইডেনে। আমার রিসার্চের কাজ সেখানেই ভালো হবে।

নাম্বার থ্রী : (কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন) শহর্ ইয়া· অন্তঃসত্ত্বা।

নাম্বার ফোর —"

আমি বাধা দিয়ে বললুম "সে কোথায় ?"

"বারান্দায়। মাস্টারকে খাওয়াচ্ছে।"

* * *

বারান্দায় এসে শহর্-ইয়ারকে বললুম, "সুইডেনে তুমি নির্জনতা পাবে।"

তারপর শুধালুম, "আবার দেখা হবে তো ?"

সে তার ডান হাত তুলে—দেখি, আমি তাকে ঢাকা থেকে এনে যে শাঁখার কাঁকন দিয়েছিলুম সেইটে পরেছে—সে হাত তুলে আস্তে আস্তে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কী জানি, কী হবে।"

* * *

আমার এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দুর্বল হাত তুলে বলেন—তখন তাঁর চৈতন্য ছিল কি না জানিনে—"কী জানি, কী হবে।" '

—